“বই মনের খাদ্য। বেশি বেশি বই পড়ুন, মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

নজরুল স্মারক সংখ্যা

নজরুল একাডেমী পত্রিকা

উৎসর্গ-পত্র

নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন গত ৪ঠা মার্চ, ১৯৭৮ শনিবার দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন।)

হাসপাতালের রোগ-শয্যায় থেকেও, যতক্ষণ তাঁর জ্ঞান ছিল, একাডেমীর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। যন্ত্রণা-কাতর শয্যা থেকেই তিনি আমাদের বার বার বলেছেন—এই বিশেষ সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেন হাসপাতালে তাঁকেই প্রথম কপি পাঠানো হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, পত্রিকা প্রকাশের আগেই তিনি আমাদের চিরতরে ছেড়ে গেলেন। আল্লাহ্ মরহুমকে তাঁর অপার করুণা ও অনন্ত শান্তির ছায়ায় আশ্রয় দান করুন।

আমরা আমাদের প্রাণের পরমতম শ্রদ্ধা ও প্রীতির আবেগ সঙ্গে দিয়ে নজরুল একাডেমী পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যা নজরুলের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু এবং নজরুল একাডেমীর প্রাণ-স্বরূপ মরহুম আবুল কালাম শামসুদ্দীনের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি।

তালিম হোসেন

১২ই মার্চ, ১৯৭৮ — সাধারণ সম্পাদক

নজরুল একাডেমী পত্রিকা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা ॥ ৬ষ্ঠ বর্ষ : নজরুল স্মারক সংখ্যা : ১৩৮৪

সূচীপত্র

গ্রন্থ পরিচিতি

শেষ সালাম

প্রচ্ছদ : হাশেম খান

সম্পাদক

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

বন-বালিকার বুলবুলি আমি অতীত প্রেমের পাই পরশ।
অনুরাগের লাল শরাব মোর চোখে করে ঝলমল॥

আজ যদি ধরিত্রীর খেয়ালে হঠাৎ শুকিয়ে যায় নায়েগ্রার জলপ্রপাত, কোন ফটোগ্রাফারের ছবি দেখে আর বোঝানো যাবে না, সেই প্রচণ্ড প্রবাহের জীবন্ত পরিবেশ কি বিস্ময়কর ছিল।

আজ বাংলাদেশের লোকের সামনে যাঁদের কবি বলে জানি, গায়ক বলে জানি, সুরকার বলে জানি, তাঁদের জীবনের পতিত ধারা দেখে বোঝা যাবে না, কবি নজরুল ইসলাম কি ছিল?

প্রচণ্ড বন্যার মত, লেলিহান অগ্নিশিখার মত, পরাধীন জাতির তিমির ঘন অন্ধকারে, জাতির ভাগ্যবিধাতা নজরুলকে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র ছাঁচে গ'ড়ে পাঠিয়েছিলেন।
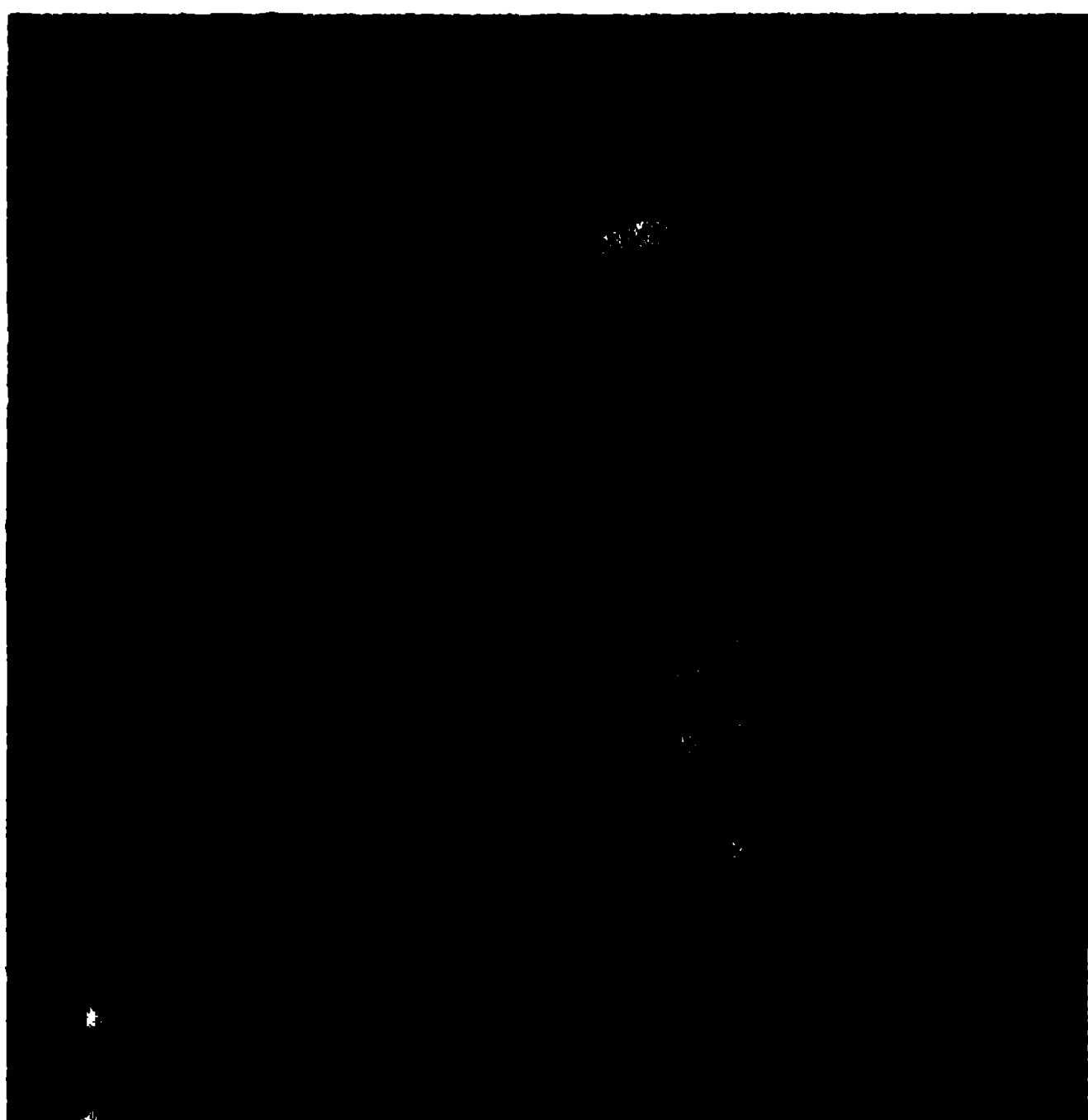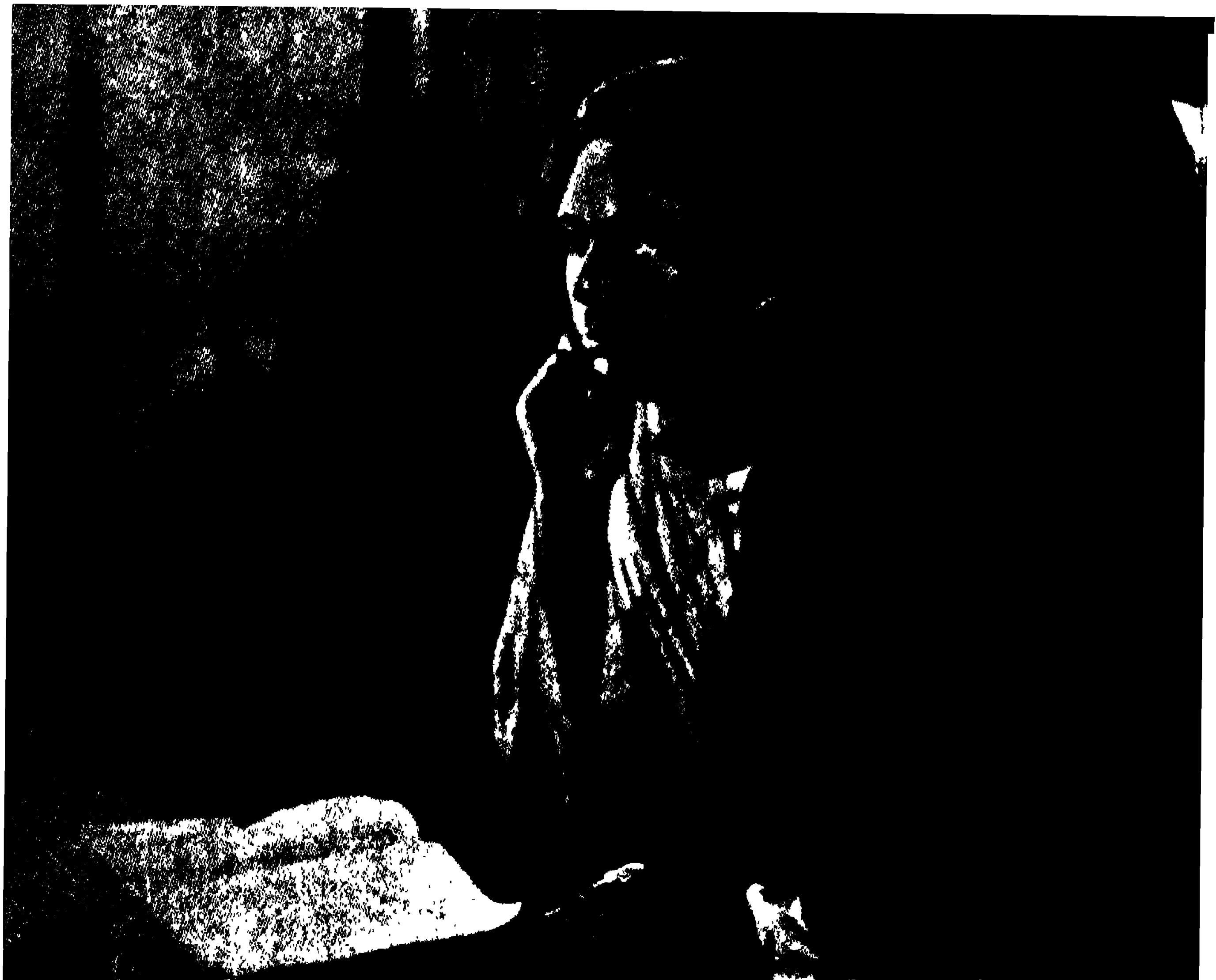
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

উপরের বাম দিকের ছবিটি কবির ২৫ বছর বয়সের। যে কামানটির গায়ে কবি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেটি বাঁকুড়ার অবস্থিত বিষ্ণুপুরের দলমাদল কামান।

উপরের ডান দিকের ছবিটি সৈনিকের পোশাক পরিহিত ২১ বছরের নজরুলের। ৪৯ নং বাঙালী পল্টন ভেঙে দেওয়ার পর কবি তখন করাচী থেকে কলকাতায় সদ্য প্রত্যাবর্তন করেছেন। সময় ১৩২৭ সালের চৈত্র মাস।

বাঁ দিকের ছবিটি গজল রচনার পূর্বে ধ্যানমগ্ন নজরুলের। কবি তখন বাস করছিলেন কৃষ্ণনগরে।

ডান ধারের পৃষ্ঠার বাম দিকের ছবিগুলি কবির চট্টগ্রাম ভ্রমণের কয়েক দিনের স্মৃতি। কবিকে দেখা যায় কখনও নবাবের মত কলাবৃত আবার কখনও আরবীদের মত শিরস্ত্রাণ পরিহিত। ডান দিকের উপরের ছবিটি কবির উত্তর যৌবনের। নীচের ছবিটি যৌবনের গোধূলি-লগ্নের।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
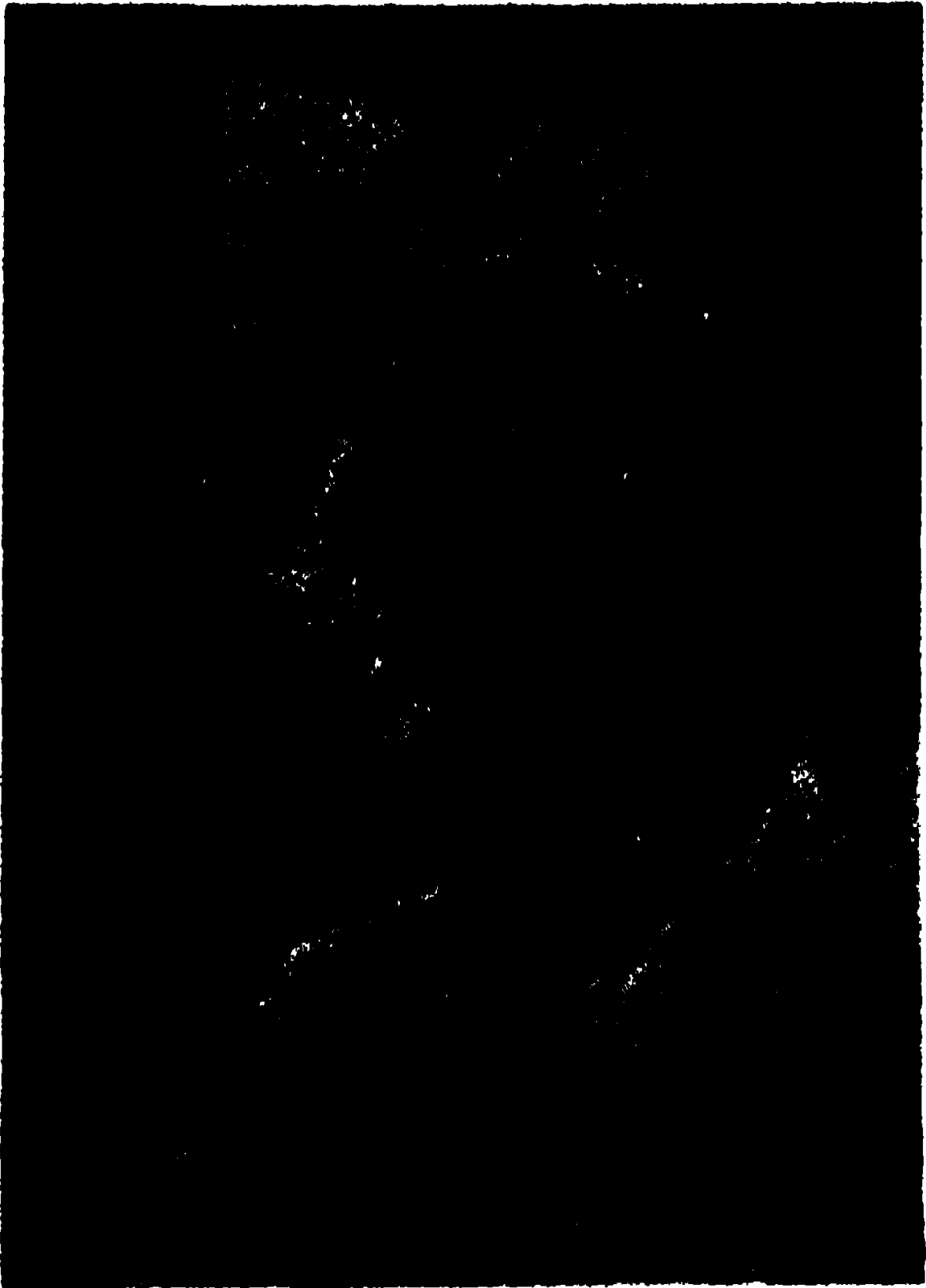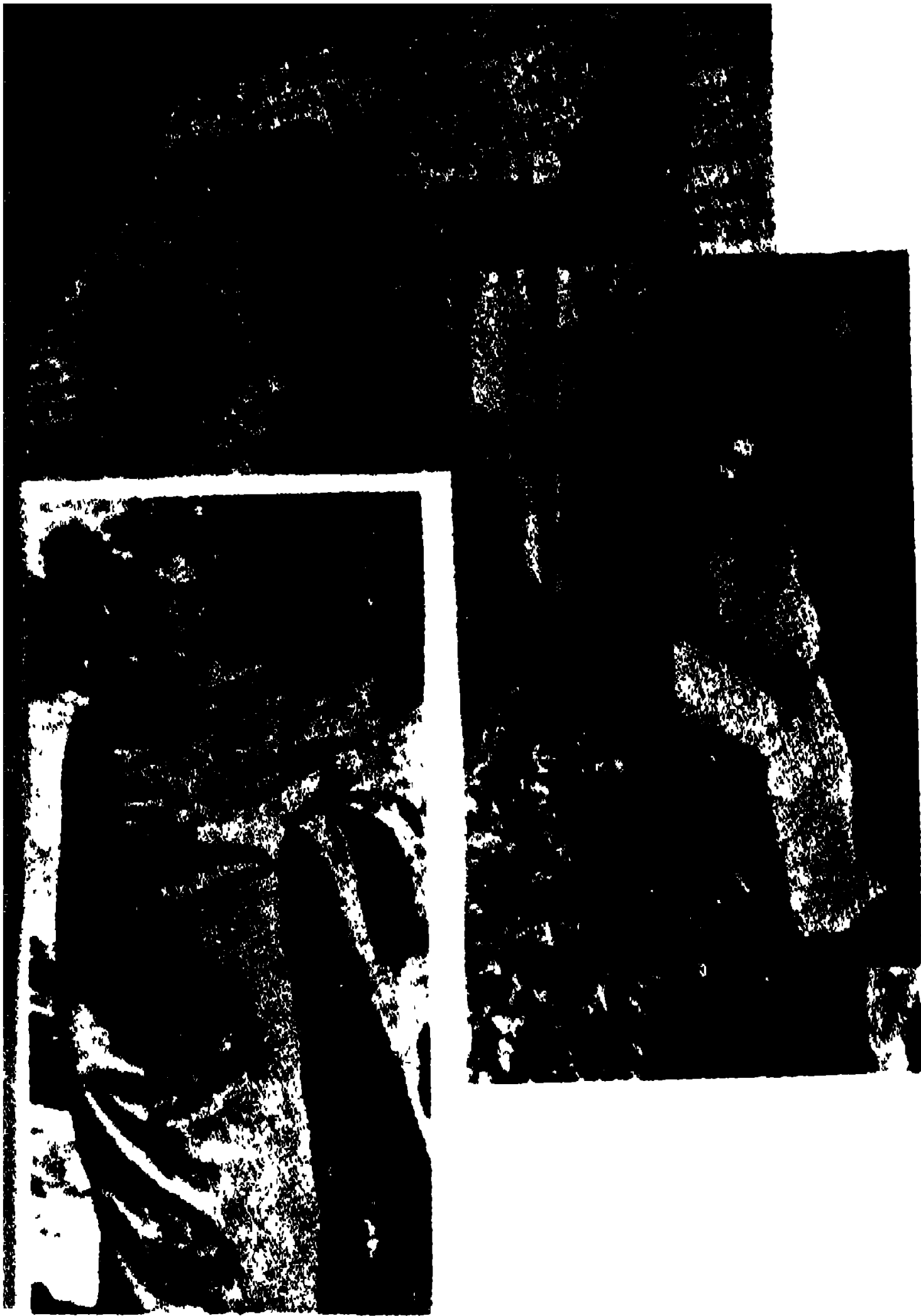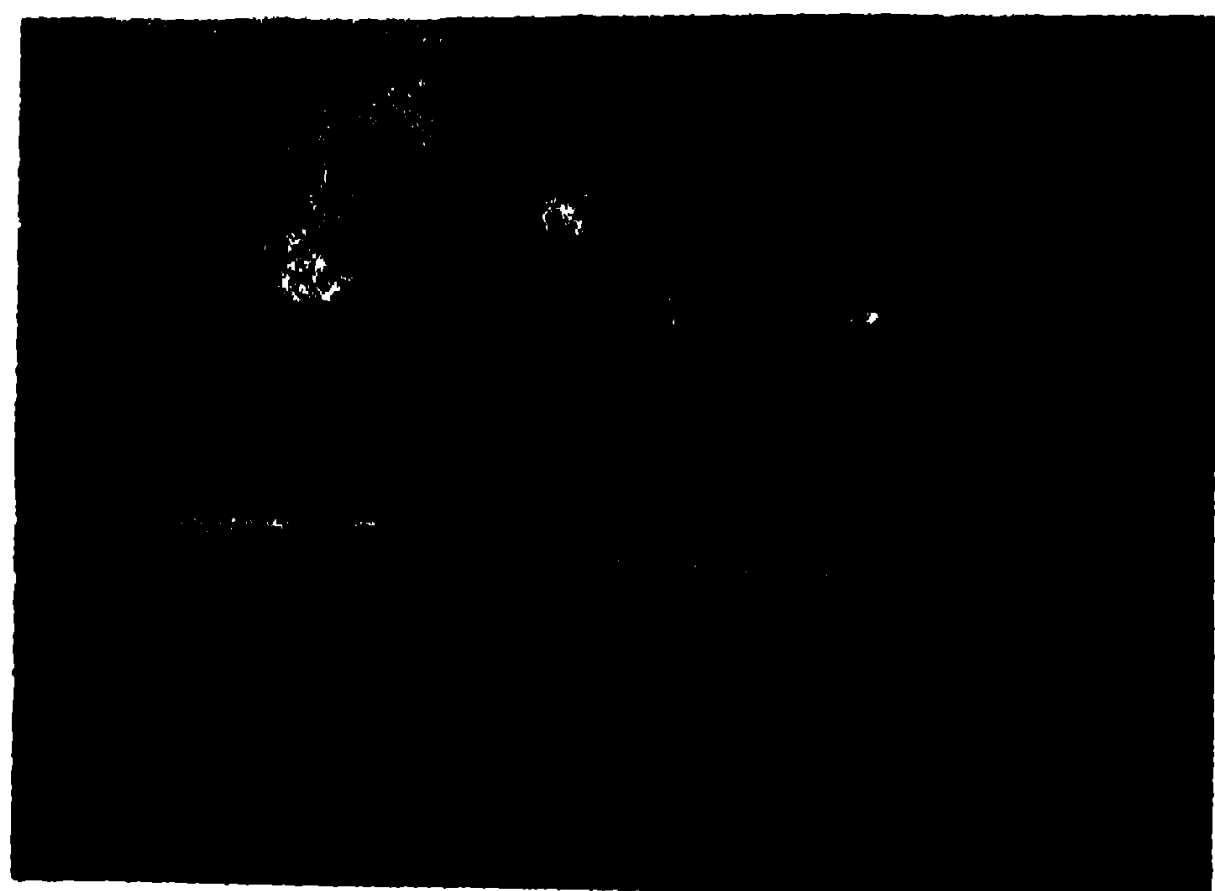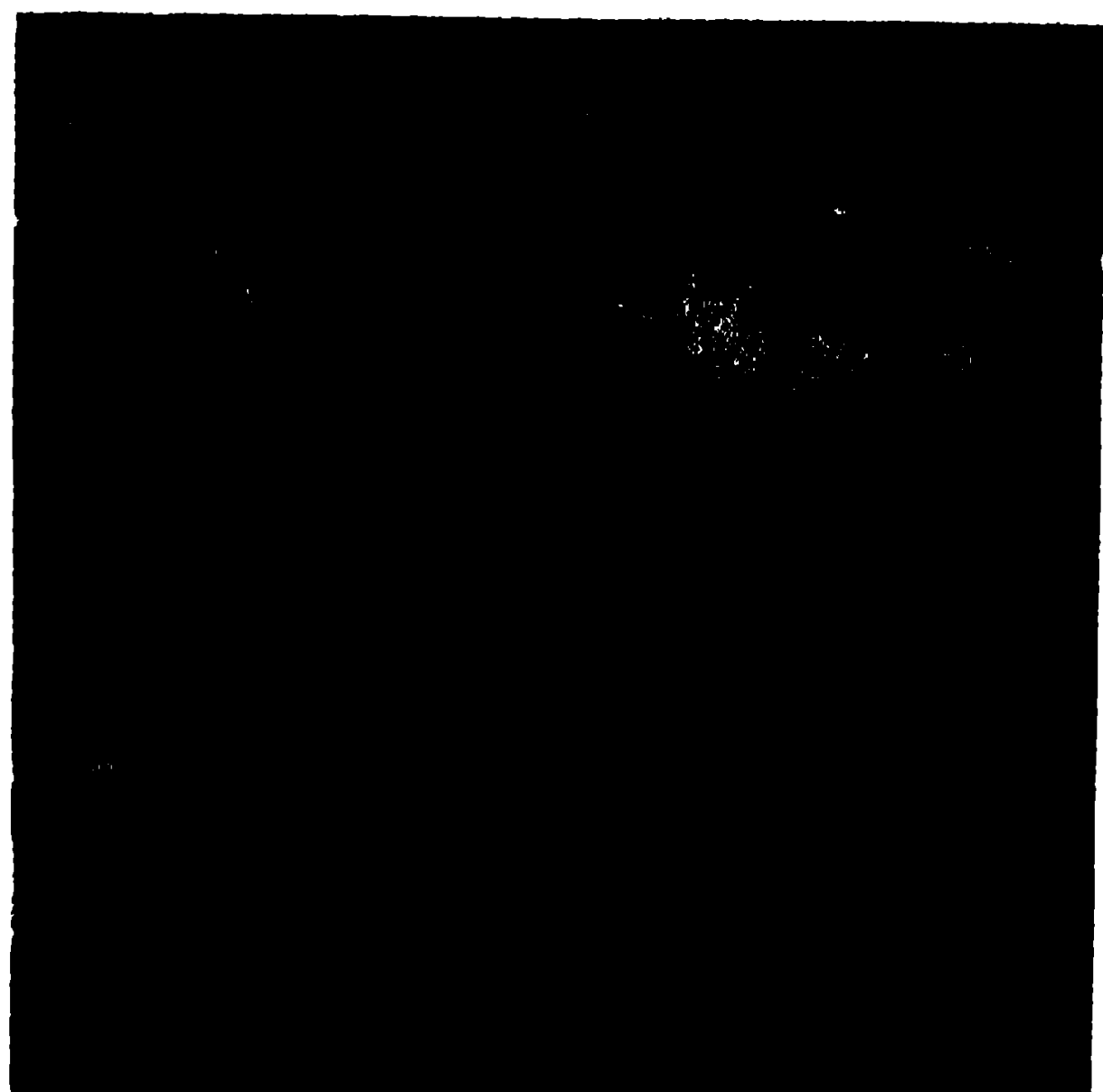
বাম দিকের ছবিটি কিশোর কবি নজরুলের। কবি তখন সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলের ছাত্র।
ডান দিকের উপরের ছবিটি সেই মক্তবের, শিশু নজরুল যেখানে অধ্যয়ন করতেন। এখান থেকে কবি নিম্ন প্রাথমিক পাশ করেন। মাঝখানের ছবিটি চুরুলিয়ার সুফী ফকিরের মাজার। এটি হয়ত বা কবি-জীবনের আধ্যাত্মিক চেতনার উৎস ছিল। নীচের ছবিটি পীরপুকুর, পুকুরপাড়ের মসজিদের। প্রবীণার মজলিশ এইখানে।

এ আলোক চিত্রটিও কবির যৌবনের গোধূলি-লগ্নের। ১৯৪০ সালে কবির বয়স যখন ৪২ তখন বিখ্যাত আলোক চিত্রশিল্পী পরিমল গোস্বামী এটি ক্যামেরায় ধরে রাখেন।

উপরে কবির
জীবনসঙ্গিনী
আশালতা সেনগুপ্তা
ওরফে প্রমীলা।
নীচে ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটের
সেই বিখ্যাত বাড়ী, 'বঙ্গীয়
মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র
অফিস ছিল যার দোতালায়।
এর ডান দিকের ছাদময়
কক্ষটিতে ১৩২৭ সালের চৈত্র
মাসে ফৌজ থেকে ফিরে কবি
মুজফফর আহমদের সঙ্গে
বাস করতেন।

১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর পরিচালক সুনীল রায়ের বনগ্রাম রোডস্থ বাসভবনে কবির এ ছবিটি তোলা হয়। ঢাকায় তোলা কবির এটি শেষ ছবি। বাম দিক থেকে জনাব জামান, টি. এইচ চৌধুরী (মাঝখানে) ও ডি. পণি।

নীচের ছবিতে বামদিকে টুপি দিয়ে অধ্যাপক হেমন্ত সরকার, ডানদিকে নজরুল। মাঝখানে দণ্ডায়মান হাবিবুল্লাহ বাহার।

কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে। ১৯৫৩ সালে কবিকে ইউরোপে পাঠান হয়। ডানের পৃষ্ঠার ছবিটি কবির লণ্ডন অবস্থান কালে জুন মাসে সারে অঞ্চলে তোলা।

লণ্ডনে তার একা যাননি। স্ত্রী প্রমীলাও সঙ্গে গিয়েছিলেন। কবির সুস্থ থাকা অবস্থায় প্রমীলার নিম্নদেশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। কবি সাধ্যাতীত চিকিৎসা করেন কিন্তু কোন ফল হয়নি। অসুস্থ কবি রুগ্না স্ত্রীর নিয়ে এমনি ক'রে ব'সে মৃত্যু পর্যন্ত কাটিয়েছেন। উপরের ছবিটি করুণ সেই দৃশ্যের আলোক চিত্র।

নীচে : বামে কবির ৩য় পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম এবং ডানে কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম।

শিল্পী অতুল বসুর অঙ্কিত চিত্র ও স্বাক্ষর।

'শিল্পের জন্য শিল্প' বিশ্বাসী সাহিত্যিকরা নজরুল-সাহিত্যকে অবহেলার দৃষ্টি হানতেন। নজরুল বিস্মৃত হ'য়ে পড়েন পশ্চিম বঙ্গে। ১৯৬২-র চীন ভারতের যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হ'ল নজরুলের। অসুস্থ নজরুলকে রবীন্দ্র-সদনে এনে পুষ্পার্পণ করা হ'ল। উপরের বামের ছবিটি সেই অবিস্মরণীয় সময়ের। ডানে রোগ-শয্যায় প্রমীলা।

বামের ছবিটি ফজিলাতুন্নেসার। ১৯২৮ সালে কবি যখন ঢাকায় আসেন তখন এই বিদুষী মহিলার সঙ্গে কবির পরিচয় হয়। এঁর বিলাত যাত্রা উপলক্ষে কবি রচনা করেন ''জাগিলে পারুল কি গো সাত ভাই চম্পা ডাকে'' নামক গান।

ঢাকায় নজরুল

১৯৩৯ সালে শুধু বাকাবাজীর শেষবারের মত ঢাকায় এসেছিলেন নজরুল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়। পাকিস্তানের পূর্বাংশ পূর্ব বঙ্গের অধিবাসী প্রিয় কবিকে চাক্ষুষ দেখার ইচ্ছা পোষণ করলেও সে সৌভাগ্য তাদের হয়নি। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হ'লে কবির বাংলাদেশে আসার পথ প্রশস্ত হয়। ১৯৭২-এর ১০ই মে বাংলাদেশ সরকার কবিকে ঢাকায় নিয়ে এলেন। উপরের ছবিতে কবির ঢাকা আগমন উপলক্ষে বিমান বন্দরে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বিপুল জনসমাগমের দৃশ্য। ডান পাশের ছবিটিও ঐ সময়ের।

ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কবির ধানমণ্ডীর বাসভবনে কবিকে দেখতে যান। ছবিটি সে-সময়ের।

কবির জন্মদিনের একটি আনন্দিত মুহূর্ত। ডান দিকের ছবিতে কবির দুই পুত্রবধূ উমা কাজী ও কল্যাণী কাজীকে দেখা যাচ্ছে।

উপরের ছবিতে বিউগলে বাজান হচ্ছে লাস্টপোস্টের করুণ সুর।

নীচে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক প্লাটুন সৈনিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ অবনমিত করছেন 'রেজিমেন্টাল কালার', প্রদর্শন করছেন গার্ড অব অনার।

পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও চিত্র-পরিচিতি : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

অঙ্গসজ্জা : হাশেম খান

আলোকচিত্রশিল্পী :
মরহুম হাবিবুল্লাহ্ বাহার, প্রীপবিক্রম গোস্বামী, গোলাম মাওলা, কামরুজ্জামান, নাসির আলী খান (মামুন) এবং অন্যান্য।

কয়েকটি ছবি দৈনিক সংবাদ, দৈনিক বাংলা ও বাংলা একাডেমীর এবং কবির নজল খান পুত্র হস্তলিপি জনাব মাহফুজুর রহমান খানের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

নজরুল
একাডেমী
পত্রিকা

ত্রিমাসিক পত্রিকা : ৬ষ্ঠ বর্ষ : ১ম সংখ্যা: গ্রীষ্ম-বর্ষা: ১৩৮৪

জাতীয় কাব্য ও কবি নজরুল

সাদেক আলী

[এক]

জাতীয় ভাষা বা মাতৃভাষায় লিখিত হলেই তা জাতীয় সাহিত্য হয় না। অথবা একটা ভৌগোলিক চৌহদ্দির মধ্যে একই ভাষায় লিখিত নানা রকম গ্রন্থের সংগ্রহই কোন জাতির জাতীয় সাহিত্য নয়। যে সাহিত্যের মধ্যে জাতির মন এবং চরিত্র যুগে যুগে ক্রম-উন্মোচিত হয়, তাকেই জাতীয় সাহিত্য বলা যায়। যুগমানস এবং যুগচরিত্র পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যেও জাতীয় সাহিত্যের বিকাশধারা অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ এই সাহিত্যের মধ্যে প্রত্যেক যুগের জাতীয় মানস এবং চরিত্রের উন্মোচন ঘটে—তা যতই বিভিন্ন ও বিচিত্র হোক না কেন। আবার, কোন জাতির বিশেষ যুগের যুগ-প্রতিনিধি সাহিত্যিকদের মানস-ভঙ্গী যত বিচিত্র হোক, তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাঁদের মধ্যে এমন একটা সাধারণ মৌলিকতা থাকে, যা তাঁদের মননে এবং চিন্তনে বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য রক্ষা করে। কেননা, তাঁদের প্রাণধর্ম বা প্রাণবৈশিষ্ট্য একটা অবিচল উৎসকেন্দ্র থেকে উৎসারিত। এই জাতিগত প্রাণধর্ম তাঁদের যুগ-শাসিত সাহিত্যকর্মের মধ্যেও জাতি সত্তার প্রতিফলন ঘটায় এবং জাতির মন ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে রূপায়িত করে। এমনিভাবে যুগে যুগে জাতীয় সাহিত্যে জাতি সত্তার রূপায়ণ ধারা ক্রমান্বিত হয় এবং এই রূপায়ণ যাঁর সাহিত্যকর্মে যত বেশি, সেই সাহিত্যকর্ম তত বেশি 'জাতীয়'।

জাতির প্রাণবৈশিষ্ট্য দিয়েই আমরা প্রত্যেকটা জাতিকে ঠিকমতো চিনতে পারি। আর, এই চেনার কাজ কোন জাতির জাতীয় সাহিত্যের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়। আমরা যখন গ্রীক সাহিত্য,

ইংরেজী সাহিত্য অথবা ফরাসী সাহিত্যের কথা বলি, তখন গ্রীক, ইংরেজ বা ফরাসী জাতির মন ও চরিত্র, প্রতিভা ও প্রাণ, জীবন ও জীবনদর্শনের কথাই বলি। একটা জাতিকে সম্পূর্ণভাবে চেনা তার ইতিহাস দিয়ে হয় না। কেননা ইতিহাসে থাকে তার বাহিরের সভ্যতা, তার বহির্জীবনের ধরন-ধারণ এবং তার বাস্তবের কৃতকার্যতা বা ব্যর্থতার কাহিনী। কিন্তু তার মানসিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য, অন্তর্জীবনের রহস্য, ভাবাবেগ-গঠিত শক্তি এবং বুদ্ধিজ বা আত্মিক জীবনের কথা তার সাহিত্যের মধ্যে থেকেই জানতে হয়। অন্য জাতির থেকে কোন একটা জাতির জীবনদৃষ্টির পার্থক্য ধরা পড়ে তাদের সাহিত্যের তুলনামূলক অনুশীলনে। এসবই, অর্থাৎ একটা জাতির জাতীয় সাহিত্যে আমরা বিশেষ যা-কিছু পাই, তা তার প্রাণ ধর্ম বা প্রাণ-বৈশিষ্ট্যের জন্যই পাই।

বাঙালী-প্রাণেরও নিশ্চয় এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা নিঃসন্দেহে বাঙালীকে অন্য জাতির থেকে আলাদা করেছে এবং তার প্রাণ-বৈশিষ্ট্য দিয়ে যদি আমরা তাকে সঠিকভাবে চিনতে চাই, তবে তার জাতীয় সাহিত্যের মাধ্যমেই তা করতে হবে। তার জীবনবোধ নিশ্চয়ই অন্য জাতির জীবন-বোধের থেকে কিছু না কিছু পৃথক এবং তার অবশ্যই একটা ভিন্ন জাতিসত্তা আছে। বাঙালীর এই জীবনবোধ এবং জাতিসত্তা যুগে যুগে তার জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে বিধৃত, যার এক অভিনব প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাই ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে।

ইংরেজ আমলে বাঙালী নতুন করে তার জাতিসত্তা লাভের সাধনা শুরু করেছিল। তৎকালীন রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি তার মনে এই বাসনার উদ্রেক করে। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইংরেজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য থেকেই এর সূত্রপাত হয়। কর্মে এবং চিন্তায় এর প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের প্রায় গোড়ার দিক থেকে। সাহিত্যে, শিক্ষায়, রাজ-নীতিতে, সমাজকর্মে, ধর্মানুশীলনে এবং ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চর্চায় বাঙালীর নিজস্ব সত্তার উদ্বোধন, প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা ক্রমবর্ধমান তীব্রতা লাভ করেছিল। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৎকালীন বাঙালী মনীষীদের নানা অবদান এর জাজ্বল্যমান স্বাক্ষর। বাঙালী-সত্তার প্রতিষ্ঠা-পর্বের শেষ পর্যায়ে কবি নজরুলের প্রাণে এই সত্তাবোধ সুতীব্র উন্মাদনায় ঝংকৃত হতে থাকে। যে বোধ স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বিদ্যাসাগর, বংকিম, মধুসূদন, মশাররফ হোসেন, গিরীশ ঘোষ, ইসমাইল হোসেন, শরৎচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেক যুগ-প্রতিনিধি সাহিত্যিক মনীষীদের মধ্যে, তারই চরম এবং চূড়ান্ত অনুরণন শোনা গিয়েছিল নজরুলের অপূর্ব কাব্যঝংকারে। শুধু তাই নয়, তৎকালীন বাঙালী এবং ভারতীয় সকল দেশকর্মী, সমাজসেবী, চিন্তানায়ক এবং জ্ঞান-তপস্বীর বাসনা নজরুলের সুরে মূর্ত হয়। দেশ এবং জাতিকে নিয়ে বাঙালী, তথা ভারতীয়দের স্বপ্ন নজরুল কাব্যে যথার্থ বাণীমূর্তি লাভ করে। যুগবাসনা, যুগমানস এবং যুগচরিত্রের কাব্যিক রূপায়ণ একমাত্র নজরুল ইসলামের রচনাতেই পূর্ণতা নিয়ে ফুটে ওঠে। এসব কারণে নজরুল কাব্য যথার্থ জাতীয় কাব্য হিসাবে অভিনন্দিত হবার যোগ্য।

বাস্তবিক পক্ষে, সাহিত্য হচ্ছে যুগের কর্ম এবং ভাবধারার বহুমুখী প্রকাশের একটা দিকমাত্র। এ সম্পর্কে হাডসনের একটা কথা প্রণিধানযোগ্য:

> Literature is only one of the many channels in which the energy of an age discharges itself; in its political movements, religious thought, philosophical

speculation, art, we have the same energy overflowing into other forms of expression.

তাই সাহিত্য যুগের ভাবধারা এবং অনুভূতির স্পর্শে সঞ্জীবিত, বাস্তবায়িত এবং জীবনানুগ হয়ে ওঠে। জাতীয় সাহিত্যের যেমন একটা জাতিগত চারিত্র্য থাকে, তেমনি থাকে যুগচারিত্র্য—সেকথা প্রবন্ধের প্রস্তাবনাতে বলেছি। যুগজীবনের বহিঃপ্রকাশ নানা কিছুর মধ্যে দিয়েই ঘটে, আর তার প্রতিফলন হয় জাতীয় সাহিত্যে। কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তাঁর যুগ এবং জাতিকে এড়িয়ে যেতে পারেন না—তাঁর ভাবচিন্তা যতই বহুমুখী বা সর্বত্রগামী হোক না কেন। গ্যেটের মত অনুসারে প্রতিটি মানুষ তার দেশের শুধু নয়, তার যুগেরও নাগরিক। সুতরাং প্রতিভাবান লেখকদের প্রকাশভঙ্গী যাঁর যা-ই হোক, সমকালের প্রধান ভাবস্রোত বা জাতির স্বতঃস্ফূর্ত জীবন বাসনা তাঁদের রচনার মধ্যে প্রবাহিত হতে বাধ্য। এইভাবেই তাঁদের সাহিত্য জাতির জীবন-স্পন্দনের সঙ্গে স্পন্দিত হয়ে, তার নাড়ীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সজীব, সত্য ও চিরন্তন জাতীয় সাহিত্যের শ্রেণী ভুক্ত হয়। এই কারণে কোন সাহিত্যিককে যুগের সাহিত্যিক বলে নিন্দা করা সাহিত্য সম্পর্কে মূঢ়তারই পরিচায়ক। এতে করে তথাকথিত চিরন্তনবাদী বা কলা-কৈবল্যবাদীদের বাস্তবাতিগ অহমিকাই শুধু চরিতার্থ হয়, আর কিছু নয়।

জাতীয় সত্তাবোধের পরিপূর্ণ এবং সার্থক রূপায়ণ হয়েছিল নজরুল কাব্যে। তাঁর এই বোধ এমন একটি বস্তু, যা জাতীয় জীবনের সার্বিক ধ্যান-ধারণা থেকে উদ্ভূত—শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক, কিংবা সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক এর একমাত্র প্রজনক নয়। তাই নজরুল কাব্যে বাঙালী জাতির একটি সর্বাঙ্গীন শাশ্বত মূর্তি রচিত হয়েছে দেখা যায়। বাঙালীর চরিত্র, হৃদয়, মন এবং মনীষার এমন একটি সমন্বিত রূপ তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে, যাকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কল্পনার ফলশ্রুতি বলা সম্ভব নয়। তৎকালীন কোন বাঙালী সাহিত্যিকের রচনায় জাতির এমন চিরন্তন মানস-মূর্তি আমরা দেখতে পাই না। তাই নজরুল-রচনাসম্ভারকে কেউ যদি শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রেরণা-সম্ভূত একটা অস্থায়ী সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করেন, তবে তিনি নিজের সাহিত্যিক দৃষ্টিহীনতাকে আবৃত করতে পারবেন না। নজরুলের মানসলোকে বাঙালীর যে দীপ্ত আলেখ্য চিত্রিত ছিল, তারই এক কল্পকান্ত মহিমময় রূপ অংকনের লক্ষ্যের দিকে তাঁর সাহিত্য সংকেতিত। নজরুল-কাব্যে দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, আত্মবিশ্বাস, আত্মত্যাগ, উন্মাদনা, তেজ, বীর্য, প্রেম, ঔদার্য ইত্যাদি তাঁর মানসসৃষ্ট শাশ্বত বাঙালীর উজ্জ্বল ও বিচিত্রবর্ণ অঙ্গসজ্জামাত্র। এই অঙ্গসজ্জা নিয়ে, নজরুল-কাব্যে চিরন্তন বাঙালীর রূপকল্পনা যে তীক্ষ্ণ ও শাণিত পৌরুষ-মূর্তিতে দেখা দিয়েছে, তাতে অবশ্য দেশকাল-নিরপেক্ষ একটা সর্বজনীনতার রঙ আছে। এই রঙ সহজেই বিভ্রান্তি জাগাতে পারে—মনে হতে পারে, এই রঙ বিদেশ থেকে আমদানী, এই মানুষ বুঝি 'কোন্ বিদেশী নাইয়া' কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই মানুষের গায়ে কোন বিদেশী সাজ নেই, এর বর্ণ বাংলার শ্যাম-শষ্পিত স্নিগ্ধকান্ত বর্ণ, এর শালপ্রাংশু পেশীগুলি আর্দ্র জলবায়ু-স্পর্শে সজীব-সুঠাম। তার সর্বজনীন রূপের মধ্যেও এগুলি দৃষ্টি এড়ায় না। এটাই বাঙালীর চিরন্তন রূপ—এই রূপেই সে বিশ্বমোহন, বিশ্বজনীন।

কিন্তু নজরুল-কাব্যে এই বাঙালীর কায়া এবং মণীষার মানস-মূর্তি রচিত হলেও তার মানস-চেতনা বা চরিত্ররূপের কোন একটা দিকমাত্র এতে প্রাধান্য পায় নি—সামগ্রিকভাবেই তা পূর্ণ

রূপায়ণ লাভ করেছে। তার মন, অর্থাৎ তার ধ্যান-ধারণা, কল্পনা, অনুভূতি, আবেগ ও চিন্তা যেমন নিরংকুশভাবে ফুটে উঠেছে, তেমনি তার চরিত্র সকল দুর্বলতা-ত্রুটি-বক্রতা সহকারেই রূপায়িত হয়েছে। এবং এভাবেই বাঙালী তার স্ব-স্বরূপে পূর্ণায়ত ও পূর্ণাঙ্গ মূর্তি লাভ করেছে—যার মধ্যে তার চিরন্তন মানস মূর্তিটি সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য। বাঙালীর মন এবং চরিত্রের যথার্থ প্রতিফলনে নজরুল কাব্য তাই খাঁটি জাতীয় কাব্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত। প্রসঙ্গতঃ আর একটা কথা স্মরণীয়। শুধুমাত্র স্বাধীনতা-কামনার একটি যোগসূত্রে তিনি বহুজাতিক ভারতের নানা রুচি, প্রবণতা, সংস্কার, আচার ও অভীপ্সার একটি সংহত বহুবর্ণ জাতীয় মূর্তি অংকন করতে পারেন নি। তাই তাঁর চিন্তায় এই ভারতীয় জাতির যে বৃহত্তর পশ্চাৎপট প্রসারিত হয়েছিল, তার ওপরেই তিনি বাঙালীর চিরন্তন রূপচিত্রখানি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার মন্ত্র খণ্ডিত বাঙালী জাতীয়তারই জন্ম দিয়েছে। তাঁর বীণার ঝংকার, বাঁশীর সুর ছিল সমস্ত ভারতবাসীর জন্য, কিন্তু তা শুনতে পেয়েছে শুধু বাঙালী। তাঁর ওংকার, তাঁর কাংস্যধ্বনি নদ-নদী-অরণ্য-পরিবৃত বিশাল ভারতের ধূসর কান্তারে প্রতিহত হয়ে এই বাংলারই সবুজ কুটিরে প্রতিধ্বনির বজ্রনিনাদ জাগিয়ে তুলেছে। বাঙালী তার নিজের কণ্ঠে নিজের সুর শুনে, নিজের চোখে নিজের রূপ দেখে উচ্চকিত, উদ্বেল, উন্মত্ত হয়েছে। এইভাবেই নজরুল-কাব্য বাঙালীর আত্ম-মুকুর, আত্ম-দর্শন হয়ে দেখা দিয়েছে।

বাঙালীর এই নিজস্ব সত্তাবোধ, শাশ্বত বাংলা এবং চিরন্তন বাঙালীর রূপ-কল্পনা—এসবের প্রেরণা নজরুল পেয়েছিলেন সমসাময়িক যুগ-প্রতিনিধিদের নিকট থেকে। অবশ্য পাশ্চাত্য জীবনচেতনা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে নি, তা নয়। তখনকার যুগচিন্তায় পাশ্চাত্য অনুপ্রাণনা অবশ্যই বিশেষভাবে গণ্য। এই যুগচিন্তায় যে যুগচরিত্র তখন গড়ে উঠেছিল, তা-ই সেকালের সকল মনীষীকে এক গোষ্ঠিভুক্ত করেছিল—তাঁদের সকল মত ও পথের পার্থক্যকে অতিক্রম করে একই বাসনা বা লক্ষ্যের ঐক্যে তাঁরা বিধৃত; অর্থাৎ কবি শেলীর কথায় বলা যায় যে, তাঁদের ছিল, "a general resemblance under which their specific distinctions are arranged." কিন্তু তাদের সবাইকে অতিক্রম করে নজরুল তাঁর রচনায় বাঙালীকে স্ব-সত্তায় সর্বাধিক উজ্জ্বল ও পূর্ণাঙ্গ মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ কারণে নজরুল-কাব্যকে বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কাব্য বলে আখ্যায়িত করতে হবে।

জাতীয় সাহিত্যে বা কাব্যে একটা জাতির যুগযুগ-গঠিত চারিত্র্যধারা উন্মোচিত হয়। শুধু তাই নয়, একটা বিশেষ যুগের পরিবর্তিত জাতীয় প্রাণ-বৈশিষ্ট্যও এতে পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করে। এজন্য জাতীয় কাব্য বা সাহিত্য দিয়েই আমরা কোন জাতির চিরকালীন বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য এবং গৌরবকে উপলব্ধি করি। মানবজাতির আত্মিক এবং মানসিক অবদানের ভাণ্ডারে কোন বিশেষ জাতির কতখানি অবদান রয়েছে, তা তার জাতীয় সাহিত্যই দেখিয়ে দেয়। জাতীয় সাহিত্য জাতির মানস মুকুর এবং তার প্রাণপ্রদীপের উজ্জ্বলতম শিখা। এটা সম্পূর্ণ মৌলিক বস্তু এবং জাতির সত্তাকার স্বকীয় সম্পদ। অন্য কোন জাতির নিকট থেকে ঋণ নিয়ে অথবা তার প্রাণবহ্নি থেকে আলোক নিয়ে এর উজ্জ্বলতাকে বাড়ানো যায় না। তা করতে গেলে এর উজ্জ্বলতা ম্লান এবং সত্তা ক্ষীণ হবেই পড়ে। এক সময় ফরাসী আলোকসজ্জার আবদানীতে ইংরেজীর প্রাণ-প্রদীপটি প্রায় স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। সেটা সতেরো শতকের

দ্বিতীয় পাদ থেকে আরম্ভ করে আঠারো শতকের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে। তখন এমন অবস্থা হয়েছিল যে, ফরাসী সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি বা উল্লেখ ছাড়া ইংরেজী সাহিত্য বুঝবার উপায় ছিল না। সেই রকম জার্মান সাহিত্য-ও ফরাসী সাহিত্যের চাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, যার হাত থেকে ইংলণ্ড জার্মানীকে রক্ষা করেছিল আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ফলে জার্মান প্রতিভা আবার হয়ে স্বকীয় এবং সত্যকার জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টিতে আবার অনুপ্রাণিত হয়েছিল।
পূর্বে উল্লেখ করেছি, আমাদের উনিশ শতকের যুগ-ভাবনায় পাশ্চাত্য অনুপ্রাণনা ছিল। এই অনুপ্রাণনা সেযুগের অন্যান্য যুগ-প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অথবা সোজাসুজি পাশ্চাত্য-সংস্পর্শে নজরুল ইসলামের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। এই বহ্নি সংযোগেই তাঁর প্রাণবহ্নি জ্বলে উঠেছিল এবং তাঁর বহ্নিবীণা নানা রাগিণীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু এই রাগিণীগুলি কোথাও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে নি—তাদের আলাপে-বিস্তারে বিজাতীয় কিছু নেই, অনুকরণাত্মক অথবা অসংস্কৃত রবরও কিছু নেই। তাই দেখি, নজরুল-কাব্যের আলোচনায় রুশো-ভলটেয়ার-হুইটম্যান নিতান্তই প্রক্ষেপণ। বিভিন্ন দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি ইতিহাসের কাল-ব্যবধানেও অনেক সময় অনুরূপ প্রকৃতি লাভ করে। এই অনুরূপ অবস্থায় সেই সব দেশের যুগ-প্রতিনিধিদের চিন্তা এবং কর্মেও ফুটে ওঠে সাদৃশ্য, প্রকাশে এসে যায় সমান্তরাল অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তিকে প্রভাব বলে মনে করা যায় না। কবির কাব্যানুভূতির sincerity যদি থাকে—যদি তা জাতির বা কবির জীবনের বাস্তব ঘটনাগুলি বা অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হয়, কাব্যের অনুভূতি যদি সত্যের অনুভূতি হয়, তবে তা প্রভাবের অপবাদে কলংকিত হতে পারে না কখনো। প্রভাব বলতে যা বুঝায়, নজরুল-কাব্যে তার অন্বেষণ সমালোচনায় বেকারত্ব নামে অভিহিত হবার যোগ্য। নজরুল-কাব্যের কোথাও sincerity-র এতটুকুও অভাব নাই - বিদ্রোহ-ভাবাত্মক, বিপ্লবাত্মক, প্রেমভক্তি-মূলক এবং প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায়, গানে বা গজলে। অনুক্ষণ অনুভূতির তাড়নায় তাড়িত, আত্মগত ও জাতিগত ভাবাবেগের দোলায়-দোলায় চঞ্চল, অস্থিরচিত্ত কবির মানসলোকের গোপন কন্দরে অপচয়ণের কূট-জাল বিস্তারের অবকাশ ছিল না এতটুকু—কবির জীবন, বাস্তব পরিবেশ এবং কাব্য-সাধনার সম্মিলিত ইতিহাস একথারই সাক্ষ্য দেয়।
নজরুল-কাব্যে জাতিসত্তার রূপায়ণে এবং জাতির বিশেষ প্রাণধর্মের অভিব্যক্তিতে মেকিত্ব নেই—কেননা, জাতির বৃহত্তর এবং যুগ-লালিত জীবনচেতনা থেকেই তা উদ্ভূত। আবার, এই জীবনচেতনা কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত, অভিজ্ঞতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বাস্তব জীবন-পরিবেশ এবং আত্মপ্রবৃত্তি থেকেই কবি এই জীবনচেতনা লাভ করেছিলেন। তাই তাঁর জীবন দর্শনেও কোন ফাঁকি নাই। সুতরাং শিল্পক তত্ত্ব হয়ে বা একটা পোশাকী চাকচিক্য নিয়ে তা কাব্যে রূপায়িত হয় নাই। তাঁর প্রাণাবেগের অবারণ উচ্ছলতা এবং উন্মাদনা সহজ জীবন সত্যেরই স্তব-নিরঞ্জন বহিঃপ্রকাশ। তাঁর ঋজু এবং সবল প্রকাশ-ভঙ্গীতে তাই তির্যক ও বর্ণালী রশ্মিজাল বিকীর্ণ হয় নাই। কিন্তু তাতে করে কাব্যসত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয় নাই—বস্তুর রহস্য এবং তাৎপর্য, বস্তুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এবং স্বার্থ অবলীলায় অনির্বচনীয়রূপে উদ্ঘাটিত হয়েছে—বৃহত্তর জীবনসত্য মহত্তর কাব্যসত্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে।
কবির কাব্যে যা কাব্যরূপ লাভ করে, তাঁর গদ্য রচনায়, বক্তৃতায় বা আলোচনায় অনেক সময়ই তার তাত্ত্বিক পরিচয় ফুটে ওঠে। এজন্য কাব্য আলোচনার পরিপূরক হিসাবে প্রথমে কোন

কবির গদ্য রচনার অনুশীলন প্রয়োজন, অথবা কাব্য এবং গদ্য রচনার যুগপৎ আলোচনার প্রয়োজন। নজরুল ইসলামের গদ্য রচনাগুলির, বিশেষতঃ প্রবন্ধ এবং সম্পাদকীয় রচনাগুলির মধ্যে তাঁর জীবন-চেতনা তদ্রূপ লাভ করেছে এবং তাঁর জীবনদর্শন-রূপেই প্রতিভাত হয়েছে। বাঙালী জাতি সত্তার বোধ এবং বাঙালীর প্রাণ-বৈশিষ্ট্য এক বলিষ্ঠ, সুস্পষ্ট এবং অনন্য সাধারণ প্রকাশভঙ্গী লাভ করেছে এগুলির মধ্যে। সুতরাং প্রধানতঃ কবির প্রবন্ধ জাতীয় রচনাগুলি এবং অতঃপর তাঁর কাব্য-পরিক্রমার উদ্দিষ্ট লাভই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লক্ষ্য। অবশ্য কবির উপন্যাস এবং নাটক শ্রেণীর রচনাগুলির মধ্যেও তাঁর উল্লিখিত জীবনদর্শন বা জাতিসত্তার বোধ শিল্পরূপ লাভ করেছে। কিন্তু সে আলোচনা যে এর আয়ত্তাধীন নয়, তা প্রবন্ধের শিরোনামে সুস্পষ্টভাবেই সূচিত।

[দুই]

কবির জাতিসত্তার অনুভূতিকে আমরা গতানুগতিকভাবে জাতীয়তাবোধ বা জাতীয়তাবাদ বলে অনেক সময়ই উল্লেখ করি। কিন্তু, রাজনীতি-শাস্ত্রে যাকে জাতীয়তা বা nationality বলে, নজরুলের জাতীয়তার চেতনা তার চেয়ে ব্যাপকতর ছিল এবং তা জাতীয়তার মূল কয়েকটি উপাদানের মধ্যেই সীমিত নয়। তাঁর এই অনুভূতির সঙ্গে মিশ্রিত আছে ঐতিহ্যপ্রীতি, সংস্কারবোধ, যুগচেতনা, ধর্মজ্ঞান, ভাবাবেগ, বিপ্লবানুভূতি, ন্যায়নীতি-চিন্তা এবং ঐক্যকামনা। এসবের সম্মিলিত চেতনাবোধ তাঁর জাতিসত্তার চেতনারূপে কাব্যের আবেগমণ্ডিত বাণীরূপ লাভ করেছে। ফলে এর আবেদন জাতীয়তার শর্তগুলি সম্পর্কে ধারণার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি—এর আবেদন সম্পূর্ণ আত্মিক ও চিরন্তন হয়ে ফুটে উঠেছে এবং তা একটি দুর্জয় ও দুর্মর অনুভূতিরূপে প্রতিভাত হয়েছে। রাজনীতিবিদ্ রোজ জাতীয়তা সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, তা নজরুল-কাব্যের জাতীয়তার অনুভূতি সম্পর্কে বিশেষ-ভাবে প্রযোজ্য। রোজ জাতীয়তাকে বলেছেন :

> it is a union of hearts, once made, never unmade—it is a spiritual conception, unconquerable, indestructible.

হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনে, আত্মিক ঐক্যে বা একাত্মতায় জাতীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়, অমরত্ব লাভ করে। নজরুল-কাব্যে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ, আত্মিকভাবে ঐক্যবদ্ধ, জাতিকে স্বাধীনতার তোরণে পৌঁছিয়ে দেবার সুদৃঢ় প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, জাতীয় চেতনা মূলতঃ একটা আত্মিক চেতনা—সকল, রাজনীতিবিদ্ অন্ততঃপক্ষে একথাটা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, যদিও তাঁরা সবাই রোজের কথার সবগুলি মানেন না। রাজনীতিবিদ্ ল্যাস্কি-ও বলেছেন,

> ultimately, that is, the purity of that corporate soul we call a nation is only maintained when the forces of the spirit are the masters of its life. It is only debased when it lends itself to other forms of power, and debasement is always easier than elevation.

জাতির জীবনে আত্মার আধিপত্য যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তার জাতিত্বের অবক্ষয় বা অধঃপাত ঘটে না। আর, সাহিত্য বা শিল্পের মাধ্যমেই আত্মার আধিপত্য জাতির জীবনে সর্বাধিক বিস্তারিত এবং দৃঢ় হতে পারে। অপরপক্ষে, জাতিসত্তার বোধ একটা স্পিরিচুয়াল ব্যাপার বলেই তা কাব্যিক প্রেরণা হয়ে দেখা দেয় এবং চমৎকার কাব্যিক অভিব্যক্তি লাভ করে। তাই কাব্যশাস্ত্রে এটা দেশপ্রেম বা জাতিপ্রীতি নামে একটা সঞ্চারী ভাব হিসাবে স্থান লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, নজরুল-কাব্যে এর আশ্চর্য সার্থকতামণ্ডিত অভিব্যক্তি ও বাণীমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।

নজরুলের জাতীয় চেতনা বা জাতিসত্তার অনুভূতি যেমন রাজনীতি-শাস্ত্রের সংজ্ঞাবাচক জাতীয়তার গণ্ডীভুক্ত নয়, তেমনি তা একটি বৃহৎ পটভূমিতে স্থাপিত। বাঙালী জাতির সত্তাবোধ যদিও তাঁর কবিমানসে ধ্রুব হয়ে অংকিত ছিল, কিন্তু তাকে সর্বভারতীয় জাতিসত্তার পটভূমিতে স্থাপন করেই তিনি দেখেছেন। রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি বাঙালী জাতীয়তাকে ভারতীয় জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত করে দেখেছেন, অথচ তাঁর চিন্তা অনুভূতি-ভাব-আবেগ উদ্বেল হয়ে উঠেছে এবং প্রেরণা লাভ করেছে খাঁটি বাঙালী জাতিসত্তার অনুভূতি থেকে। তিনি জানতেন, স্বাধীনতা, শুধু বাঙালীর জন্য পৃথকভাবে আসবে না—সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এজন্য প্রকাশ্যত: এবং প্রায়শ: তাঁকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারক এবং বাহক বলেই মনে হবে। ফলে নজরুল যে জাতির মুক্তি কামনা করেছিলেন, তা ছিল অখণ্ড ভারতীয় জাতি। গান্ধীজী এই অখণ্ড জাতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বলে তাঁকে কবি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর মতো তিনিও ভারতে এক অখণ্ড মহাজাতির স্বপ্ন দেখতেন :

> আমরাই ভারতে আবার অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিব। যে রক্তপায়ী বৃদ্ধ এতটুকু 'চুঁ' করিবে, তাহার গর্দান ধরিয়া এই মুক্তির দিনে বাহির করিয়া দাও। যে আমাদের পথে দাঁড়াইবে, তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া ফেল। (ছুঁৎমার্গ)।

লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে সমস্ত ভারতবাসীর শোকদুঃখের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তা বোধের উপলব্ধিতে তিনি উদ্বেল হয়েছেন :

> হিন্দু-মুসলমান—মাড়োয়ারী—বাঙালী—হিন্দুস্থানী কোন ভেদাভেদ ছিল না, কোন জাতবিচার ছিল না,—তখন শুধু মনে হইতেছিল, আজ এই মহাসগমতলে দাঁড়াইয়া আমরা একই ব্যথার ব্যথিত বেদনাতুর মায়ের, দুটি স্নেহহারা ছোটভাই"। (লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য)।

নজরুল ছিলেন বৃহত্তর অর্থে জাতীয়তাবাদী,' খণ্ডিত বাঙালী জাতীয়তার কথা তিনি পৃথক্ ভাবে চিন্তা করেন নাই এবং তিনি সকল ভারতীয়ের মধ্যে ঐক্য কামনা করেছিলেন—এগুলি সবই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু কবির বৃহত্তর জাতীয় চেতনার মধ্যে বাঙালী জাতীয়তা-বোধের বীজমন্ত্রটি সবসময়ই জাগ্রত এবং সোচ্চার ছিল। ক্ষণেক্ষণে তা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তীব্র-দ্যুতি ছড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাঙালী জাতীয়তার বাসনা একটি চির-লালিত অনুভূতিরূপে কবির প্রাণে প্রেরণার উৎসমুখ অবারিত করেছিল। বাঙালীকে জাগাতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> ওরে আমার ভারতের সেরা, আগুন খেলার সোনার বাঙলা! কোথায় কোন্ অগ্নিগিরির তলে তোর বুকের অগ্নিসিন্ধু নিস্তব্ধ নিস্পন্দ হয়ে পড়ল? কোন্ অলস-কন্যা কল্পনার দেবতার বাঁশীর সুরে সুরে তোর উত্তাল অগ্নিতরঙ্গমালা স্তব্ধ নিথর হয়ে পড়ল? (আমি সৈনিক)।

দেশবন্ধুর কারানুভূতিতে উদ্ভাসিত হয়ে তিনি বাঙালীর মৃত কংকালে প্রাণ সঞ্চারের জন্য তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন :

> দেখেছ কি ভীষণ ধূম্রকুণ্ডলী উঠেছে বাঙলার আকাশ-বাতাস ছেয়ে। বল ঋষি, 'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল, বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল পুণ্য হউক, পুণ্য হউক পুণ্য হউক, হে ভগবান।' এস ঋত্বিক, উচ্চারণ কর শব-সাধনার মন্ত্র। এই শবের মাঝে শিব জাগাতে হবে। পারবে?—তবে এস।" (স্বাগত)।

শাশ্বত বাংলা এবং চিরন্তন বাঙালীর জন্য কবি-প্রাণের গোপন কন্দরে যে একটি কোমল অনুভূতি সযত্ন-লালিত কুসুম-গন্ধ ছড়াতো, তার পরিচয় আছে 'জাগরণী' শীর্ষক রচনাটিতে। এখানে 'বকুল'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি বলেছেন :

> তুমি যেখানে ফোট, সেই পল্লীতেই আছে আমাদের সত্যিকার বাঙলা—বাঙালীর আসল প্রাণ। আমাদের এই শাশ্বত বাঙালীর সুষুপ্ত, ঘুমে-ভরা অলস প্রাণ জাগিয়ে তোল তোমার জাগরণের সোনার কাঠি দিয়ে।

কবির এই শাশ্বত বাঙালী আঘাতে-আঘাতে জেগে-ওঠা আত্মপ্রবুদ্ধ বাঙালী। এই বাঙালী বিদ্রোহী, বিপ্লবী, রুদ্র বাঙালী। মৃত্যুর মাঝে সে উদ্বুদ্ধ। সৌন্দর্যের নয়, বীভৎসতার দীক্ষায় সে দীক্ষিত। সে প্রেম-করুণার উপাসক নয়—তিক্ততা, দাহনজ্বালা আর কর্কশ কাঠিন্যের উপাসক। জীবনের গৌরবে, যৌবনের শক্তিমদে সে দৃপ্ত উচ্ছৃংখল। তাই কবি কোমল স্নেহমায়া দিয়ে, নিস্তেজ শুশ্রূষা দিয়ে প্রাণহীন, তন্দ্রাবিষ্ট, আত্মবিভোল জাতিকে বাঁচিয়ে তুলতে চান নি – তাকে প্রলয়-শিঙার আহ্বানে, মৃত্যুপথে ধাক্কায়-ধাক্কায় ঠেলে দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছেন। তার জন্য তিনি চান মৃত্যুংদেহি মন্ত্র—এই বোধনমন্ত্রে জাগ্রত বীর বাঙালীই ছিল তাঁর শাশ্বত বাঙালী।
নজরুলের জাতিসত্তার অনুভূতি বা জাতীয় চেতনা শুধুমাত্র বৃহত্তর ভারতীয় জাতীয়তার পটভূমিতেই স্থাপিত হয় নি, বিশ্বাত্মতা বা মহামানবতার মিলন তীর্থে তার সংকীর্ণতা অপনোদিত হয়েছে। মহামানবতার মহাজাগরণে বিশ্বাসী কবি মনে করেন, আজ নবযুগের নবসৃষ্টির শুভ মুহূর্ত সমাগত। এখন বিশ্বে উৎপীড়িত জনগণের মুক্তির পর্ব। বিশ্বমানবের মুক্তিকামী কবির দৃষ্টিতে তাই :

> —একই দুঃখে দুঃখী জনগণ দেশ, জাতি, সমাজের বহির্বন্ধন ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। আজ তাহারা এক, আহারা একই ব্যথায় ব্যথিত, নিপীড়িত সত্তা মানবাত্মা। (নবযুগ)।

কবির জাতীয় চেতনা এইভাবে আন্তর্জাতিক চেতনা বা বিশ্বমানবের অনুভূতিতে সর্বজনীন ও সর্বকালিক রূপলাভ করেছে। এই বিশ্বাত্মতার অনুভূতি থেকেই কবি শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা চিন্তা করেছেন। তিনি ভাবলোকবিহারী আদর্শবাদী মানবতার পূজারী ছিলেন না—সত্যকার গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা এবং শোষণহীন সমাজের মধ্য দিয়েই তিনি মানবতার মুক্তি চেয়েছিলেন। এই আন্তরিক অনুভূতির জন্য তিনি সকল রকম শোষণের হাত থেকে মেহনতী মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। 'ধর্মঘট' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে এই 'পতিত উপেক্ষিত নিপীড়িত হতভাগাদের' জন্য তাঁর বেদনাবোধ চূড়ান্ত আকারে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে কয়লাখনির কুলিদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

কোম্পানী তো তাহাদেরই দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছেন, কিন্তু এ হতভাগ্যদের স্বাস্থ্য, আহার প্রভৃতির দিকে ভুলেও চাইবেন না। এই কুলিদিগের চেহারার দিকে তাকাইয়া কেহ কখনো চিনিতে পারিবেন না যে, ইহারা মানুষ কি প্রেতলোক-ফেরতা বীভৎস নরক-কঙ্কাল।

মুক্ত মানবতার পূজারী কবির জাতীয় চেতনা এইভাবে বিশ্বমানবতা ও সর্বমানবিকতার মহাস্পর্শে পরিশুদ্ধ হয়েছে এবং উদার মহিমা লাভ করেছে।
নজরুল জাতির জন্য রাজনৈতিক মুক্তি বা স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। সেযুগে ভারতের মুক্তির যে কয়জন মনীষী জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য নিজের নিজের ক্ষেত্রে দুর্জয় সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, নজরুল তাঁদের অন্যতম। তীব্র ও দুর্দমনীয় জাতীয় চেতনা থেকেই তিনি এই সংগ্রামের প্রেরণা ও শক্তিলাভ করেছিলেন। কাব্য জাতীয়তাকে বাস্তবায়িত করতে তখনই ইংরেজের নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ বা রাজনৈতিক স্বাধীনতাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাই তাঁর সাহিত্যে স্বাধীনতার বাণী দৃপ্ত ও উদাত্ত সুরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে প্রায় সর্বত্র।
অবশ্য এই স্বাধীনতার চেহারা সম্বন্ধে কবির নিজস্ব ধারণা ছিল সুস্পষ্ট এবং সহজ। স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসনের মতো যেসব বাণীর ব্যবস্থার মধ্যে সার্বভৌম স্বাধীনতা নেই। আছে সীমিত স্বাধীনতা কবির তা কাম্য ছিল না। পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব ছিল তাঁর লক্ষ্য। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্র, জাতীয় সরকার ইত্যাদি জাতীয়তাবাদের মৌল শর্তগুলি যে তাঁর মানসপটে ধ্রুব হয়ে অংকিত ছিল, তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটেছে এই কথাগুলিতে :

> সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।
> স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা, ওকথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। (ধূমকেতুর পথ)।

তিনি জাতির পূর্ণমুক্তির জন্য যেমন শর্তযুক্ত সীমিত স্বাধীনতা চান নি, তেমনি এব্যাপারে বিদেশী সরকারের নিকটে আবেদন-নিবেদনের পক্ষপাতীও ছিলেন না। কাতর-কাকুতির দ্বারা বা কলা-কৌশলের পরোক্ষ পদ্ধতিতে স্বাধীনতা লাভ তাঁর লক্ষ্য ছিল না। একারণেই তিনি রবীন্দ্রনাথ অথবা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি, যদিও তাঁদের বাসনার সঙ্গে তাঁর বাসনার কোন পার্থক্য ছিল না। স্বাধীনতার ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোষহীন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমেই তিনি দেশ স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন—বিদেশীর দয়ার দান হিসাবে স্বাধীনতা চান নি। কেননা, তাহলে তাদের কাছে থাকতে হবে কৃতজ্ঞ এবং তাদের প্রস্তাব বা ইচ্ছাকে অতিক্রম করাও হবে না সম্ভব। জাতিকে আপন বীর্যে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে; এর জন্য রক্তদান, মৃত্যু, ধ্বংস বা বিপর্যয়ে কাতর হলে চলবে না। কেননা এইভাবে অর্জিত স্বাধীনতাই সত্যকার স্বাধীনতা—এই ছিল তাঁর মত।
তাঁর এই মতের সঙ্গে তৎকালীন মনীষীদের মতের মিল হয় নি। গান্ধীজী, অরবিন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শের পার্থক্য এবং তাঁর চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন।

আমি যতটুকু বুঝতে পারি, তার বেশী বুঝবার ভান ক'রে কেন কারুর শ্রদ্ধা বা প্রশংসা পাবার লোভ না করি। তা সে মহাত্মা গান্ধীরই মত্ হোক, আর মহাকবি রবীন্দ্রনাথেরই মত্ হোক কিংবা ঋষি অরবিন্দেরই মত্ হোক। আমি সত্যিকার প্রাণ থেকে যেটুকু সাড়া পাই রবীন্দ্র, অরবিন্দ বা গান্ধীর আহ্বান ঠিক ততটুকু মানব। তাঁদের বাণীর আহ্বান যদি আমার প্রাণে প্রতিধ্বনি না তোলে, তবে তাঁদের মানব না। (ধূমকেতুর পথ)।

কিন্তু এই উক্তিকে অনেকে একটা ভাবপ্রবণ কবির অর্থহীন অমবিকার চর্চা বা অকারণ দম্ভোক্তি বলে মনে করেছেন এবং তার ন্যায্য মূল্য দেন নাই। সেযুগে অনেকেই সস্তা সুনাম অর্জন বা সুবিধা আদায়ের জন্য গান্ধী, অরবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের নিজস্ব সত্তাবোধ ছিল না, অন্ধ অনুকরণেই তাঁরা নিঃশেষ হয়ে গেছেন। নজরুল তাঁদের পথে যাননি—তাই তাঁকে অনেক ব্যঙ্গ এবং উপেক্ষার আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর নিজ বীর্যে স্বাধীনতা অর্জনের মন্ত্রে সফল হলে হয়তো স্বাধীনতা আজ এত দুর্বহ বলে মনে হতো না। হয়তো বৃটিশের দয়ার দান এই স্বাধীনতার মতো তা উপমহাদেশে এক দীর্ঘস্থায়ী অভিশাপ হয়ে যুগে যুগে নানা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের বন্যা বইয়ে দিত না, এর সুদূরপ্রসারী বিষক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ প্রাণ জর্জরিত হতো না।

জাতির সেবা, দেশের কাজ, নিঃস্বার্থ কর্ম ও ত্যাগের দ্বারা যে দেশের বা জাতির কল্যাণ হয়, তা তিনি মানতেন, কিন্তু সংগ্রাম, রক্ত আর বিপ্লব ছাড়া যে সত্যকার মুক্তি আসতে পারে না, সে সম্পর্কে তিনি ছিলেন স্থির নিশ্চিত। পরোক্ষ পন্থীদের পথে যথার্থ স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে না—তাই তাদের অভিভাবানুতা, সংগ্রামভীরুতা এবং কাপুরুষতাকে তিনিও প্রত্যাঘাত করেছেন ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের কশায়। গান্ধীর অহিংসা-নীতি রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির একটা নির্জীব কৌশলমাত্র। এতে স্বাধীনতা আসতে পারে কিন্তু তা স্থায়ী, যথার্থ এবং গৌরবদীপ্ত স্বাধীনতা নয়। অহিংসবাদীদের এই নির্বীর্য স্বাধীনতা কামনাকে কবি তীব্রভাবে কশাঘাত করেছেন এইসব শ্লেষবাক্যে :

মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা-বোল নাকি-নাকি,
খাঁড়ায় কেটে কর্‌মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি
হানতরবার, আন্‌মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদীগুলোয় কর্‌মা পুরুষ, রক্ত দেয়া, রক্ত দেখা।

(আনন্দময়ীর আগমনে)

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে জাতীয় মুক্তির দিশারী ছিল না, এর বিশ্বজনীনতা যে ভারতবাসী বা বাঙালীর পরাধীনতা শৃংখল-মোচনে অক্ষম, নিম্নোক্ত শ্লেষগুলিতে তা নিপুণ শৈল্পিক অভিব্যক্তি লাভ করেছে :

রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে আজ দিগন্তরে,
সে কর শুধু পশলো না মা অন্ধ কারার বন্ধ ঘরে।
গগন-পথে রবি-রথের সাত সারথি হাঁকায় ঘোড়া,
মর্ত্তে দানব মানব-পিঠে সওয়ার হয়ে মারছে কোঁড়া।

(ঐ)

বাস্তবিক পক্ষে, জাতির রাজনৈতিক মুক্তির ব্যাপারে নজরুল তৎকালীন মনীষীদের দ্বারা প্রভাবিত হন নি, যদিও তাঁদের মধ্য দিয়েই তিনি জাতীয়তার অনুভূতি লাভ করেছিলেন। পূর্বে বলেছি, তাঁদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাঁর মৌল আকাঙ্ক্ষার পার্থক্য ছিল না, কিন্তু তিনি নিজ অন্তরের সত্যবোধের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন। তিনি দেশের মানুষ এবং তাদের জীবনকে রাজনীতির কৃত্রিম কুটিল চোখে অথবা উপরতলার দৃষ্টিপাতে দেখেন নি—বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি দিয়েই দেখেছিলেন এবং দেশ ও জাতিকে আপন করে পেয়েছিলেন। এই আপন করে পাওয়াতেই তাঁর মধ্যে খাঁটি জাতিসত্তার বোধ জেগে উঠেছিল, আর এই সত্তাবোধই তাঁকে দিয়েছিল সত্যবোধ। খাঁটি জাতীয় চেতনাজাত এই সত্যবোধ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বিদ্রোহীর রক্তনিশানতলে জাতিকে সংবদ্ধ করতে, মূল্যবান স্বাধীনতাকে আপন শক্তিতে বিদেশীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে। তাই আজীবন তিনি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, বিদ্রোহী হয়েছেন, মুক্তির গান গেয়েছেন, রাজনীতি করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, সাহিত্যের সাধনা করেছেন।

আপন বীর্যে স্বাধীনতাকে জয় করার পক্ষপাতী ছিলেন বলে তিনি বিপ্লবী বীরের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং জাতিকে বিপ্লবের মুক্তিমন্ত্র দান করেছিলেন। প্রথমতঃ বিদ্রোহের মাধ্যমেই তিনি এই বিপ্লব সাধন করতে চেয়েছিলেন, এইজন্য প্রধানতঃ তাঁকে আমরা বিদ্রোহীরূপে দেখতে পাই। পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তিনি এই বিদ্রোহকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট:

> "পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন, বাঁধন-শৃংখল, মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে। (ধূমকেতুর পথ)।

বিদ্রোহী হিসাবে কবির ব্রত ছিল যেমন কঠোর তেমনি অনমনীয়। তিনি তাঁর বিদ্রোহী-মূর্তির স্বরূপ অংকন করেছেন এইভাবে:

> আর্তের অশ্রুমোচন আমার নয়, আমার রণতূর্য। আমি প্রলয়ের, আমি প্রেমের নই। আমি রুদ্রের, আমি করুণার নই। আমি সেবার নই, আমি যুদ্ধের। আমি সেবক নই, আমি সৈনিক। ......আমি সুন্দর নই, আমি বীভৎস। আমি বুকে নিতে পারি না, আমি আঘাত করি। আমি মঙ্গলের নয়, আমি মৃত্যুর। আমি হাসির নয়, আমি অভিশাপের। (আমি সৈনিক)

কবির এই বিদ্রোহী-রূপ অদ্বিতীয়, অপূর্ব। তীব্র জাতীয় চেতনা এবং জাতিসত্তার বাস্তবায়নের অদম্য আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে এই সৃষ্টিছাড়া বিদ্রোহী মূর্তি দান করেছিল।

স্বাধীনতার জন্য নজরুল বিদ্রোহ বা বিপ্লবকে অপরিহার্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এর মন্ত্র কে দেবে এবং কারা এই মন্ত্রে মুক্তি আনবে? তিনি স্বয়ং বিদ্রোহীরূপে মন্ত্রদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আর, যারা এই মন্ত্রসিদ্ধ মুক্তিসাধক, তারা তাঁর কাব্যে বলিষ্ঠ প্রত্যয় এবং মনোজ্ঞ চিত্ররূপে কাব্যরূপলাভ করেছে। কবি জানাচ্ছেন, তাঁর পথ বাধা-সংকুল, রক্ত-পিছল, কণ্টকময়। তাই এপথে মুক্তি আনতে উৎসর্গ চাই বীর্যবান, ত্যাগী ও বিপ্লবী আত্মার। যারা দেশের বীর সন্তান সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে অম্লান মুখে বিসর্জন দিয়ে যারা দুঃখের তপস্যায় জীবন উৎসর্গ করবে, জীবনের বিত্তের সকল দিয়ে অত্যাচারী শাসক ও তার শাসনকে করবে বিধ্বস্ত, তারাই আনবে বিপ্লব,

করবে দেশ স্বাধীন, গঠন করবে জাতি। যারা রক্তচক্ষু কাপালিক, শব ও রক্তের সাধনা যাদের, ক্ষুদিরামের মন্ত্রে ফাঁসীর রজ্জু কণ্ঠে নিয়ে যারা নীলকণ্ঠ, তারাই দেশ ও জাতির মুক্তিদাতা, পরিত্রাতা। এরাই দেশমাতৃকার যোগ্য সন্তান। শিব বা কল্যাণকে জাগাতে যৌবনের লক্ষ বলিদান প্রয়োজন। ছিন্নমস্তার পূজায় বলি হতে হবে মায়ের এই সন্তানদেরই—তবেই আবার জাহান্নামের মধ্যে পুষ্পের হাসি ফুটবে মৃত্যুর মাঝে জাগবে জীবন, হা-হুতাশের মধ্যে বেজে উঠবে মঙ্গল শংখধ্বনি। এদের মধ্যেই রয়েছে কবির চিরন্তন বাঙালী—চিরকালের বাঙালীর নিকটে যারা পূজনীয়, নমস্য। দেশমাতৃকার যূপকাঠে আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ, তরুণ বিপ্লবী শক্তির অধিকারী এই শাশ্বত বাঙালী না জাগলে কবির আশা পূর্ণ হবে না—দেশ স্বাধীন হবে না। তাই এদের জাগানোই ছিল কবির প্রধান ব্রত। কিন্তু লালিত মধুর সুরে আহ্বান করলে এরা জাগবে না কখনো—কঠিন আঘাত হেনে, যুগজীর্ণ নিষ্প্রাণতাকে চূর্ণ করে জাগাতে হবে এদের। পরাধীনতা, অপমান আর লাঞ্ছনায় যারা অদৃষ্টকে শুধু ধিক্কার দেয়, যারা আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তিহীন, তাদের তীব্র আঘাতে, অস্থির যন্ত্রণায় জাগিয়ে তোলবার জন্য কবি রুদ্র-দেবতাকে আহ্বান করছেন:

> কোথায় আঘাতের দেবতা। আঘাত কর, আঘাত কর তাদের, যারা চোখের সামনে মায়ের অপমান, দেখে শুধু ক্রন্দন করে, প্রতিকারের পন্থার অন্বেষণে উন্মত্ত উল্লাসে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে না। অবমানিত হয়ে যাদের চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত না হয়ে অশ্রুজল নির্গত হয়, তাদেরে আঘাত কর, আঘাত কর, হে আঘাতের দেবতা। (রুদ্র-মঙ্গল)

কবি 'তুবড়ী বাঁশীর ডাক' দিয়ে এই আহত কাল-কেউটেদের বিবর থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের বিষ-নিঃশ্বাসে মারণ-ছোবলে বিশ্ব জর্জরিত হোক—তবেই বিধাতা তাঁর ভুল সংশোধন করে বিশ্বকে আবার নতুন করে গড়বেন—আসবে মুক্তি, স্বাধীনতা। মুক্তিকামী কবি এইভাবে মুক্ত-বিশ্বের অঙ্গনে জাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর 'ভাঙার গানে'র অন্তরালে আছে জাতীয় মুক্তি-চেতনার অফুরন্ত উৎসধারা। 'দুর্দিনের যাত্রী' এই স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তি-সাধনারই গদ্যময় সাহিত্যরূপ।

নজরুল ছিলেন সত্যকার বিপ্লবী মনে প্রাণে বিপ্লবী। পুরাতনকে ভেঙে তার বুকে নতুনকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। 'অগ্নিবীণা'র দাহনজ্বালা 'বিষের বাঁশী'র বিষতান এই কারণেই, 'ধূমকেতু'র ধ্বংস নিশান উড়িয়ে এই কারণেই তিনি বিদ্রোহী হয়েছিলেন। এগুলি তাঁর সৌখীনতা বা একটা খেয়ালমাত্র নয়, অথবা জোর করে বাঙলা সাহিত্যে একটা চমক-লাগানো ভাবধারার সৃষ্টিও নয় তা। তিনি পোশাকী বিপ্লবী ছিলেন না। জাতির ঘুণেধরা জীর্ণ অবস্থাটাকে বস্তুবাদীর চোখে দেখতে পেরেছিলেন তিনি এবং তার ধ্বংসোন্মুখ গলিত জীবনব্যবস্থার অন্তিকুতাকে মর্মেমর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই মনেপ্রাণে এর ধ্বংস কামনা করেছিলেন এবং এই ভগ্নস্তূপের ওপরে নতুন জাতিসত্তার বুনিয়াদ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কবির চোখে এক নবোদিত নবীন জাতির উজ্জ্বল মহিমা স্থির জ্যোতির্মালা বিকীর্ণ করেছিল। জাতিসত্তার এই অভয় মানস-মূর্তিকে তিনি এক সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমির ওপরে স্থাপন করতে চেয়েছেন:

> এদেশের নাড়ীতে-নাড়ীতে অস্থিমজ্জায় যে পচন ধরেছে, তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাতি গড়ে উঠবে না। যার ভিত্তি পচে গেছে, তাকে একদম উপড়ে

ভেঙে নতুন করে ভিত্তি না গাঁথলে তার ওপর ইমারত যতবার খাড়া করা যাবে, ততবারই তা প'ড়ে যাবে। (আমার পথ)।

কবি নজরুলের এই নির্ভেজাল, অত্যুজ্জ্বল জাতি-চেতনার মধ্যে হীনমন্য তথাকথিত 'ভদ্র-লোক'দের বিশেষ স্থান ছিল না। কৃত্রিম শহুরে মানুষরাই জাতি নয়। যারা দেশের মাটির সঙ্গে সংলগ্ন, দেশের বৃহত্তর জীবন প্রবাহের মধ্যে যাদের জীবন নিত্য-স্পন্দিত, সেই তথাকথিত 'ছোটলোক'দের বাদ দিয়ে জাতির কল্পনা করা যায় না। এদের সম্পর্কে অজ্ঞাত এবং উপেক্ষা-ভাবের জন্যই আমরা আজো এক শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে পারি নাই। কিন্তু এরাই জাতি—এদের সত্যিকার মানুষের মর্যাদা দিতে হবে, এদের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে এবং এদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হবে। কবির ভাষায়:

দেশের অধিবাসী লইয়াই তো দেশ এবং ব্যক্তির সমষ্টিই তো জাতি। আর সে-দেশকে, সে-জাতিকে যদি দেশের, জাতির সকলে বুঝিতে না পারে, তবে তাহার উন্নতির আশা করা আর আকাশে অট্টালিকা নির্মাণের চেষ্টা করা একই কথা। তোমাদের এই আভিজাত্য গর্বিত, ভণ্ড, মিথ্যুক ভদ্র সম্প্রদায় যারা (যাহাদের অধিকাংশেরই দেশের, জাতির প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা নাই) মনে কর কি দেশ উদ্ধার হইবে, জাতি-গঠন হইবে? (উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন)।

এই উপেক্ষিত বিপুল জনশক্তিকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ না করতে পারলে যেমন জাতি-গঠন সম্ভব নয়, তেমনি এদের উত্থানেই মুক্তি সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই মুক্তির জন্য তিনি সকল শ্রেণীর মানুষ—কৃষক-শ্রমিক, মুটে-মজুর, ছাত্র-সৈনিক, নারী-পুরুষকে বিপ্লবের পথে আহ্বান করেছেন। সমগ্র জাতির মুক্তির মধ্যেই তিনি সত্য বা কল্যাণকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই সত্যকে ধ্রুব করে নিজের পথ সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন: "দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য, শুধু তাই লক্ষ্য ক'রে এই আগুনের ঝাণ্ডা দুলিয়ে পথে বাহির হলাম।" (আমার পথ)। গান্ধীজী জনতাকে স্বাবলম্বী হতে, আত্মশক্তিতে ও আত্মনির্ভরতায় উদ্বুদ্ধ হতে প্রেরণা দিতেন বলে তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। 'আমার পথ' প্রবন্ধে তার পরিচয় আছে। এসব থেকে বুঝা যায়, নজরুলের জাতি-চেতনায় সংকীর্ণতার কোন স্থান ছিল না এবং তাঁর মানবতাবোধও কল্পলোকের বস্তু ছিল না। জাতিকে কেন্দ্র করেই তাঁর মানস-চেতনায় তা স্থান লাভ করেছিল। জাতির মুক্তি-স্বপ্নেই তাঁর মানবতাবোধ উৎসারিত হয়েছে।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, যুগ-জীবনের নতুন পটভূমিতে জাতিসত্তার তীব্র অনুভূতি, প্রবল স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষা, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অদম্য সাধনা—নজরুল-মানসিকতার এগুলি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। নজরুল ইসলাম যেযুগে সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হন, সে যুগের যুগমানসে ঐগুলি ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং জাতি আসন্ন মুক্তি-প্রতীক্ষার অধীর মুহূর্ত যাপন করছিল—একথা ঐতিহাসিক সত্য। যুগজীবন ও যুগমানসের নিখুঁত এবং নিপুণ প্রতিবিম্বনে তাই নজরুল সাহিত্য অনন্য সাধনার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নজরুলমানস যুগচিন্তার চিহ্নিত পথেই পরিক্রমণ আরম্ভ করে এবং যুগস্বপ্নী স্বভাবনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হয়। সেযুগের জাতির মন ও মানসিকতা, প্রাণধর্ম এবং জীবনদর্শন নজরুল-সাহিত্যে এইভাবেই সার্থক রূপায়ণ লাভ করেছিল; যার জন্য তা শ্রেষ্ঠ জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথে যেমন আধুনিক জীবনচেতনা, শরৎচন্দ্রে যেমন সমাজ-চেতনা, নজরুলে তেমনি জাতীয় চেতনা তাঁদের সাহিত্যকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে অনবদ্য দান করেছে। কিন্তু নজরুলের কাজ তাঁদের মতো শুধু রূপায়ণেই—জাতিসত্তা, জাতির মন ও চরিত্রকে রূপায়িত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁকে এই মন এবং চরিত্র অনেকাংশে গঠন করতে হয়েছে, জাতিসত্তার নতুন মূর্তি রচনা করতে হয়েছে। জাতিকে মুক্তির পথে প্রেরণা দিতে হয়েছে, জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষা দিতে হয়েছে, শক্তির সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে হয়েছে তাঁকে। যুগের মূল বাসনাকে তাঁকে কাব্যে এবং জীবনে প্রতিফলিত করতে হয়েছে। এসব কারণে শিল্পীর তন্ময় সাধনা, নির্লিপ্ত একাগ্রতা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শিল্পকে ছাপিয়ে শিল্পীই আমাদের কাছে দীপ্ত হয়ে ফুটে উঠেছেন—শিল্পের মধ্যে আত্মগোপন করতে পারেননি তিনি। তাই কবি নজরুলের মধ্যে ব্যক্তি-নজরুল, বিদ্রোহী নজরুল, দেশপ্রেমিক নজরুল, বীর নজরুল অত্যন্ত প্রকট। কবি তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে শুধু আত্মপ্রকাশই করেন নাই, আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবেই ধরা দিয়েছেন, দৃঢ় আলিঙ্গনে আমাদের আবদ্ধ করেছেন। এইজন্যই তিনি এত জনপ্রিয়, এত আমাদের কাছের মানুষ।

প্রত্যেক যুগের যুগ-নিয়ামক শক্তি যুগন্ধর পুরুষদের প্রতিভার মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। নজরুল-প্রতিভার মধ্যে যে যুগ-নিয়ামক শক্তি নিহিত ছিল, যুগচরিত্র নির্মাণে এবং তার সংস্কারে তা নিয়োজিত হয়েছিল—অবশ্য, তা তাঁর কাব্য বা সাহিত্যের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। সেকালের যুগচরিত্রে একদিকে যেমন পৌরুষ, স্বাধীনতা-স্পৃহা, বিপ্লবী চেতনা এবং গণতান্ত্রিক বোধ ছিল, তেমনি আবার হীনমন্যতা, কাপুরুষতা, অমানবিকতা, আত্মসম্মানবোধের অভাব, অনৈক্য এবং গোঁড়ামিও ছিল প্রচুর। নজরুল জাতীয় চরিত্রের উল্লিখিত দুর্বলতা এবং ত্রুটিগুলি বিতাড়িত করে একটি সুস্থ সবল, বলিষ্ঠ, নির্ভীক, সংস্কারমুক্ত ও দেশপ্রেমিক জাতীয় চরিত্র গঠনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এই কাজে তাঁর কবি-শক্তির চেয়ে আত্ম-শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল বেশি। তাই আত্ম-শক্তিতে বলীয়ান তাঁর ব্যক্তি-চরিত্রই আমাদের কাছে বেশি প্রোজ্জ্বল। এই আত্ম-শক্তির প্রবল প্রভাবে জাতির মন ও চরিত্র নির্মাণে নজরুল-কাব্য সর্বাধিক সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। এ কারণে নজরুল-কাব্য জাতির নিকটে চিরন্তন প্রেরণার উৎস এবং এই প্রেরণা সেযুগে জাতিকে অনেক দুর্লংঘ্য বাধা জয় করবার শক্তিও দান করেছিল। তাই, বাঙালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় সাহিত্য হিসাবে নজরুল-কাব্যের মূল্য অপরিসীম।

যুগ-নিয়ামক শক্তি কবির লেখনীকে আশ্রয় করে নানারূপে প্রকাশিত হয়েছে। জাতির চরিত্র গঠন বা পুনর্গঠনের জন্য তাঁর লেখনীর কশাঘাত তার মধ্যে অন্যতম। এইভাবে তিনি আত্মবিস্মৃত জাতিকে আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন করে তোলবার চেষ্টা করেছেন। গোলামী বা দাস-মনোবৃত্তিকে তিনি ঘৃণা করেছেন এবং তীব্রভাবে বিদ্রূপ করেছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং চাকুরীজীবীদের হীনমন্যতায় তিনি ব্যথিত হয়েছেন। স্বাধীনচিত্ততা এবং আত্মসম্মানবোধকে তিনি জাতীয়তার শর্ত বলেই প্রায় মনে করতেন এবং যা-কিছু এগুলিকে খর্ব করে তার নিন্দা করেছেন। তাঁর ভাষায় :

> আমরা আজ ভারতে এক অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিতে চলিতেছি, আর আজো যদি আমাদের আত্মসম্মান না জাগে,—আজো যদি আমরা আত্মবিশ্বাসে ভর করিয়া নিজের মনুষ্যত্ব ও পুরুষকারের জোরে মাথা উঁচু করিয়া বিশ্বের মুক্ত পথে চলিতে না পারি,

তবে আমাদের জাতি-গঠন তো দূরের কথা, মুক্ত-দেশের জন্যে একথা তুলিয়ে মাথার টোকা লাগাইয়া বলিয়া দিবে যে, আগে মাথা উঁচু করে চলতে শেখো। (বাঙালীর ব্যবসাদারী)।

জাতীয় বিশেষত্বকে নজরুল জাতীয়তার একটি বড় অঙ্গ বলে মনে করেছেন। অন্যকে অনুকরণে যে মনুষ্যত্ব হারাতে হয়, বিজাতীয়ত্ব যে জাতীয়তার পরিপন্থী, তা তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন :

বিজাতীয় অনুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ 'হনুকরণে' পরিণত হইয়া হইয়া পড়িয়াছে। পরের সমস্ত ভালোমন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়ার আজ্ঞা, নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্তাকে নেহায়েৎ খর্ব করা হয়। নিজের শক্তি, স্বজাতির বিশেষত্ব হারানো মনুষ্যত্বের মস্ত অবমাননা। (সত্য শিক্ষা)।

আমাদের জাতীয় অনুভূতিতে কোন প্রকার আঘাতও তিনি সহ্য করেন নি। এদেশবাসীর প্রতি ইংরেজের ঘৃণা এবং উপেক্ষার বিরুদ্ধে তিনি বিষোদ্গার করেছেন। ভারতীয়দের মনুষ্যত্বকে স্বীকার করতে ইংরেজরা যে কুণ্ঠিত, ইংরেজের এই বর্বরোচিত স্বভাবকে কবি তীব্রভাবে তিরস্কার করেছেন। এগুলিকে তিনি আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতি আঘাত ও অবমাননা বলে মনে করেছেন।
ধর্ম এদেশবাসীর চরিত্র এবং মনের একটি নিয়ামক-শক্তি। নজরুল-প্রতিভা তাই ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন বা নির্বিকার থাকতে পারে নি। ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য এবং শক্তি দিয়ে তিনি যুগজীবনকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, যুগচরিত্র এবং যুগমানসকে পরিমার্জিত ও শুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। নজরুলের মধ্যে যুগ-নিয়ামক শক্তির এ এক অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। ধর্ম বা ধর্মের বাহিরের কাঠামোটাকে তিনি জাতীয়তার অঙ্গ বলে স্বীকার করেন নি। যে মানবধর্ম বা মানবতা ধর্মের মর্মসত্য, তাকেই তিনি জাতীয়তার শর্ত বলে মনে করেছিলেন। যে কোন ধর্মের গণ্ডীর ভেতরে থেকেও মানুষ এই মানবতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক জাতিতে সংহত হতে পারে। তিনি বলেন :

হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমাহারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া—মানব!—তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি। বল দেখি, 'আমার মানুষ ধর্ম'। দেখিবে, দশদিকে সার্বভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁপিয়া উঠিতেছে। (ছুঁৎমার্গ)

ধর্ম কখনো সত্যকার মানবধর্মের বিরোধী হতে পারে না। কিন্তু একে যারা স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চায়, তারাই একে মানবতার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়। তিনি ছিলেন এই ধর্মীয় স্বার্থবাদ এবং গোঁড়ামির সম্পূর্ণ বিরোধী। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর এই উদার পথ নির্দেশিত হয়েছে 'ধূমকেতু' পত্রিকার লক্ষ্য সম্পর্কে বক্তব্যের মধ্যে :

'ধূমকেতু' কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোন্‌খানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য হিংসার দুশমনীর ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। (আমার পথ)।

এই উদার মানবধর্ম বা মানবতাবাদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণতলে নজরুল হিন্দু-মুসলমানকে মিলিত করতে চেয়েছিলেন। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ এবং হানাহানিকে তিনি সহ্য করতে পারেন নি। ধর্মের মূল শিক্ষাকে উপেক্ষা করে ধর্মের নামে উন্মত্ততা, নৃশংসতা এবং কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে তিনি ঘৃণা করেছেন। ধর্ম যদি মানুষকে পশুত্ব শিক্ষা দেয়, মানবধর্মকে বিসর্জন দিয়ে বাহিরের আচার-বিচারই যদি তার কাছে বড় হয়, তবে তা প্রকারান্তরে অধর্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়। সত্যকার জাতীয় চেতনা বা জাতীয়তাবোধ থেকেই এই উদার মানবধর্মের অনুভূতি কবির মনে জেগে উঠেছিল। তিনি এটা সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমানে বিভেদনীতিই এতদিন ধরে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের উদ্দেশ্য সফল করেছে, এদেশের মানুষকে সুদৃঢ় একজাতিত্বের বুনিয়াদে দাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ মুক্তি-সংগ্রামে জয়ী হতে দেয় নি। তাই, শুধু, ধর্ম, গোষ্ঠি বা শ্রেণীগত সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর এবং মহত্তর মানবধর্মে দীক্ষিত হতে পারলেই এদেশে এক মহাজাতির সৃষ্টি সম্ভব। মুক্ত মানবতার উদার তীর্থে হিন্দু মুসলমানের মিলিত একটি অখণ্ড জাতিসত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং তখনই তারা চির-স্বাধীনতার লক্ষ্যে উপনীত হবে—এই ছিল কবির বিশ্বাস। তাই হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং মানবতাবোধের অভাবকে তিনি জাতীয়তার বিরোধী বলে মনে করতেন এবং এগুলির বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীও ছিল সংগ্রামমুখর।

এই মহামানবতার উপলব্ধি কবির প্রকৃতিসিদ্ধ এবং কবিপ্রাণের সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। মানুষের জন্য প্রাণভরা দরদ এবং তার আবেগময় প্রকাশ অনেকস্থলেই অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। কবিসুলভ সরলতা, মানবপ্রীতি এবং বিশ্ববোধ তাঁর কাব্যে অনাড়ম্বরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কবির মানবপ্রীতি এবং জাতিপ্রীতি একই অনুভূতি সঞ্জাত—অবিভাজ্য, অচ্ছেদ্য। জাতিকে ভালোবেসেই তিনি সর্বমানুষকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন। নানা ধর্মের ও শ্রেণীর মানুষে গঠিত তাঁর জাতির প্রতি উদার প্রেমই তাঁকে মহামানবতার পূজারী মানবপ্রেমিক কবি হিসাবে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেছিল। তাঁর 'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থে 'মন্দির ও মসজিদ' এবং 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটিতে একথাগুলির যাথার্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

সত্যকার জাতীয় চেতনার পরিপন্থী বলে নজরুল ধর্মের ভণ্ডামিকে সহ্য করতে পারেন নি। জীবনে এবং ধর্মে ভণ্ডামি, কৃত্রিমতা এবং কুটিলতা এদেশের জীবনকে কতখানি পঙ্গু করে ফেলেছে, তার নিখুঁত চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। কেননা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন:

-----সারা দেশটা ভরা আজ এক বিরাট উন্মাদিনীনা, শুধু মস্তিষ্কহীনের প্রলাপ আর ক্লীবের ক্রন্দন। যেখানে যত দোকানপাট, ঘর-সংসার, সাজ-সজ্জায়, সকলের মাঝে এর বিরাট ভণ্ডামি, ধর্মের নামে কাঁকিবাজি। (আজ চাই কি)।

তাই প্রশ্ন করেছিলেন, ভগবানের নাম মুখে এনে যারা শয়তানের ভাবে জীবন পূর্ণ ক'রে কেবল কপটতার, প্রবঞ্চনার, পুণ্য লৌকিকতার বড়ত্ব জাহির করে, বিধাতার বিশ্বধ্বংসী বজ্রনির্ঘোষ আঘাত তাদের অহংকারকে চূর্ণ, নিষ্পেষিত করে না? এ অন্যায়ের পাপলীলা এই মানুষের জগতে, এই দেবতার ভারতে আর কতদিন চলবে'? (ঐ)।

এইভাবে তৎকালীন যুগজীবনের ক্লেদাক্ত বিকৃত রূপ তাঁর রচনায় নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। জীবনের এই মিথ্যা, পাপ এবং পংকিলতাকে পুড়িয়ে-গুঁড়িয়ে সুস্থ-সবল, নিষ্কলুষ জীবন গড়ে তুলতে হবে—তাই প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর বিদ্রোহের, বিপ্লবের। তাই তিনি চাষীর রূপকে বলেছিলেন:

> ওগো আমার ওস্তাদ চাষী, তুমি তোমার সাধের জমিতে সোনার ফসল ফলাবার আকাঙ্ক্ষা যদি করে থাক, তা'হলে তোমার সেখানে আবর্জনা ক'টিক দুষ্টকীটের বাসা পুষে রাখলে চলবে না। সব সাফ করতে হবে। সব জমি গুঁড়িয়ে পিষে ফেলতে হবে, তবে তো ফলবে তাতে পরিপূর্ণ নবজীবনের পরিপুষ্ট ফসল। (ঐ)।

তাঁর এই রূপক-সৃষ্টির মধ্যে যে বিদ্রোহ বা বিপ্লবের ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়েছে, তা নিছক রাজনীতি-চিন্তার ফল নয়। তিনি একটি মুক্ত, উন্নত, বলিষ্ঠ, কুসংস্কারমুক্ত, ভাগ্যপ্রবুদ্ধ জাতীয় জীবন কামনা করেছিলেন। এই জীবনের পরিপন্থী যা-কিছু, তার বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর বিদ্রোহ—শুধুমাত্র রাজদ্রোহ তা নয়। এই বিদ্রোহ, তথা বিপ্লবের মাধ্যমেই তিনি জাতিকে তার স্বকীয় সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করতেন।

নজরুলের লেখনী জাতীয় চরিত্রের দোষগুণ উদ্‌ঘাটনে যেমন তৎপর ছিল, তেমনি তাকে সত্যকার জাতীয় চেতনার ভিত্তির ওপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেও সক্রিয় ছিল। উদার ধর্মবোধ, স্বকীয় জাতীয় বিশেষত্ব, নিষ্কলুষ দেশপ্রেম, বলিষ্ঠ স্বাধীনচিন্তা এবং তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাজ্ঞানে সমৃদ্ধ একটি উন্নত জাতীয় চরিত্রের গঠনে তাঁর কবিক্ষমতা নিয়োজিত ছিল। এইভাবেই তাঁর যুগন্ধর প্রতিভায় যুগ-নিয়ামক শক্তির অভিব্যক্তি ঘটে। তাই, যুগমানস ও যুগচরিত্রের রূপায়ণেই শুধু নয়, যুগের মন ও চরিত্র নির্মাণে তাঁর সাহিত্য সর্বাধিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে। শাশ্বত বাঙালীর চরিত-মানসে বিংশ শতকের এই সংযোজন নজরুল-কাব্যের মাধ্যমে যতটা সম্ভব ও সার্থক হয়েছে, অন্য আর কিছুতে তা নয়। বাঙালীর প্রতিভা ও জীবন দর্শনের এক বিশেষ বিংশ শতকীয় বহিঃপ্রকাশ শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করেছে নজরুল কাব্যে। তাই, বাঙালীর জাতীয় কাব্যের আধুনিক পর্বে নজরুল কাব্য উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের মতো দীপ্যমান।

[তিন]

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে স্বাধীনতার জন্য যে উন্মাদনা এবং পরাধীনতার জন্য বিক্ষোভ, নজরুল-কাব্য তারই একটি শৈল্পিক বাণীময় প্রকাশ। আধুনিক কালের ভারতীয় জীবন-সমস্যার প্রধান দিক, যা তৎকালীন চিন্তানায়ক, ভাববাদী, জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক,

বিপ্লবী ও কর্মীদের প্রাণ আলোড়িত ও মথিত করেছিল, তারই ভাবধারার অভিব্যক্তিতে নজরুল-কাব্য পরিপূর্ণ। সুতরাং উপমহাদেশের জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে নজরুল কাব্য ইতিহাসের একটি স্থায়ী ও মূল্যবান সম্পদ। সেই যুগের ইতিহাস ও পরিপ্রেক্ষিত তাঁর আশ্চর্য শাণিত ও দীপ্ত ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছিল। তাঁর স্বাধীনচিত্ততা, নির্ভীকতা, বলিষ্ঠতা, ত্যাগ ও সংগ্রামী চরিত্র তাঁর কাব্যকে এমন এক বীর্যদৃপ্ত বৈশিষ্ট্য দান করেছে, যা ভারতীয় অন্য কোন কবির কাব্যে অনুপস্থিত। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায় দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য, উচ্ছৃংখল উন্মাদনা এবং বিক্ষুব্ধ আত্মার অগ্নিস্রাবী বিস্ফুরণ তৎকালীন পরিবেশ-সৃষ্ট তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির আত্মোপলব্ধি বা অহংবোধ কোন আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন, কিংবা বোধি বা নিছক কবি-চেতনা কি?—বরং তা বহির্বিশ্বের পট-প্রেক্ষিতে কবির জাতীয় অনুভূতি বা যুগচেতনারই প্রতিক্রিয়ামাত্র। জাতির পরাধীনতার অসহনীয় বেদনা, তার চির-বন্দীদশার তীব্র ক্ষোভ কবির মধ্যে অপরিসীম আত্মশক্তি জাগিয়ে তুলেছিল। এই শক্তিবলে পরাধীন বিশ্বকে বিধ্বস্ত করে নতুন স্বাধীন জগৎ গড়ার জন্যই কবির এত বিক্ষোভ এবং উন্মত্ততা, প্রচণ্ডতা। তিনি যখন বলেন:

> মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
> চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ছাড়ি'
> ভূলোক-দ্যুলোক-গোলোক ভেদিয়া
> খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
> উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর।

তখন একথা মনে করা যায় না যে, নিছক তত্ত্বজ্ঞানীর মতো তিনি সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের 'আত্মানাং বিদ্ধি' প্রচার করছেন। তাঁর এই আত্ম-জাগৃতি, অহংপ্রচার একারণেই, —'আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব-সৃষ্টির মহানন্দে'। একারণেই কবির এই আত্মশক্তিতে প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের এমন অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুৎ-বিকাশ, অথবা তা 'খেয়ালী বিধির বক্ষ ভিন্ন' করার জন্যই—যে খেয়ালী বিধি তাঁর জাতি এবং দেশের ললাটে চির-পরাধীনতার অনপনেয় কলংক লেপন করেছে।

প্রাণধর্মের দিক থেকে নজরুল একজন শাক্ত কবি। মানবতা, তথা জাতির মুক্তির জন্য শক্তির সাধনাকেই তিনি অমোঘ বলে মনে করেছিলেন। শক্তির দ্বারাই পরাধীনতার শৃংখল মোচন করতে হবে, বিদেশী শাসকদের নিকটে মনুষ্যত্ব বিক্রয়ের দ্বারা অথবা করুণ কাকুতির দ্বারা নয়। এইজন্য ভারতবাসীর বা বাঙালীর ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতিকার করতে গিয়ে তিনি এই শক্তির দ্বারা পরাধীন বিশ্বের রূপ পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই মহাকল্পনার রূপায়ণে মহা-প্রলয়ের প্রয়োজন এবং এমন একটি বিদ্রোহী চরিত্রের মাধ্যমেই তা সম্ভব, যে সকল যুগের উদ্ধত ও দুর্বিনীত মানবশক্তির পুঞ্জীভূত বহিঃপ্রকাশ। তাই হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের সকল শক্তি-কল্পনাকে কবি তাঁর বিদ্রোহী-মূর্তি রচনায় ব্যবহার করেছেন। 'বিদ্রোহী' এবং 'ধূমকেতু' কবিতায় তিনি এই চরিত্র কল্পনার আশ্চর্য সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বিদ্রোহী বিশ্বদ্রোহী—বিধাতার খামখেয়ালে যে বিশ্ব দুর্বলের শত্রু, অবহেলিত-অবমানিতের অর্জিত অধিকার, সেই বিশ্বের বিরুদ্ধেই তার বিদ্রোহ। সুতরাং বিশ্বচেতনার মহত্তর অনুপ্রেরণাই তাঁর বিদ্রোহী-

ধ্বংসের পরিকল্পনা ওতপ্রোত—শুধুমাত্র রাজনৈতিক চেতনা এর মূলে নয়। এইজন্য বিদ্রোহী ধূর্জটির মতো বিপ্লবাদের অজগর দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে চায়, নবসৃষ্টির মহানন্দে অধীন বিশ্বকে উৎপাটিত করে ফেলতে চায়, বিশ্বতোরণে মানব-বিজয়কেতন উড়িয়ে দিতে চায়। তাই বিদ্রোহী বলে,—

আমি   জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ঐ চাতুরী
      বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি!
আমি   জানি জানি ঐ ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তা'ও।
তাই   বিপ্লব আনি, বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তা'ও।

(ধূমকেতু : অগ্নি-বীণা)

এই শক্তির সাধনা কবি হিন্দু বা ইসলাম ধর্মের মধ্যে যেখানে যতটুকু ত্যাগ, বীরত্ব, শৌর্য, মানবতা, সাম্যের সন্ধান পেয়েছেন, তাকেই কাব্যের ঝংকারে অভিনব ঔজ্জ্বল্য দান করেছেন। তিনি রুদ্র-দেবতার শক্তিময় এবং সংহারলীলাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, শ্বেতবসনা অন্নপূর্ণাকে শক্তিরূপিণী, রক্তাম্বরধারিণী-রূপে আবাহন করেছেন। সন্তানের রক্ত পান করে রক্ত-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য তিনি রুদ্রাণী মহামাতাকে আহ্বান করেছেন:

অনেক পাঁঠা মোষ খেয়েছিস, রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা ;
আয় পাষাণী, এবার নিবি আপন ছেলের রক্তসুধা।
দুর্বলদের বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি পূজা
দূর করে দে, বল্ মা, ছেলের রক্ত মাগে মা দশভুজা

(আনন্দময়ীর আগমনে)

এই ছিন্নমস্তা চামুণ্ডার মধ্যে তিনি দেশমাতৃকার প্রতীক খুঁজে পেয়েছিলেন, তাই মুসলমান হয়েও তাঁকে মা বলে ডাকতে তাঁর এতটুকু দ্বিধাবোধ হয় নি। দেশ-মাতৃকার আগমনে এবং তাঁর সন্তানদের আত্মবলিদানেই আসবে বৃহত্তর কল্যাণ, মুক্তি বা স্বাধীনতা—এইভাবে তিনি হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যকে কাব্যের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ঠিক তেমনি মুসলিম ঐতিহ্যও তাঁর কাব্যে শক্তির প্রতীকে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈদের কোরবানীকে তিনি শক্তির জাগরণ বলে চিহ্নিত করেছেন। তাই বলেন: "ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন।" (কোরবানী : অগ্নিবীণা)। কবির দৃষ্টিতে যিনি 'রহমান' ; তিনিই 'রুদ্র'। শক্তির সাধনাতেই রয়েছে মুক্তি। কেননা, জননী হাজেরা প্রিয় পুত্রকে বলির পবিত্র বসন পরিধান করিয়ে এবং ইব্রাহীম পুত্রকে কোরবানী দিয়েই সত্য এবং মুক্তি লাভ করেছিলেন। কবির ধারণায়—"সত্য মুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই-সে খুন মোচন।" (ঐ)। এই ত্যাগ, এই আত্মদান, এ-ও শক্তিরই সাধনা। মোহররম কবির চোখে সেই ত্যাগ ও বীরত্বের প্রতীক, তাই বলেছেন :

ফিরে এলো আজ সেই মোহররম মাহিনা,
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।

(মোহররম : অগ্নি-বীণা)

মোহররমের তাৎপর্য তুলে ধরে কবি মুসলমানকে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা করেছেন—ঐতিহ্যের পথে তাকে ডাক দিয়েছেন—যে পথ ত্যাগের, শৌর্যের, স্বাধীনতার সংগ্রামের অর্থাৎ এককথায়, শক্তির। যেমন:

জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দারী হাঁক
শহীদের দিনে সব লালে লাল হয়ে যাক্।
নওশার সাজ নাও খুন-খচা আস্তীন,
ময়দানে লুটাতে রে লাশ এই খাস্ দিন।

(ঐ—ঐ)

কিন্তু মুসলমান এখানে একটা উপলক্ষমাত্র—তিনি গোটা জাতিকেই এই শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সংগ্রাম এবং রক্তদানের মধ্য দিয়েই পরাধীনতার শৃংখল ভেঙে আবার স্বাধীনতার জয়-পতাকা উত্তোলন করতে হবে। এই পথ শক্তির পথ এবং এই পথেই আসবে জাতীয় জীবনের মুক্তি। উল্লিখিত ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যকে তিনি শুধু কাব্যের উপাদান করেন নি, হিন্দু এবং মুসলমানকে নিজ নিজ ধর্মের ঐতিহ্য থেকে শক্তি আহরণ করে এক শক্তিশালী, স্বাধীন ও অখণ্ড জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছেন। ধর্মকে তিনি জাতীয়তার অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকার না করলেও ধর্মের মূল বাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দু-মুসলমান সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে বৃহত্তর এক-জাতীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে, এটাই ছিল তাঁর বিশ্বাস এবং এই অর্থেই তিনি ধর্মকে তাঁর কাব্যে স্থান দান করেছেন। এই কারণেই উভয় ধর্মের ঐতিহ্য তাঁকে কাব্য-প্রেরণা দান করেছিল। এই ধর্মীয় বোধ এবং ঐতিহ্যচেতনা তাঁর কবিধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বলেই তাঁর বৃহত্তর ভাবানুভূতির অনুষঙ্গী হয়ে কাব্যে এক নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে।
জাতি বলতে নজরুল বিশেষ ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমিত কোন সম্প্রদায়কে কিংবা নির্দিষ্ট আচার-বিচারের দ্বারা সংকীর্ণ কোন গোষ্ঠীকে মনে করতেন না। সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। তাই এদেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত এক মহাজাতিকে তিনি এক-জাতীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করার প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু তখনো জাতীয়তাবাদ এদেশের মাটিতে বৃহৎ বনস্পতি-রূপে পূর্ণ-বিকশিত হয় নাই। তার নবোদ্ভিন্ন সুকুমার বৃক্ষতনুটি যেন মুক্ত বাতাস ও স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের জন্য মাত্র শীর্ষ উত্তোলন করেছিল। তার বিশেষ পরিচর্যাই ছিল তখন প্রধান কাজ। এই কাজে তখন যেসব মনীষী নিজেদের বিশেষভাবে নিয়োজিত করেছিলেন, নজরুল ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কোন ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে সংস্কৃতি-জীবনচর্যা-সহধর্মিতায় ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন ও সার্বভৌমরূপে কোন জাতির বসবাস করতে চাওয়াটাই তার জাতীয়তাবোধের মূল পরিচয় এবং এই আকাঙ্ক্ষা তীব্র, অদম্য এবং সংগ্রামমুখী না হওয়া পর্যন্ত তার লক্ষ্য সুদূরপরাহত। সেযুগে রাজনৈতিক নেতৃগণ, সমাজকর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা যথাসম্ভব সাফল্যের সঙ্গে এই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন, কিন্তু কাব্যে, সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় নজরুল জাতীয়তাবাদের মন্ত্রকে যতটা হৃদয়বেদ্য এবং সংবেদনশীল করে তুলেছিলেন, এতটা আর কোন ভাবেই সম্ভব হয় নাই। বিশেষতঃ বাঙালীকে তিনি এই মন্ত্রে যতখানি উজ্জীবিত, সক্রিয় ও সংগ্রামী করতে পেরেছিলেন তার কোন তুলনা নেই। জাতীয়তাবোধ এমন একটি বস্তু, যা সম্পূর্ণরূপে ভাবের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত;

তা যতটা পিরিচুয়াল, ততটা ফিজিক্যাল নয়। সুতরাং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জাতীয়তাবোধ সুনিশ্চিত ও স্থায়িভাবে রূপ পেতে যতখানি বেগ পায়, সাহিত্যে তা নয়। কেননা, রাজনীতির আবেদন মানুষের কার্যকলাপের নিকটে, আর, সাহিত্যের আবেদন মানুষের আত্মায়, প্রাণে, হৃদয়ে। এই কারণে শুধু নজরুলের দ্বারা নয়, সেকালের প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীর দ্বারা জাতীয়তাবোধ যতটা বাঙালী-প্রাণে দৃঢ়মূল হতে পেরেছিল, অন্যান্য ভারতীয়দের প্রাণে তা পারে নি। তাই আজো এই উপমহাদেশে বাঙালীই একটি মাত্র জাতি, যাকে সত্যিকার অর্থে জাতীয়তাবাদী বলা যেতে পারে। এর মূলে বাঙালীর উন্নততর সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের অবদানই যে সর্বাধিক ক্রিয়াশীল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।
সেকালে ভারতীয় অপর কোন কবি তাঁর কবিকর্মের ভেতর দিয়ে জাতীয়তাবোধকে এতটা জাগ্রত ও সফল করে তুলতে পারেন নি। এদিক থেকে নজরুল নিঃসন্দেহে অনন্যসাধারণ। 'বিষের বাঁশী' কাব্যেই তাঁর জাতীয়তাব ভাবনা সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়েছে। এই কাব্যে তিনি জ্বালাময়ী, উন্মাদনাময়ী বাণীতে জাতির প্রাণে তীব্র প্রেরণা এবং অফুরন্ত শক্তির সঞ্চার করেছেন, জাতিকে প্রচণ্ড আকর্ষণে নিয়ে চলেছেন—যেখানে তার জন্য রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা, মুক্তি ও প্রশান্তি। এখানে তাঁর ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীর অবারণ উচ্ছৃংখল বিচ্ছুরণ অনেকটা সংযত ও পরিপক্ব, কিন্তু আবেদন সূচীমুখ তীক্ষ্ণ এবং স্থায়ী, অন্তরের নিবিড়তায় স্পর্শকতার এবং অব্যর্থ-লক্ষ্য। যেমন:

> 'বন্দী থাকা হীন অপমান'। হাঁকবে সে বীর তরুণ,—
> শিরদাঁড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ,
> সত্য-মুক্তি, স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,
> খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের।
> দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের,
> সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের।
>
> (সেবক : বিষের বাঁশী)।

কবির এই সংযত অথচ উদ্দীপ্ত ভাষা তীক্ষ্ণ-শাণিত বজ্রদীপ্তি ছড়িয়ে দিয়েছে, যখন তা অত্যাচারী শাসক-শক্তির ওপরে খড়্গাঘাতরূপে হয়েছে উদ্যত। কঠিন প্রত্যাঘাতের দ্বারা শাসক-শক্তিকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করবার দৃঢ় সংকল্প ধ্বনিত হয়েছে সেই ভাষায় :

> শৃঙ্খলিতা সে জননীর ব্যথা বাজিয়া এ ক্ষীণ বুকে
> অগ্নি হয়ে যা জ্বলেছিল খুন, বিষ উঠেছিল মুখে,
> শৃঙ্খল-হানা অত্যাচারীর বুকে বাজপাখী সম
> পড়িয়া তাহারে ছিঁড়িতে চেয়েছি হিংসা-নখরে মম,— (উৎসর্গ : ঐ)।

জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কবি দেশোদ্ধারের কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এই জন্য তাঁকে জীবনের সকল সুখশান্তি বিসর্জন দিয়ে, স্নেহ-প্রেমাদি সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে পরিত্যাগ করে তিক্ত দুঃখের পথ অবলম্বন করতে হয়েছিল। জীবনের এবং কাব্যের মুগ্ধ-সাধনায় কবি জাতীয় জীবনের

এবং জাতিসত্তার রূপান্তর ঘটানোয় প্রয়াসী ছিলেন। 'বিষের বাঁশী'র ভূমিকা কবিতাটিতে কবি তাঁর বাস্তব জীবনের এই দৃঢ়-কঠিন ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংকেত দান করেছেন :

তোর তরে নয় শীতল ছায়া, পান্থ-তরুর প্রেম-আসার,
তুই যে ঝড়ের শান্তি-শত্রু, রুদ্র শিবের চণ্ড মার।
প্রেম-স্নেহ তোর হারায় যে রে
কশাই-কঠিন তুই পাষাণ।
আয়রে চির-তিক্ত প্রাণ।

জাতীয় কাব্য হিসাবে নজরুল-কাব্যে জাতীয়তাবোধের শুধু উদ্বোধন, জাগরণ, বিকাশ বা পূর্ণতা সাধন হয় নাই, এই কাব্যের সুরে কবি জাতির প্রাণে সুউচ্চ আশা, উদ্দীপনা, দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছেন। কিন্তু তা শুধু কাব্যের কলাকৌশলে বা মোহিনী মায়াতেই সম্ভব হয় নি, তার সঙ্গে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃসহ দুশ্চর তপস্যা। জাতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাই তাঁকে এই তপস্যার শক্তি দিয়েছিল। তাই সংগ্রামের কণ্টকিত পথে নেমে তিনি এতটুকু নিরাশ বা নির্বীর্য হন নি, তাঁর মধ্যে ক্ষণিকের জন্যও এতটুকু ক্লান্তি বা বিরক্তি জাগে নি। প্রাণের অনির্বাণ দীপালোকে তিনি জাতিকে লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করেছেন, অভয়-মন্ত্রে, বিজয়-মন্ত্রে তার মধ্যে দুর্মর আশাকে সঞ্জীবিত রেখেছেন। তাঁর এই আশাবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে 'বিষের বাঁশী'র 'বোধন', 'অভয়-মন্ত্র', 'আত্মশক্তি', 'জাগৃহী', 'বন্দী-বন্দনা', 'বন্দনা গান', 'মুক্তি-সেবকের গান', 'শিকল-পরার গান' ইত্যাদি কবিতায়। তিনি কল্পনায় দেখেছেন, যেন সুরাসুরের যুদ্ধে —বিপ্লব-বিপর্যয়-রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে অসুর-শক্তির পরাজয় এবং দেব-শক্তির জয় হয়েছে, বিরাট ধ্বংসের বুকে নবসৃষ্টি জেগে উঠেছে। দেশমাতৃকার রণচামুণ্ডারূপে আত্ম-প্রকাশকে এবং বিজয়ের পরে তাঁর কল্যাণী রূপকে তিনি 'বন্দে মাতরম্' বলে বন্দনা করেছেন। 'জাগৃহি' কবিতাটিতে কবির আশাবাদ এইভাবে অপরূপ রূপ-কল্পনায় মূর্ত হয়েছে।

কবি নজরুলের কল্পনায় নবীন বাঙালী জাতিসত্তার, একটি মৌলিক ও সুস্পষ্ট রূপ প্রতিভাত ছিল। এইরূপ সম্পূর্ণ অভিনব এবং অনন্যকল্পিত। এই জাতিসত্তা রাজনৈতিক কূটকৌশলজাত নয়—এদেশে গণজাগরণের ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক প্রলয়-সম্ভূত। যথার্থ বিপ্লবীর মতো তিনি তাই চেয়েছিলেন। তিনি 'construction after destruction' নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই পথেই যে জাতির সত্যকার কল্যাণপ্রসূ ও স্থায়ী মুক্তি সম্ভব, তা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। জাতির এই প্রলয়-সম্ভূত নবসত্তা লাভের মানসিক প্রস্তুতি হিসাবেই তিনি জাতিকে এই মাভৈ-মন্ত্র দিয়েছিলেন :

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—প্রলয় নূতন সৃজন বেদন।
আসছে নবীন—জীবন হারা অসুন্দরে করতে ছেদন।
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় ব'য়েও আসছে হেসে—মধুর হেসে।
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর?
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর।
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর।

(প্রলয়োল্লাস : অগ্নি-বীণা)

বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে জাতির নবজন্ম সম্পর্কে কবির সুগভীর অনুভূতি উদ্ভাসিত রূপকে নিপুণ অভিব্যক্তি লাভ করেছে। অত্যাচারী দানব শাসক-শক্তিকে ধ্বংস করে স্বাধীন জাতির প্রলয়োদিত নবসত্তাকে কবি অবলোকন করেছেন সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী মহামাতার অপূর্ব মূর্তির আগমনীতে। 'আগমনী' কবিতার সুরা-সুরের যুদ্ধের মধ্যে এই প্রলয়ের রূপকল্পনা রূপকাশ্রয়ে চিত্রিত হয়েছে। মনুষ্যত্বের মহিমায় ভাস্বর নতুন জাতির নব-উত্থান যেন মহামাতার বরাভয়-বাণীতে ঘোষিত হয়েছে এইভাবে:

নাই দানব
নাই অসুর—
চাই নে সুর,
চাই মানব।

নজরুল জাতিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ, স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত, লক্ষ্যলাভের আশায় উদ্দীপিত এবং সংগ্রামে অভয়-মন্ত্র দান করেছেন। জাতীয় জীবনের ক্লেদ-গ্লানি দুর্বলতাকে অপসারিত করে, চির-পুঞ্জিত জড়তা ও ক্লীবত্বের পাষাণভার বিগলিত করে তিনি কাব্যের সুরে ভগীরথের মতো জাতীয় জীবনকে সফলতার মহাতীর্থে আকর্ষণ করেছেন। এইভাবে জাতীয় জীবনের অক্ষয় সঞ্জীবন-উৎস হয়ে নজরুলকাব্য জাতির অমূল্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত।
নজরুল-কাব্যে যুগজীবনের সমস্যা, সংকট, অক্ষমতা ও মালিন্যের চিত্র নানা স্থানে সুপ্রকট। এগুলি তাঁর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, কেননা সেগুলি জাতীয় জীবনকে করেছিল পঙ্গু, নিষ্প্রাণ ও অর্থহীন। তাই, তাঁর কবিশক্তির বীর্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে যুগ-জীবনের এইসব ক্লেদ-চিত্রায়ণে এবং তার অপসারণে। নজরুল-কাব্যের এই যুগচিত্রণ একদিক থেকে তাকে খাঁটি জাতীয় কাব্যের চরিত্র দান করেছে। তিনি সবল ও সুস্পষ্ট ছন্দে উচ্চারণ করেছিলেন:

(আজ) ভারত-ভাগ্য-বিধাতার বুকে গুরু-লাঞ্ছনা-পাষাণভার,
আর্তনিনাদে হাঁকিছে নকীব,—কে করে মুশকিল আসান তার?
মন্দির আজি বন্দীর জালি,
নিষ্পিষ্ট ভীত সত্য, বদ্ধ রুদ্ধ স্বাধীন আত্মার বাণী,
শক্তি-মহলে বন্দীর বাঁধ, গভীর শান্তি-অন্ধকার।
হাঁকিছে নকীব,—হে মহাকাল, চূর্ণ কর ও এ কারাগার॥

(তূর্য-নিনাদ : বিষের বাঁশী)

তৎকালীন জাতীয় চরিত্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটি অংকনে কবির বাস্তব ও সত্য দৃষ্টির উজ্জ্বলতা আমরা লক্ষ্য করি, যখন কবি বলেন :

দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি
ভিক্ষুকের এ লজ্জাবৃত্তি,
বিনাশ জাতির দারুণ এ লাজ, দাও তেজ দাও মুক্তি-গরব।

*　　　*

ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রের হে তোমার ন্যায়ের সৈন্য,
শৃংখলিতের টুটি'তে বাঁধন আন আঘাত প্রচণ্ড আহব।

*　　　*

নির্বীর্য এ তেজ:-সূর্যে
দীপ্ত করহে বহ্নি-বীর্যে,
শৌর্য, ধৈর্য, মহাপ্রাণ দাও, দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব।

(উদ্বোধন: বিষের বাঁশী)

যুগ-জীবনের এই সব গ্লানি এবং জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে উপেক্ষা করেই তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃগণ স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার যে জাতির স্থায়ী কল্যাণ বা সার্বিক সমৃদ্ধি আনতে পারে না, তাঁরা সেকথা বুঝেন নি। কিন্তু নজরুল এইসব দুর্বলতা-মুক্ত একটি বীর্যবান, সংগ্রামসিদ্ধ, আত্মনির্ভর জাতিকে বৈপ্লবিক ও গৌরবদীপ্ত স্বাধীনতার তোরণে পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ভিক্ষুকের ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতা, হীনবীর্যের অক্ষম মুক্তি লালসাকে তিনি অবজ্ঞা করেছেন—প্রচণ্ড আহবে অর্জিত স্বাধীনতা-ধনই ছিল তাঁর কাম্য। নজরুলের কাব্য-ভাবনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে তাঁকে সন্ত্রাসবাদী বা উচ্ছৃংখল বিদ্রোহী বলে সত্য মন্তব্য করা সম্ভব হয় না।

পূর্বে বলেছি, জাতীয় চরিত্রের অংকনই নজরুলের একমাত্র কাজ ছিল না; তাঁর প্রধান কাজ ছিল তাঁর গঠন। তাই সকল দুর্বলতা মোচন করে তিনি তাতে শক্তি সঞ্চারের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। কবি বলে তিনি এই দুর্বলতার প্রতিষেধক খুঁজে পেয়েছিলেন—জাতিসত্তাকে নিয়ে সমস্ত ভণ্ডামি, ফন্দী-ফিকির ও রাজনৈতিক জুয়াখেলার আড্ডাখানাকে ভেঙে চূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। সমস্ত কাপুরুষতা, হীনমন্যতা ও মূঢ়তাকে পদাঘাত করেছিলেন। এবং অতঃপর সত্য, ন্যায় ও স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে। তৎকালীন, রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরোক্ষ বা বক্রপন্থি তাঁর এই পথ থেকে তাঁকে একচুলও বিচলিত করতে পারে নি। তিনি উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষার সেই মহাবিপ্লবীর আগমন প্রত্যাশা করেছেন, যে এই জেলখানা চূর্ণ করে আনবে তাঁর চির-আকাঙ্ক্ষিত 'সত্যমুক্তি'। তাই বলেন :

নেই কি রে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়?—
শিকলগুলো বিকল করে পায়ের তলায় মাড়ায়,—
বজ্রহাতে জিন্দানের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায়?

লালাভ-পথের আজাদ-বাসব নেই ফিরে কেউ বাঁচা,
ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ মেষের খাঁচা ?

(সেবক : বিষের বাঁশী)

অবশ্য নজরুল মুক্তির সকল সত্য প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর সর্বৈব মিল না থাকলেও তাঁর মতবাদকে তিনি অবজ্ঞা করেন নি। তাঁর 'চরকা'-কে তিনি হিন্দু-মুসলমানের 'মিলন-সূত্র-ডোর' বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। নজরুলের জাতীয় জীবন চেতনা অন্যান্যদের থেকে পৃথক ছিল না, মুক্তির লক্ষ্য ছিল সকলের সঙ্গে এক। কিন্তু স্বাধীনতার ব্যাপারে কূটকৌশলকে তিনি পছন্দ করেননি। কেননা, তাঁর বিশ্বাস ছিল সত্য, ন্যায় এবং আত্মশক্তির বলে জাতি অবশ্যই এবং অচিরেই স্বাধীনতা অর্জন করবে। এসব কারণে 'স্বরাজ'-কে তিনি সমর্থন জানাতে পারেন নি। এর প্রতি তাঁর কোন আস্থা ছিল না। স্বরাজ-কামীদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল এই রকম :

কর্তা হবার শখ সবারই, স্বরাজ-টরাজ ছল কেবল
ফাঁকা প্রেমের ফুস্‌-মন্তর, মুখ সরল আর মন গরল

এবং

বুকের ভিতর ছপাই-নপাই, মুখে বলিস স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই
'ভারত হবে ভারতবাসী'র—এই কথাটাও বলতে ভয়।
সেই বুড়োদের বলিস নেতা—তাদের কথায় চলতে হয়।

(বিদ্রোহীর বাণী : বিষের বাঁশী)

শুধু স্বরাজ-প্রচেষ্টার ভণ্ডামি ছাড়াও ধর্মের ভণ্ডামি বা ভড়ং, শাস্ত্রের অনুশাসন, হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদ, মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ, প্রভু-তোষণ, অত্যাচার-অবিচার, শাসন-ত্রাসন ইত্যাদি -যা-কিছু জাতীয় চেতনা এবং জাতীয় জীবনের পরিপন্থী, নজরুল তার উপরে ছিলেন খড়্গহস্ত। 'বিষের বাঁশী' এবং 'ভাঙার গানে'র কবিতাগুলিতে তাঁর এই সংস্কার-কামনা তীব্রতা লাভ করে-ছিল। সেযুগে নবজাগ্রত জাতির আত্মচেতনা এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠা সাধনাকে অনেক স্বার্থান্বেষী চক্র বা ব্যক্তি নিজেদের সুবিধার বিনিয়োগ করার কূটকৌশল প্রয়োগ করেছিল। কবি নজরুল তাদের এই কূট চক্রান্তকে সোচ্চার কণ্ঠে প্রকাশ করেন এবং তাদের বিরক্তিভাজন হন। সত্যকার দেশপ্রেমিক কবি ছিলেন বলে তাঁর সরল ও বলিষ্ঠ উক্তিগুলিতে জাতির মূল আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে সঠিকভাবে। উপদেশের ছলে যে কথাগুলি তিনি জাতিকে শুনিয়েছেন, তাতে তাঁর এবং যুগের বাসনাই সুপরিস্ফুট হয়েছে। সত্য, ন্যায় ও কল্যাণকে ধ্রুব করে, মানবতার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে নিষ্কলুষ কর্ম ও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, আপন বীর্যে অর্জিত স্বাধীনতাই তাঁর কাম্য ছিল। এই সংগ্রামে জাতি যে নিশ্চিত জয়ী হবে, তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই বলেছেন :

সত্য যদি হয় ধ্রুব তোর,
কর্মে যদি না রয় ছল,
ধর্ম-দুধে না রয় জল,
সত্যের জয় হবেই হবে,
আজ নয় কাল মিলবে ফল,
আজ নয় কাল মিলবে ফল।
(সত্যমন্ত্র : বিষের বাঁশী)

যুগের মানসিকতা এবং যুগচরিত্র অংকনে নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটির তুলনা নেই। জাতির মানসিক হীনতা এবং জাতীয় চরিত্রের নানা দুর্বলতা কবিকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং কঠোর তিরস্কারের দ্বারা এগুলি দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। কেননা, এসবের থেকে মুক্তি না পেলে সত্যকার মুক্তি সুদূরপরাহত বলেই তিনি মনে করতেন। পরাধীন জাতি সকল মানসিক ও চারিত্রিক শক্তি হারিয়ে আজ দীনতা হীনতার অতল গহ্বরে নিপতিত—তার মুক্তিচিন্তা কবিকে ব্যথা ব্যাকুল করে তুলেছিল। কবির একটা কথা থেকে জাতির তৎকালীন দুরবস্থার করুণ চরমতা আমরা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করতে পারি :

আজ দানবের রংমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোলাম
লাথি খায় আর চ্যাঁচায় শুধু, 'দোহাই হুজুর, মলাম মলাম'।
(আনন্দময়ীর আগমনে)

কিন্তু কবি নিরস্ত বা নিরাশ হন নি। তিনি দেশের সংগ্রামী সৈনিক, নিঃস্বার্থ কর্মী এবং নির্ভীক তরুণদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দান করেছেন। তিনি জাতির জন্য আসন্ন মুক্তির বিজয়গাথা রচনা করেছেন, তার আত্মশক্তির উদ্বোধন করেছেন এবং তাকে ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার প্রেরণা দিয়েছেন। কবির পথ ছিল সুচিহ্নিত, ধ্রুব—জাতির জন্য অপরিসীম মমত্ববোধ তাঁর এই নিজস্ব পথ থেকে তাঁকে বিচ্যুত হতে দেয় নি। পরাধীন, লাঞ্ছিত ও নিষ্পেষিত জাতির জন্য তাঁর প্রাণের মর্মান্তিক বেদনাবোধই তাঁকে বিদ্রোহীর ঝাণ্ডা তুলে দুর্গম পথে দুসাধ্য সাধনায় ব্রতী করেছিল। কবির জাতিসত্তার অনুভূতি রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং সংস্কারজাত বটে, কিন্তু এই অনুভূতি তাঁর তীব্রতা তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল—তাঁকে স্থিরচিত্তে কাব্যলোকের জন্য প্রেম ও সৌন্দর্যের মধু আহরণ করতে দেয় নি। তাই নিজের কবিপ্রতিভা সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও তিনি তথাকথিত চিরন্তন কাব্যশিল্পের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন নি। যুগের দাবীকে উপেক্ষা করে এবং জাতির বিষক্ষতের উপশম না করে তিনি মুহূর্তের জন্যও শান্তি পান নি। তাই নির্দ্বিধায় তিনি বলতে পেরেছেন :

পরোয়া করিনা বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে।
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'রো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ।
(আমার কৈফিয়ৎ : সর্বহারা)

জাতির জন্য এই আন্তরিক মমত্ব এবং সুগভীর বেদনাবোধ সত্যিকারভাবে তাঁর কাব্যকে খাঁটি জাতীয় কাব্যের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। এই বেদনাবোধ কবির অন্তরের মধুকোষকে বিষ-কোষে পরিণত করেছিল এবং তার উৎসধারা তাঁর সকল কবিকর্মের আমূলে আমূলে সঞ্চারিত হয়েছিল। তাই তাঁর জাতীয় চেতনামূলক সকল কবিতায় তীব্র কর্ণবিদারী মন্ত্রের মধ্যে করুণ রাগিণীর মূর্ছনা, উন্মুক্ত অন্বেষণের অন্তরতলে মর্মভেদী হাহাকারধ্বনি বেজে উঠেছে। মর্মকোষের এই উপ-চীয়মান বিষপ্রবাহই তাঁর কাব্যপ্রবাহে অবারণ উন্মুক্ত ঝংকার জাগিয়ে তুলেছে। এই বেদনার স্বরূপ, এর গোপন উৎসের সন্ধান আমরা পাই তাঁর 'সাম্যবাদী' ও 'সর্বহারা'র কবিতাগুলিতে। কবি দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর চারদিকে অসহায়, গরীব, নিপীড়িত, পতিত, শোষিত মানুষের ভীড়। অথচ এরাই তাঁর জাতি—এদের ভাগ্যের সঙ্গে তাঁর ভাগ্য ওতপ্রোত, এদের রক্তধারার সঙ্গে তাঁর রক্ত একই খাতে প্রবাহিত। তাই এই 'ধরণীর ধূলিমাখা অসহায় সন্তান'দের আনন্দ-বেদনার অনুভূতির সঙ্গে কবির অনুভূতির কোন পার্থক্য ছিল না। তাদের আশা, স্বপ্ন, সুখ ও আনন্দের সঙ্গে কবির কোন বিচ্ছেদ ছিল না কেননা কবিও এদেরই একজন। জাতির সঙ্গে এই একান্ত একাত্মভাবোধ নজরুলের জাতি-চেতনার মর্মকথা। তাঁর এই চেতনার মধ্যে তাই কোন কৃত্রিমতা, গতানুগতিকতা বা অপ্রাকৃত কিছু নেই। অনুভূতি ও প্রেরণার এই অকৃত্রিম, অভিজ্ঞতালব্ধ এবং স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ তাঁর জাতীয় ভাবধারার কবিতাগুলিকে যথার্থ কাব্যগুণে মণ্ডিত করেছে—সত্যকার কাব্য-সত্য ও মহত্বে মহিমান্বিত করেছে। স্থান-কালের মাত্রা সীমিত, রাজনীতি এগুলির মৌলিক কাব্য সুষমায় এবং শিল্পগুণে কোন ক্ষণিকের মালিন্য প্রক্ষেপ করতে পারেনি। এইভাবেই এগুলি সমসাময়িকতার তুচ্ছতাকে অনায়াস-ভঙ্গিমায় অতিক্রম করে শাশ্বত মহিমায় গৌরবান্বিত।

জাতির জন্য কবির তীব্র ও মর্মদাহী বেদনাবোধ তাঁর প্রকাশভঙ্গীকে তীক্ষধার ও শাণিত করে তুলেছিল, কিন্তু কর্কশ বা নীরস করে নাই। জাতির দুর্ভাগ্যের জন্য যারা দায়ী তাদের প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধ এবং শ্বাসরোধী শাসনব্যবস্থা ও তাঁর বাণীকে ক্ষুরধার করে তুলেছিল। কবিতার একটি চরণে কবি তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন: "ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী।" (পথের দিশা: ফণি-মনসা)। তাই দেখা যায়, কবি ক্ষণে ক্ষণে এবং ক্রমাগতভাবে কবিতার গতানুগতিক তির্যক পথ ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি আঘাত হানতে শুরু করেছেন। কবির প্রাণের কথা তাই সোজাসুজি লেখনী মুখে আত্মপ্রকাশ করেছে—অলংকরণ কিংবা রূপকল্পনার আশ্রয়ে তা চিরাচরিত কাব্যকান্তি লাভের প্রয়াসী হয় নাই। কিন্তু কবিহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম অভিব্যঞ্জনায় তাঁর বাণী অনির্বচনীয়তার পরীক্ষায় অনায়াস-উত্তীর্ণ, কবিপ্রাণের নিগূঢ় রসে তার চিরকালীন সজীবতায় চির-নবীন। কবির "ভাঙার গান" কাব্যের 'ভাঙার গান,' 'দুঃশাসনের রক্তপান,' 'মিলন-গান', "বিষের বাঁশী" কাব্যের 'সেবক', 'অভয়-মন্ত্র,' 'যুগান্তরের গান' এবং "অগ্নি-বীণা" কাব্যের 'খেয়াপারের তরণী'ও আরো অনেক কবিতায় এই স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যগুণ অপূর্ব হয়ে ফুটে উঠেছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সাহিত্যে যাঁরা চিরন্তনবাদী, তাঁরা কবি নজরুলকে 'যুগের কবি' বা 'হুজুগের কবি' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে নজরুলের সে জনপ্রিয়তা আজ আর নেই, কেননা সে জনতাও আজ আর নেই। এখন নজরুল ইতিহাস বলে তাঁরা আফসোস করেন কিন্তু তৎকালীন জনতা অর্থাৎ জাতি কবির নিকট থেকে যে মুক্তি, স্বাধীনতা ও প্রগতির বাণী

লাভ করেছিল—যা তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, আত্মপ্রবুদ্ধ করেছিল, সংগ্রামী চেতনা দিয়েছিল—সে জাতি কি পৃথিবী থেকে একেবারে অবলুপ্ত হয়েছে, না আমাদের মধ্যে আজো বেঁচে আছে জাতি স্থানের দ্বারা সীমিত বটে, কিন্তু কালের দ্বারা নয়। জাতীয় চেতনাসম্পন্ন জাতির প্রাণের স্বাধীনতা, কল্যাণ আর সংগ্রামের মন্ত্র কোনদিন বিলীন হয়ে যায় না। যতদিন সে জাতীয়তার শ্রদ্ধা করবে, জাতিসত্তায় টিকে থাকবে, ততদিন তা চির-প্রেরণার উৎস হয়ে রইবে তার কাছে। যুগে যুগে সেখান থেকে সে আত্মশক্তি সংগ্রহ করবে, সত্যবোধ আহরণ করবে এবং নিজস্ব জাতীয় সত্তায় মহিমান্বিত হবার সাধনায় লিপ্ত থাকবে। কোন জাতীয়তাবাদী বাঙালীর কাছে নজরুলের এই কথাগুলি কোনদিন পুরাতন হতে পারে না :

তুই নির্ভর কর্ আপনার পর,
আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর্
ওরে, যে যায় যাক্ সে, তুই শুধু বল 'আমার হয়নি লয়।'
বল্ 'আমি আছি,' আমি পুরুষোত্তম, আমি চির-দুর্জয়।
বল্ নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়।------

(অভয়-মন্ত্র : বিশের বাঁশী)

এগুলি কোন দর্শন বা তত্ত্বকথা নয়—নজরুলের মতে ব্যষ্টি নিয়ে যে সমষ্টি, ব্যক্তি নিয়ে যে জাতি, সেই ব্যক্তি বা জাতির মর্মে আশা, শক্তি এবং আত্মবোধের সঞ্চারমাত্র। প্রেমবোধ যেমন চিরন্তন, এই আত্মবোধও ব্যক্তি বা জাতির মনে তেমনি চিরন্তন—এটাকে ছাড়লে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, জাতির জাতিত্ব থাকে না, যেমন প্রেম ছাড়লে থাকেনা মনুষ্যত্ব। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ আমরা এসব ক্ষেত্রে দেখতে পাই, বাস্তব বর্জিত ভাবলোকের মধ্যে নয়।

পৃথিবীতে সমস্যার রূপান্তর-পরিবর্তন ঘটে, অনেক প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, আবার নতুন প্রয়োজন আসে, কিন্তু সত্য আর ন্যায়ের প্রয়োজন ফুরায় না। সত্য আছে বলেই মিথ্যাও আছে, মিথ্যার সঙ্গে সংগ্রাম আছে। নজরুল সেই মিথ্যার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন সত্যের জন্য, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এর মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে কিনা, এটা চির মানবের মনোগত বাসনা কি না, তার হৃদয়ানুভূতি কি না, মনে হয় তা প্রশ্নের অতীত। নজরুল বলেছিলেন :

এস বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর।
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলী ঝলক ন্যায়-অসির।

(আত্মশক্তি : বিষের বাঁশী)

নজরুলের এই সত্যবোধ জাতীয় সত্তাবোধ থেকেই উপজাত। তাঁর বাঙালী বা ভারতবাসীকে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেই তিনি তাকে চিরন্তন মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। তাই তাকে আত্মস্থ, আত্মনির্ভরশীল এবং সত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

কবির এই বাঙালী জাতির সত্তাবোধ ভারতীয় জাতি-চেতনায় এবং আরো প্রসারিত হয়ে বিশ্বচেতনায় পরিণত হয়েছে। একন্যই আমরা বাঙালী বিদ্রোহীর বিশ্বজনীন বা চিরন্তন রূপের

পরিচয় পাই 'বিদ্রোহী' কবিতায়। কিন্তু এই বিদ্রোহী যে মূলতঃ বাঙালী, তা চিনতে বা বুঝতে ভুল হয় না, যখন অগ্নিবাসের বাঁশী শ্যামের হাতের বাঁশরী হয়ে দেখা দেয়, যখন সে 'শ্রাবণ-প্লাবন বন্যা' হয়ে আসে, যখন সে যৌবনভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলির মোহিনী মায়ার আকর্ষণ করে। এইভাবে কবি এই রূপের রূপকে বাঙালী জাতিসত্তাকে স্বাধীন বিশ্ব-জাতিসত্তার অংশ হিসাবে, বাঙালীর জীবনকে বিশ্বজীবনের একটি বিশেষ দিক ধরে উপলব্ধি করেছেন।

শাশ্বত বাঙালীর মতো শাশ্বত বাংলার রূপকল্পনাও কবির জাতিসত্তার অনুভূতি থেকে উপজাত। এই রূপকল্পনায় দেশমাতৃকার আনন্দময়ী, কল্যাণময়ী রূপের পরিচয় আছে। কিন্তু যুগ ও জাতির প্রয়োজনে কবি তাঁর রুদ্রাণী, অশিব-নাশিনী মূর্তিরই আবাহন করেছেন। পৃথিবীর দানব-শক্তি, জালেমের অত্যাচার, নির্বীর্যের কাপুরুষতা, ভণ্ডের ইতরতা এবং স্বার্থপরের নীচতা চূর্ণ করতে—জাতিসত্তার পাপমুক্ত, কলুষহীন, নির্মল মূর্তি রচনা করতে দেশমাতার চণ্ডী উন্মাদিনী শক্তি-মূর্তির প্রয়োজন মঙ্গলদাত্রী, শুভ্রবসনা দেশমাতার কল্যাণী রূপের পূজারী কবি তাই রক্তাম্বর ধারিণী দানব-দলনীকেই তাঁর প্রাণের উপচার 'বন্দে মাতরম'-মন্ত্রে নৈবেদ্য দিয়েছেন। বিশ্ব-নন্দিতা, জগৎ-তারিণী ভারতমাতার বিশ্বমোহিনী রাজরাণী রূপকে কবি যেন কবি-কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেছেন। এই উদারহৃদয়া ভারতলক্ষ্মীর অংকে কত বিভিন্ন জাতি যুগে যুগে আশ্রয় লাভ করেছে—তিনি নিজেকে নিঃস্ব করে, ত্যাগ-তিতিক্ষা-দুঃখের দাহনে দগ্ধ হয়ে তাঁর সন্তানদের পালন করেছেন। আজ এই তপস্বিনী দেশ-জননীর সংহারলীলায় হিংসা-দ্বেষ-অকল্যাণ দূর হয়ে আবার পুণ্যের জ্যোতিতে, সুখের আনন্দে পৃথিবী পূর্ণ হবে। আদি জ্ঞানের পাদপীঠ এই পবিত্র তীর্থে মানবের চির-কল্যাণ, চির-শান্তি নিহিত। কবি এইভাবে গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যের আভরণে দেশ-জননীর শাশ্বত রূপ-বৈভব অংকন করেছেন।

কবির জাতিসত্তার উৎসভূমি ভারতবর্ষের পাশে তাঁর চির-আদরের চির প্রিয় সুধাময়ী বঙ্গজননী অবদান করছেন। বুকে তাঁর অসংখ্য অমৃত নিস্যন্দী নদনদী, শিরে মেঘ-চিকুর, চরণে সাগর-শিঞ্জিনী। তিনি কাল-বৈশাখীতে উন্মাত্তা, প্রলয়ংকরী নৃত্যমত্তা, বর্ষায় কজ্জলমাখা ক্রন্দসী, শরতে হাস্যময়ী, হেমন্তে নানাবিলাসিনী, বসন্তে আবরণ-জড়িতা 'কুল-বধূ'। কবি এই বিশ্ববিমোহিনী শাশ্বত সুন্দরী বঙ্গমাতার প্রশস্তি গেয়েছেন :

নমঃ নমঃ নমো বাঙলা দেশ মম
চির মনোরম চির মধুর।

* * *

এই দেশের মাটি জল ও ফুলে ফলে,
যে রস যে সুধা নাহি ভূমণ্ডলে,
এই মায়ের বুকে হেসে খেলে সুখে
ঘুমাব এই বুকে স্বপ্নাতুর।

(স্বদেশী গান' : বনগীতি)

কবি বাংলা মায়ের এই শ্যামাঙ্গিনী রূপে মুগ্ধ, তাই তিনি বলেন:

আমার শ্যামলা বরণ বাঙলা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয়রে আয়।
গিরি দরী বনে মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়।

(৬৭নং গান: সুর-সাকী)

কবির চোখে এই শ্যামল-বরণী দেশমাতা কখনো উদাসিনী বৈরাগিনী, কখনো গ্রামপথ-বিহারিণী ভীরু বালিকা, কখনো ঝড়ের সঙ্গে তাণ্ডবনৃত্যে উন্মত্তা, কখনো বনের মধ্যে সাপ-বাঘ-ভালুক নিয়ে ক্রীড়ারতা। হরিৎ শস্যে তাঁর আঁচল দোলে, ঝিল্লিতে নূপুর বাজে, সন্ধ্যাতারার টিপ্ দুলে, ভাটিয়ালী বাউল সুরে গঙ্গার শ্মশানে কান্নায় তাঁর বুক ভেসে যায়। 'ক্ষীরোদ-সাগর-কন্যা' এই দেশমাতা তাঁর সন্তানদের চিরকাল ক্ষীর-সর দিয়ে, নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে, পাত্রভরা সুধা দিয়ে পালন করেছেন।
কবি নজরুলের কাব্যে এমনি করে শাশ্বত বাঙলা ও বাঙালী, বাঙালীর যুগমানস ও যুগচরিত্র, তার ধ্যান-কল্পনা-স্বপ্ন-আশা, তার জীবন ও জীবনদর্শন, তার প্রাণ ও প্রতিভার স্বাক্ষর সর্বাধিক ঔজ্জ্বল্যে ও কাব্যগুণে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত। বাঙালীর জাতীয় সাহিত্যের আধুনিক পর্বে নজরুল কাব্য আই সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ অধিকার করেছে। বাঙালীর নিজস্ব সম্পদরূপে নজরুল-কাব্য শাশ্বত মহিমা ও গৌরবে ভাস্বর, অবিনশ্বর।

সমালোচক নজরুল

শাহাবুদ্দীন আহমদ

নজরুল ইসলামের অপরূপ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য। সেখানে যে প্রতিভার সংগে আমাদের পরিচয় হয় তিনি একাধারে কবি, চিন্তাবিদ মনীষী, রাজনীতিক, সমাজ-সংস্কারক, জাতি সংগঠক, সংস্কৃতি-নির্মাতা এবং সর্বোপরি আত্মসচেতন তীক্ষ্ণ চোখ সমালোচক। নজরুলের এই প্রবন্ধসমূহের মধ্যে যে-গুলি তাঁর 'যুগবাণী', 'দুর্দিনের যাত্রী', ও 'রুদ্রমঙ্গল' এই তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থে ছাপা হয়েছে তাদের সংখ্যা মোট ৩৬টি। এই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ', ও পাক্ষিক 'ধূমকেতু'তে লিখিত নজরুলের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। ছটি প্রবন্ধ 'আগমনী', 'আমি সৈনিক', 'মন্দির ও মসজিদ' 'হিন্দু-মুসলমান' এবং 'মোহর্‌রম' ও 'বিষ-বাণী'—যথাক্রমে ১৩২৭ সালের আষাঢ়ের 'বকুল' ১৩২৯-এর কার্তিকের 'ধূমকেতু'তে, ১৩৩২-এর ভাদ্র-আশ্বিনের 'গণবাণী' এবং ১৩২৯-এর ভাদ্র-আশ্বিনের 'ধূমকেতু'তে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থাকারে সংকলিত নয় এমন প্রবন্ধগুলি হ'ল: ১. তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা, ২. রাজবন্দীর জবানবন্দী (ক্ষুদ্র পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশিত), ৩. বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ৪. বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য, ৫. ওমরের কাব্য ও দর্শন, ৬. বর্ষাবরণে, ৭. আজ চাই কি, ৮. আমার সুন্দর, ৯. সত্যবাণী, ১০. ব্যর্থতার ব্যথা, ১১. ধূমকেতুর আদি উদয় স্মৃতি, ১২. ধর্ম ও কর্ম, ১৩. 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজে'র মুখবন্ধ, ১৪. বুলবুল-ই-শিরাজ ১৫. কাব্য আম-পারার আরজ ও ১৬. বাঙলা ও বাঙালী। এ-ছাড়া তাঁর লিখিত কয়েকটি প্রশংসামূলক পুস্তক পরিচিতি আছে। যেমন: আবুল মনসুর আহমদের 'আয়নার প্রেম', মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সম্পাদিত 'হারা-মণি', বেনজীর আহমদের 'বন্দীর বাঁশী', আবদুল কাদির-এর 'দিলরুবা', মোহাম্মদ কাসেমের 'আগামীবারে সমাপ্য', মোহাম্মদ সুলতান অনূদিত 'শেকওয়া ও জবাবে শেকওয়া', মুফিয়া কামালের 'সাঁঝের মায়া', বরদাচরণ মজুমদারের 'পথহারার পথ' ও গিরীশ চক্রবর্তী সংগৃহীত 'সুজনের গান'।

এ-ছাড়া তাঁর গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞানের উপর তিনটি প্রবন্ধ আছে: ১. জননীদের প্রতি, ২. পত্রর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব ও ৩. জীবন বিজ্ঞান।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত প্রবন্ধসমূহ ছাড়া নজরুলের অভিভাষণগুলোকে প্রবন্ধ হিসাবে গণ্য করা যায়। কবি আবদুল কাদির সংকলিত ও সম্পাদিত নজরুল রচনা সম্ভারে এগুলি মুদ্রিত হ'য়েছে। এই অভিভাষণের সংখ্যা ১২টি: ১. ১৯২৯ সালে এলবার্ট হলে প্রদত্ত প্রতিভাষণ, ২. ১৯৩২-এর সিরাজগঞ্জের অভিভাষণ 'তরুণের সাধনা', ৩. ১৯২৯-এ চট্টগ্রামের বুলবুল সোসাইটির মানপত্রের প্রতিভাষণ 'প্রতি নমস্কার', ৪. ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অভিভাষণ 'মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা', ৫. ১৩৪৩ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ 'বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও', ৬. ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দৈনিক কৃষক

পত্রিকার অফিসগৃহে জনসাহিত্য-সংসদের শুভ উদ্বোধনে অভিভাষণ 'জন-সাহিত্য', ৭. ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁর মৃত্যুতে অনুষ্ঠিত শোকসভার সভাপতির অভিভাষণ 'উস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁ', ৮. ১৯৪০ সালে কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, ৯. ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় সিরাজী পাবলিক লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুম-এর দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত অভিভাষণ 'সিরাজী', ১০. ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে কলকাতা মুসলিম ছাত্র-সম্মিলনের অভিভাষণ 'আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ', ১১. ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ বনগাঁ সাহিত্য সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মিলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ 'মধুরম'। একমাত্র "ইসমাইল হোসেন সিরাজীর উপর প্রদত্ত ৮ লাইনের ভাষণটি ছাড়া প্রত্যেকটি প্রবন্ধাকারের দীর্ঘ অভিভাষণ। সুতরাং এগুলিকে প্রবন্ধ হিসাবে গণ্য করাই যুক্তি সংগত।

প্রবন্ধ, পুস্তক আলোচনা ও অভিভাষণ মিলিয়ে নজরুলের গদ্য রচনার সংখ্যা দাঁড়ায় (গল্প-উপন্যাস, পত্রোপন্যাস বাদ দিয়ে) ৭০টির উপর। এই লেখাগুলিতে ব্যক্তি, জাতি, ধর্ম, দেশ, সমাজ, সংগীত, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর নজরুলের সমালোচক সুলভ মনোভংগী প্রকাশ পেয়েছে। এ-ছাড়া এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর চিঠিপত্রে তাঁর ঐ সমালোচক দৃষ্টি অনাবৃত।

নজরুলের প্রথম সমালোচকসুলভ মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৩২৯-এর কার্তিক 'সওগাতে' প্রকাশিত তার প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা'য়। এটা ছিল ১৩২৫-এর বৈশাখের ভারতবর্ষে শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত তুর্ক মহিলার রূপ সম্পর্কে বিরূপ আলোচনার প্রতিবাদ। বেশ ঝাঁঝালো তীব্র সাহসী ভাষায় নজরুল ঐ আলোচনার প্রতিআলোচনা করেন। এই ভাষা ভঙ্গীর একটু নমুনা এখানে দেওয়া যাক :

> তবে ও সম্বন্ধে এ গরীবের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, New York Herald নামক আমেরিকান সংবাদপত্রের অচিন লেখকের তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিয়েই আমার একটা খটকা বেধে গেছে। আজকাল অনেক লেখক ঘরে বসেই দুনিয়ার যে-কোন-স্থানের ভ্রমণকাহিনী অসঙ্কোচে লিখে থাকেন, এ একটি নিদারুণ সত্যি কথা। তাঁরা হয়ত বিখ্যাত ভ্রমণকারীর কাছ থেকে শুনে, নতুবা কোন ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে এবং তাতে কিছু ঘরের তেলমসলা সংযোগ ক'রে আমাদের সামনে এনে হাজির করেন এবং আমরাও কৃতার্থ হ'য়ে যাই। আমিও ঐ লেখা পড়েছি, তাতে তিনি যে তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তা কিছুতেই বোঝা যায় না। হতে পারে তিনি কিছু দিন বা খুব বেশী দিন সেখানে ছিলেন, কিন্তু তিনি, আমার মতনুর সম্ভব ধারণা, সাদা চোখে কিছুই দেখেননি।
> সাহেব তুর্কদের সম্বন্ধে যে-সব বাজে বকেছেন, সে সম্বন্ধে কিছু না ব'লে আমি কেবল তুর্ক মহিলার সৌন্দর্য সম্বন্ধে দু'চারটি কথা ব'লে এই নীরস গদ্যের অবসান করব।

এই ভাষার সাহেবের নামে শ্রদ্ধায় আতঙ্কিত বাঙালী সুলভ কোন হীনমন্যতা নেই। ২০ বছরের নজরুল যে যথেষ্ট আত্মসচেতন এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তাঁর এই লেখায় সে-দিক পরিস্ফুট। সাহেব হ'লেই যে সে দেবতা হবে এবং তার বাক্য হবে বেদবাক্য নজরুল তরুণ বয়স থেকেই তা

ভাবতে শেখেন নি। আই 'বাজে বকেছেন' এমন কথা বলতে তিনি সাহসী ও সঙ্কোচহীন। তাঁর এই নিকুণ্ঠ সাহসের প্রকাশ দেখি তাঁর 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' নামক প্রবন্ধে। যেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত ক্ষুরধার ভাষায় আক্রমণ করেছেন:

> বীণাই শোভা পায় যাঁর হাতে, তাঁকেও লাঠি ঘুরাতে দেখলে দুঃখও হয়, হাসিও পায়। পালোয়ানী মাতামাতিতে কে যে কম যান, তা ত বলা দুষ্কর।...
>
> আজকের 'বাঙলার কথা'য় দেখলাম—যিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের পক্ষ হ'য়ে পঞ্চপাণ্ডবকে লাঞ্ছিত করবার সৈনাপত্য গ্রহণ করেছেন, আমাদের উভয় পক্ষের পূজ্য পিতামহ ভীষ্ম-সম সেই মহারথী কবিগুরু এই অভিমন্যুবধে সায় দিয়েছেন। মহাভারতের ভীষ্ম এই অন্যায় যুদ্ধে সায় দেননি, বৃহত্তর ভারতের ভীষ্ম সায় দিয়েছেন এইটেই এ-যুগের পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক।
>
> এই অভিমন্যুর রক্ষী মনে ক'রে কবিগুরু আমারও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েননি। বলেছেন, আমি কথায় কথায় 'রক্ত'কে 'খুন' বলে অপরাধ করেছি।
>
> কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি নিজেও টুপী পায়জামা পরেন, অথচ আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হ'য়ে উঠি কেন, বুঝতে পারিনে।
>
> এই আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ক'রে গেছেন।
>
> ....ঐ একটু ভালো শোনাবার লোভেই, ঐ একটি ভিন দেশী কথার প্রয়োগে অপূর্ব রূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করি। কবি-গুরুও কতদিন আলাপ-আলোচনায় এর সার্থকতার প্রশংসা করেছেন।
>
> আজ আমাদেরও মনে হ'চ্ছে, আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চির-চেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পেছনের বৈয়াকরণ পণ্ডিত এ-সব বলাচ্ছে তাঁকে।
>
> 'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানী বা বলশেভিকী রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবি ও-দুটোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করবেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর।
>
> আমি শুধু 'খুন' নয়—বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্ব-কাব্যলক্ষ্মীরও একটা মুসলমানী ঢং আছে। ও সাজে তাঁর শ্রীর হানি হ'য়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও ও-ঢং-এর ভূয়সী প্রশংসা ক'রে গেছেন।
>
> বাংলা কাব্য লক্ষ্মীকে দুটি ইরানী 'জেওর' পরালে তাঁর জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও 'খুব সুরত'ই দেখায়।
>
> আজকের কলা-লক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলঙ্কারই মুসলমানী ঢং-এর। বাইরের এ ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সকল শিল্পীই স্বীকার করেন। পণ্ডিত মানদিয়া স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন।
>
> তা ছাড়া যে 'খুনে'র জন্য কবিগুরু রাগ ক'রেছেন, তা দিনরাত ব্যবহৃত হ'চ্ছে আমাদের কথায়, কালার বক্সে (Colour box) এবং তা খুন-করা, খুন-হওয়া ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপারেই নয়। হৃদয়েরও 'খুন-খারাবী' হ'তে দেখি আজো।.....

....কবি-গুরু মনে করেন রক্তের মানেটা আরও ব্যাপক। ওটা প্রেমের কবিতাতেও চলে।
চলে কিন্তু তখন ওতে রাগ মেশাতে হয়। প্রিয়ার গালে যেমন 'খুন' ফোটে না, তেমনি রক্তও ফোটেনা—নেহাৎ দাঁত না ফোটালে। প্রিয়ার সাথে খুনা-খুনি হয়ত খেলিনা, কিন্তু খুনসুড়ি হয়ত করি।
কবিগুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাব্যলক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাঁদের কাছ থেকে টুপি আর আচকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেঙ্গীর সুর শুনতে, ফুলবনের কোকিলের গানের বিরতিতে, বাগিচায় বুল-বুলির সুর।

এই সমালোচনাটি আক্রমণাত্মক নিঃসন্দেহে। হয়ত বা উগ্রতায় ঋদ্ধ। কিন্তু এই লেখাটি থেকে অনুমান করা যায় নজরুলের শিল্পী-সত্তার পিছনে একটি ধতি-প্রখর অতি-সচেতন সমালোচক-সত্তার দৃষ্টির প্রহরা ছিল। নিছক আবেগের দাসত্ব করার মত উদাসীন ভাবুক তিনি ছিলেন না। প্রতিটি কাজের পিছনে তাঁর চিন্তা কাজ করত।
সমালোচকদের কাছ থেকে আমরা প্রায়ই একটা অভিযোগ শুনি যে নজরুলের সাহিত্য সাধনার পিছনে তেমন কোন পাঠের প্রস্তুতি ছিল না। এ-জন্যে নজরুলের শিল্প-দক্ষতাকে অনেক আধা শিক্ষিত সমালোচক 'অশিক্ষিত পটুত্ব' বলতে সঙ্কোচ করেননি। এখানে বলে রাখা দরকার যে কোনো শিল্পকলাই বিনা শিক্ষায় অর্জন করা যায় না। প্রতিভা যতই দৈবী হোক বাস্তব শিক্ষা তাকে গ্রহণ করতেই হবে। অবশ্য শিল্পী যে সর্বদা এই শিক্ষা প্রকাশ্য-ভাবে পাঠশালায়, বিদ্যালয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণ করবেন তেমন কোন কথা নয়। জগতের অনেক বড় বড় কবি-শিল্পী তেমনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। কিন্তু তাঁদের এক উপায়ে শিক্ষা-লাভ হয়েছে। যেমন ধরা যাক শেকস্পীয়ারের কথা। ম্যাথিউ আর্নল্ড বলছেন:

> Shakespeare was no deep reader. True, but in the Greece of Pindar and Sophocles, in the England of Shakespeare, the poet lived in a current of ideas in the highest degree animating and nourishing to the creative power; society was in the fullest measure, permeated by fresh thought, intelligent and alive. And this state of things in the true basis for the creative power's exercise, in this it finds its data, its materials, truly ready for its hand ;

নজরুলের বেলায় এই কথাটা সমানভাবে প্রযোজ্য। নজরুল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ পূর্বসূরীকে যে তাঁর ভাষার মাধ্যমে পেয়েছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর সমাজ পরিবেশের জন্য, সৈনিক জীবনের পরিবেশের জন্য কয়েকজন জগদ্বিখ্যাত পারসী কবিকেও আস্বাদন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এছাড়াও পেয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর উচ্চ মধ্যবিত্ত বাঙলার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজ। খেলাফত আন্দোলন, বলশেভিক আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ এবং অনেক কর্মীদের সহবাস নজরুল পেয়েছিলেন। এই সহবাসের শিক্ষা নিছক বাগ্মী ব'লে ভাবা অনুচিত।

এ-ছাড়া আছে কবির ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের শিক্ষা। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কবি প্রকৃতির অব্যক্ত ভাষা বুঝতে পারেন। এই ধরনের একটি কথা শ্রীশচীন করকে লিখিত নজরুলের একটি চিঠিতে দেখি। নজরুল বলছেন: 'ফুলের ভাষা, কুঁড়ির ব্যথা, পাতার কথা, লতার আবেগ, তরুর বাণী আমরা শুনতে পাই বুঝতে পারি ব'লে আচার্য জগদীশের ল্যাবরেটরী দেখতে যাইনে।' গ্রন্থ ছাড়াও এই প্রাকৃতিক শিক্ষা একটি বড় শিক্ষা।

এটা হয়ত সব কিছু নয় পড়াশুনারও প্রয়োজন পড়ে। কারণ পাঠের মাধ্যমে শিল্পীর অথবা কবির উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই লেখা পড়ার প্রতি অনুৎসাহী ছিলেন বলে আর্নল্ড ওয়ার্ডসওয়ার্থকে সমালোচনা ক'রে বলছেন:

> Wordsworth cared little for books, and disparaged G/oethe. I admire Wordsworth, as he is, so much that I cannot wish him different, and it is vain, no doubt, to imagine such a man different from what he is, to suppose that he could have been different. But surely the one thing wanting to make Wordsworth an even greater poet than he is -- was that he should have read more books, among them, no doubt, those of that Goethe whom he disparaged without reading him.

এই বিষয়টি যে নজরুলের জানা ছিল না তা নয়। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের কাছে লেখা চিঠিতে নজরুল বলছেন:

> বড় বড় কবির কাব্য পড়া এইজন্য দরকার যে তাতে কল্পনার জট খুলে যায়, চিন্তার বদ্ধধারা মুক্তি পায়। মনের মাঝে প্রকাশ করতে না পারার যে উদ্বেগ, তা সহজ হ'য়ে ওঠে। মাটির মাঝে যে পত্র-পুষ্পের সম্ভাবনা, তা বর্ষণের অপেক্ষা রাখে। নইলে তার সৃষ্টির বেদনা মনের মাঝেই গুমরে মরে।

অন্য এক চিঠিতে তিনি শ্রীশচীন করকে লিখছেন:

> পড়া ছাড়িসনে তুই, তা'হলে তোকে লেখায় ছাড়বে। অবশ্য পণ্ডিত হ'তে আমি বলছিনে, কিন্তু আমার আনন্দকে প্রকাশের পুঁজিও আমার থাকা চাই।----অজগরের মত তোর পেটটা গজগজ করুক বিদ্যায়, এ আমি বলছিনে; তাই ব'লে জানতে শুনতে যতটুকু জানা শোনার দরকার—তা থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখবি কেন?

এই উপদেশ যিনি দিয়েছেন তাঁর পাঠাভ্যাস একেবারে ছিল না। এমন মনে করা সম্ভবত অসঙ্গত। এ-প্রসঙ্গে নজরুলের বর্তমান 'শিশু-সাহিত্য' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। এখানে আমরা একসঙ্গে যে কজন কবি-সাহিত্যিকের নাম উচ্চারিত হ'তে দেখি, তাঁদের সাহিত্য আলোচিত হ'তে দেখি, তাঁরা হলেন: মিল্টন, শেলী, নোগুচি, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ, গর্কি, যোহান বোয়ার, বার্নার্ড শ', বেনাভাঁতে, সিউমির্নে, আন্দ্রিভ, নুট হামসুন, ওয়াদিস্‌লস রেমঁদ, আনাতোল ফ্রাঁস, কীটস, হুইটম্যান, বেয়েনকোভস্কি, পুশকিন, দস্তয়ভস্কি, টলস্টয়, কার্লমার্কস, ইবসেন, ক্রচেত, বালজাক, জোলা, ব্র্যাংসিয়া দেলেদ্দা, দ্যানানজিও, কিপলিং।

সন্দেহবাদীরা হয়ত বলবেন যে লেখকের পক্ষে গ্রন্থ পাঠ না ক'রেও তাদের নামের তালিকা দেওয়া সম্ভব। অস্থির বেপরওয়া বোহেমিয়ান নজরুলের সময় কোথায় ছিল যে তিনি এত বই পড়বেন। হ'তে পারে তা; এর সবগুলো যে তিনি ইন বিটুইন লাইন প'ড়েছেন তেমন তথ্যগত প্রমাণ দেওয়া মুস্কিল। কিন্তু শান্তিপদ সিংহের "নজরুল কথা" থেকে জানা যায় যে নজরুল এক সময় মুড়ি-মুড়কির মত বিশ্ব-সাহিত্য পাঠ করেছিলেন। তাছাড়াও নজরুলের কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন বিশ্ব সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি তড়িৎ গতিতে ঐ সব সাহিত্যিকদের আত্মসাৎ করেছেন। নজরুলের স্মৃতিশক্তি যে অসাধারণ ছিল তার তথ্যগত প্রমাণ পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা, গান এবং গোটা গীতাঞ্জলি নজরুলের মুখস্থ ছিল। একবার মনোযোগ দিয়ে দেখলে অথবা শুনলে নজরুল যে তা ভুলতেন না নজরুলের অসংখ্য হিন্দু-পুরাণ ও মুসলিম পুরাণ প্রয়োগ থেকে তা বোঝা যায়। কিন্তু নজরুল শ্রী মন্মথ রায়কে লেখা একটি চিঠিতে বলছেন: 'আমার মনের চেয়ে চোখের স্মরণ শক্তি একটু বেশী।' অতএব উদ্ধৃত লেখকগণের সাহিত্য যে তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিলো তা বলা যেতে পারে। বলা যায় আরও এইজন্য যে নজরুলের ঐ প্রবন্ধটি কোন হালকা সাহিত্য পরিচয় নয়, রীতিমত বিশ্বসাহিত্যের বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা। গভীর পাঠ ভিন্ন তুলনামূলক বিচার সম্ভব হয় না। 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধটি একটি তুলনামূলক সাহিত্যালোচনা। উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব-সাহিত্যের সাহিত্যিকদের তিনি দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। ইব্রাহীম খাঁর কাছে লেখা চিঠিতে নজরুল বলেছিলেন:

> বেদনার গান গেয়েই আমাদের নবীন সাহিত্য-স্রষ্টাদের জন্য নূতন সিংহাসন গ'ড়ে তুলতে হবে। তারা যদি কালিদাস, হরেস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপস্রষ্টাদের পাশে বসতে না-ই পায়, পুশকিন, দস্তয়ভস্কি, হুইটম্যান, গর্কি, যোহান বোয়ারের পাশে ধূলির আসনে বসবার অধিকার তারা পাবেই।

'বর্তমান বিশ্বসাহিত্যে' এটাকেই তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। আলোচনায় শুরু করেছেন তিনি এইভাবে:

> বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্যের দিকে একটু ভালো ক'রে দেখলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার দুটি রূপ। এক রূপে সে শেলীর Skylark-এর মত মিল্টনের Bird of Paradise-এর মত এই ধূলিমলিন পৃথিবীর ঊর্ধ্বে উঠে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না, কেবলি ঊর্ধ্বে—আরো ঊর্ধ্বে উঠে স্বপন লোকের গান শোনায়। এইখানে সে স্বপনবিহারী।
>
> আর এক রূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধ'রে থাকে।.....এইখানে সে মাটির দুলাল। ধূলি-মলিন পৃথিবীর এই কর্দমাক্ত শিশু যে সুন্দরকে অস্বীকার করে, সে স্বর্গকে চায় না তা নয়। তবে সে এই দুঃখের ধরণীকে ফেলে সুন্দরের স্বর্গলোকে যেতে চায় না। সে বলে: স্বর্গ যদি থাকেই তবে তাকে আমাদের সাধনা দিয়ে এই ধূলার ধরাতেই নামিয়ে আনব। আমাদের পৃথিবীই চিরদিন তার দাসীপনা করেছে, আজ তাকে এনে আমাদের মাটির মায়ের দাসী করব। এর এ ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ

লোকের দেবতারা হাসেন। বলেন: অসুরের অহঙ্কার, কুৎসিতের বাড়াবাড়ি। এরাও চোখ পাকিয়ে বলে: আভিজাত্যের আস্ফালন, গোষ্ঠীর নীচতা।

গত মহাযুদ্ধের পরের মহাযুদ্ধের আরম্ভ এইখান থেকেই। ঊর্ধ্বলোকের দেবতারা ভ্রূকুটি হেনে বলেন, দৈত্যের এ ঔদ্ধত্য কোন কালে টেকেনি।

নীচের দৈত্য-শিশু ঘুষি পাকিয়ে বলে: কেন যে টেকেনি, তার কৈফিয়ৎটা ত চাই, দেবতা।

দুই দিকেই বড় বড় রথী মহারথী। এক দিকে গোওচি, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি dreamers স্বপ্নচারী; আর দিকে গর্কি, যোহান বোয়ার, বার্নার্ড শ', বেনাভাঁতে। আজকের বিশ্বসাহিত্যে এ-দুটো রূপই বড় হয়ে উঠেছে।

এই দুটো রূপের পরিচয় দিয়ে, নজরুল ক্ষান্ত হননি। তিনি আর একটি তৃতীয় রূপের কথা বলেছেন। এই তৃতীয় রূপের যাঁরা স্রষ্টা তাঁরা উপরের ঐ দুটি extreme রূপের মাঝামাঝি একটি রূপ। সে কি করে? কবি বলছেন—'সে এই মাটির মায়ের কোলে শুয়ে স্বর্গের কাহিনী শোনে।-----সে তার মাটির মাকে ভালবাসে, তাই ব'লে স্বর্গের বিরুদ্ধে অভিযানও করেনা।' নিওনীচ, আঁদ্রিভ, ন্যুট হামসুন, ওয়াদিশল রেমন্টকে তিনি এই দলভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে, 'বার্নার্ড শ' আনাতোল ফ্রাঁস, বেনাভাঁতের মত হলাহল এরাও পান করেছেন, এঁরাও নীলকণ্ঠ, তবে সে হলাহল পান ক'রে এরা শিবত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছেন, সে হলাহল উদগার করেননি।' অর্থাৎ এঁরা বিদ্রোহী দলের নন এঁরা ধ্বংসপ্রবর্তী নন। নজরুল বলছেন, দুই চরমের মাঝখানের সাহিত্যিকরা ভেবেছিলেন সমাজের বিবর্ত হবে ইভোলিউশন দিয়ে কিন্তু বস্তুবাদীরা ভেবেছিলেন বিবর্ত ইভোলিউশন দিয়ে হবে না হবে 'রক্তমাখা রিভোলিউশন দিয়ে।' তাঁরা নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এর 'খোল নলচে দুই বদলে।' তাঁরা চেয়েছিলেন 'নতুন সৃষ্টি নতুন স্রষ্টা' সৃষ্টি করতে। এই দলে হুইটম্যান, বার্নাড শ', বেনাভাঁতে ছিলেন। কিন্তু নজরুল এই দলের নায়ক বলে মনে করেছেন গর্কিকে। নজরুলের ধারণা এই গর্কির স্রষ্টা দস্তয়ভস্কি, পুশকিন ও গোগল। বিশেষ ক'রে দস্তয়ভস্কি। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর এই নতুন স্রষ্টা-সৃষ্টির দিন ব'লে মনে করেন নজরুল যেদিন 'বর্বর রুশ সম্রাট নিকোলাসের দণ্ডাজ্ঞায়' 'শতাধিক কবি ও সাহিত্যিকের' নির্বাসন হয়। এই নির্বাসিতদের মধ্যে ছিলেন দস্তয়ভস্কি। নির্বাসন থেকে ফিরে এসে তিনি রচনা করেন Crime and Punishment। নজরুল বলছেন, "Crime and Punishment-এর 'রাস্কলনিকভ্‌ যেন দস্তভস্কিরই দুঃখের উন্মাদ মূর্তি, সোনিয়া যেন 'ধর্ষিতা রুশিয়ারই প্রতিমূর্তি।' নজরুলের ধারণা 'যেদিন রাস্কলনিকভ্‌ এই বহু পরিচর্যারতা সোনিয়ার পায়ের তলায় প'ড়ে বললো,—I bow down not to the but to suffering humanity in you! সেদিন সমস্ত ধরণী বিস্ময়ে ব্যথায় শিউরে উঠলো। নিখিল মানবের মনে উৎপীড়িতের বেদনা পুঞ্জীভূত হ'য়ে ফেনিয়ে উঠলো। ইশটেরের God এবং Relegion কোথায় ভেসে গেল এই বেদনার মহাপ্লাবনে।' নজরুল মনে করেন এই মহাপ্লাবনের সৃষ্টি গর্কি। তাই তিনি বলেন "তারপর এল এই মহাপ্লাবনের ওপর তুফানের মত, ভয়াবহ সাইক্লোনের মত বেগে ম্যাক্সিম গর্কি। শেকড়ের মাটিকে ভেঙে পড়ল, সে বিস্ময়ে বেরিয়ে এসে এই বক্তের বন্ধুকে অভিবাদন করলে। বেদনার ঋষি দস্তয়ভস্কি বললে: তোমার সৃষ্টির জন্যই আমার এ তপস্যা। চালাও পরশু, হানো ত্রিশূল।"

নজরুলের ধারণা বিশ্ব সাহিত্যের সত্যিকার প্রথম ভাঙার গান গাইলেন গর্কি। কার্লমার্কস যে মারণমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, সেই 'কার্ল মার্কসের ইকনমিক্সের অঙ্ক এই যাদুকরের হাতে প'ড়ে আজ বিশ্বের অন্নলক্ষ্মী হ'য়ে উঠেছে। পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হ'য়েছে।' নজরুলের ধারণা মার্কস অর্থনীতির নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে সাম্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণের যে ফাঁকী দেখিয়ে দেন—সেই অর্থশাস্ত্রের সূত্র সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করে গর্কির হাতে। তাই গর্কি বললেন—"দুঃখ বেদনার জয়গান গেয়েই আমরা নিরস্ত হব না—আমরা এর প্রতিশোধ নিব। রক্তে নাইয়ে অশুচি পৃথিবীকে শুচি করব।" নজরুল বলছেন—"এতদিনে সে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদে লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলে। জার গেল—জারের রাজ্য গেল—ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ী শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।"
এই ধ্বংসব্রতী সাহিত্যিকরা ধনতন্ত্রবাদীদের দ্বারা নিন্দিত হন। নজরুল চমৎকারভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন :

> দশমুণ্ড দিয়ে খেয়ে, বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন করেও যার প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি হ'ল না, সেই Capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া রক্ষ-সেনারা এদেরে বলে হনুমান। এই লোভ-রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা হবে ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানের ভোগ্যা, ধরার প্রজারপাইন যমরাজা প্লুটোর হবে সেবিকা।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য ১৯২০ থেকে ১৯২৭ সালের নজরুল নিজে এই রক্ত-বিপ্লবকারীদের দলে ছিলেন। তিনি ছিলেন ধ্বংসব্রতী—তাঁর সাধনা ছিল 'খোল নলচে বদ্‌লে' 'নতুন সৃষ্টি নতুন স্রষ্টা' সৃষ্টি করার। তিনিও বাংলা-সাহিত্যে এসেছিলেন 'মহাপ্লাবনের ওপর তুফানের মত, ভয়াবহ সাইক্লোনের মত বেগে।' গর্কির মতই নজরুলের বক্তব্য ছিল—"দুঃখবেদনার জয়গান গেয়েই আমরা নিরস্ত হব না—আমরা এর প্রতিশোধ নেব। রক্তে নাইয়ে, অশুচি পৃথিবীকে শুদ্ধ করব।" এই চিন্তা থেকেই নজরুল 'কামাল পাশা' কবিতায় লিখেছিলেন :

> হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল!
> গৃধ্নু ওরা, লুব্ধ ওদের লক্ষ অসুর বল. . .
> হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল।
> জালিম ওরা অত্যাচারী।
> সার জেনেছি সত্য যাহা হত্যা তারই!!

'ওরা অত্যাচারী জালিম' সুতরাং ওদের হত্যা করাই উচিত। কামাল-স্তবের কারণ হ'ল কামাল পাশা এই সাম্রাজ্যবাদীদের 'উচিত সাজা' দিয়েছিলেন।
এই চিন্তা থেকেই নজরুল বিখ্যাত "কোরবানী" কবিতায় লিখেছিলেন—'ওরে সত্য মুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই সে খুন-মোচন।'

এই চিন্তা থেকেই 'দুঃশাসনের রক্ত পান' কবিতায় বলেছিলেনঃ

বল রে বন্য হিংস্র বীর,
দুঃশাসনের চাই রুধির।
চাই রুধির রক্ত চাই,
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই
দুঃশাসনের রক্ত চাই!

এই কবিতা লিখেই শিক্ষিত বুর্জোয়া বাবু সমাজের কাছ থেকে নজরুল-কাব্য 'রক্ত-রাগ' উপাধি পেয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্র সপ্তরথীরা নজরুলের কাব্যকে 'মার মার কাট্‌কাট্‌ ও অসির ঝন্‌ঝনার মধ্যে রূপ ও রসের প্রকেপটুকুও হারিয়ে গেছে' ব'লে মন্তব্য করেছিলেন। মন্তব্য হ'য়েছিল—'এ অসির ঝন্‌ঝনা জাতির মনের আবেগে ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নজরুলী কাব্যের জনপ্রিয়তাও মিলিয়ে যাবে।' শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষে নজরুলী কাব্যকে 'ল্যাঙটা পরা গুলি পাকানো ধুলো মাখা আধুনিকতা', 'মাধুর্যহীন রূঢ়তা', 'পালোয়ানির মাতামাতি', 'পারভাঙ্গা মারা পালোয়ানি', 'সার্কাসের 'খেলোয়াড়' ইত্যাদি ব'লে সমালোচনা করেছিলেন।
এই সব কথাকে উপলক্ষ করেই বস্তবাদী সাহিত্যিকদের প্রতি রূপবাদী সাহিত্যিকের মনোভাব ব্যাখ্যা ক'রে নজরুল বলেছেন—'Capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া রক্ষ-সেনারা এদেরে বলে হনুমান।' বস্তবাদী এই সাহিত্য অমর হ'তে পারে না এই অভিমত ছিল বুর্জোয়াদের। কিন্তু 'মুখপোড়া হনুমান'-ও যে অমর হ'তে পারে তার উদাহরণ রামায়ণের হনুমান। সীতাকে রক্ষা করতে গিয়ে তার মুখ পুড়েছিল। কিন্তু ঐ মহৎ আত্মত্যাগের জন্য হনুমান পূজ্যাস্পদ হয়েছে। নজরুল সেটাই ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে:

> সীতার উদ্ধারে যায় যে তথাকথিত হনুমান, রক্ষ-সেনা দেয় তার ন্যাজে আগুন লাগিয়ে। তথাকথিত হনুমানও বলে, ল্যাজে যদি আগুনই লাগালি, আমার হাত মুখ যদি পোড়ালি —তবে তোর স্বর্ণলঙ্কাও পোড়াব। ব'লেই দেয় লাফ।
> আজকের বিপ্লব-সাহিত্যে এই হনুমানও লাফাচ্ছে এবং সাথে সাথে স্বর্ণলঙ্কাও পুড়ছে —এ আপনারা যে-কেউ দিব্যচক্ষে দেখছেন বোধ হয়।...
> রামায়ণে উল্লেখ আছে, সীতাকে উদ্ধার করায় পুণ্যবান মুখপোড়া হনুমান অমর হ'য়ে গেছে। সে আজ পূজাও পাচ্ছে ভারতের ঘরে ঘরে। আজকের লাঞ্ছনার আগুনে যে দুঃসাহসীদের মুখ পুড়ছে তাঁরাও ভবিষ্যতে অমর হবে না, পূজো পাবে না—এ-কথা কে বলবে?

অর্থাৎ তারাও পূজা পাবে অমর হবে কেননা 'মুখপোড়া'র বদনামের আত্মত্যাগ তারা মহৎ কর্তব্য পালনের জন্য গ্রহণ করেছিল। আর আসলে ত তারা 'হনুমান' নয়—এ নাম দেওয়া ত বুর্জোয়া রাবণ ও তার রক্ষ-সেনাদের। লক্ষ্য করবার বিষয় যে নজরুল দু'বার 'তথাকথিত হনুমান' লিখেছেন। 'তথাকথিত' বিশেষণটি যাঁরা মহৎকে হনুমান ভাবেন তাদের প্রতি সমালোচনার কটাক্ষ। যা হোক

আমার বক্তব্য হ'ল এই যে নজরুল যাই পাঠ করুন তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই উপলব্ধি ছাড়া এই ধরনের তুলনামূলক বিচার সম্ভব নয়:

> রাশিয়া দিয়েছে revolution এর মর্মান্তিক বেদনার অসহ্য জ্বালা। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া দিয়েছে অন্তহীন বেদনার অসহায় দীর্ঘশ্বাস। রাশিয়া দিয়েছে হাতে রক্ত তরবারি, নরওয়ে দিয়েছে দু'চোখে চোখ ভরা জল। রাশিয়া বলে: এ বেদনাকে পশুর শক্তিতে অতিক্রম করব,— ভুজবলে ভাঙব এ দুঃখের অন্ধকারা। নরওয়ে বলে: প্রার্থনা করো; ঊর্ধ্বে আঁখি তোল। সেথায় সুন্দর দেবতা চিরজাগ্রত—তিনি কখনো তাঁর এ অপমান সহ্য করবেন না।

নজরুল বিশ্বসাহিত্যের আঙ্গিকগত কলাকৌশল, প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদি নিয়ে কোন আলোচনা করেননি অথবা বিশ্বসাহিত্যের ক্রমাগত পরিবর্তিত মতবাদ নিয়েও আলোচনা করেননি, যে মর্মমূল থেকে সাহিত্যের ভাবের উদ্ভব, যে উৎস মূল থেকে সাহিত্যের বৃক্ষের উৎপত্তি সেই আইডিয়ার জগতের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য তাঁর আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন দেশের মনীষী সাহিত্যিকবৃন্দ সমকালকে কি ভাবে গ্রহণ করেছেন, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কিভাবে চিন্তা করেছেন সেইসব বৈপ্লবিক চিন্তা-সমূহকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। নয়া দুনিয়ার বিপ্লবের চিন্তাধারায় রাশিয়ার অবদানকে নজরুল দেখিয়েছেন। কিন্তু একা রাশিয়া নয়—রাশিয়ার সংগে সংগে বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় অন্য দেশের দাবীও যে অগ্রাহ্য করার মত নয় সে-কথাও তিনি বলেছেন:

> আইডিয়ার জগতে বিপ্লবের অগ্রদূত ব'লে দাবী রাশিয়া যেমন করে—তেমনি নরওয়েও করে। ফ্রান্স-জার্মানীও এ অধিকারের সবটুকু পেতে দাবী করে।
> আজকের নরওয়ের ক্নুটহামসুন—যোহান বোয়ার—শুধু নরওয়ের ওঁরাই বা কেন বলি, আজকের বিশ্বের ছোট-বড় সব Realistic লেখকই বুঝি বা ইবসেনের মানস-পুত্র।

পার্থক্যকে নজরুল কীভাবে নিরূপণ করেছেন। নজরুল বলছেন যে রাশিয়া দিয়েছে revolution-এর বেদনার জ্বালা আর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া দিয়েছে বেদনার দীর্ঘশ্বাস। রাশিয়া দিয়েছে রক্ততরবারি, নরওয়ে দিয়েছে চোখভরা জল। রাশিয়া শক্তিবলে দুঃখের কারাগার ভাঙতে চেয়েছে আর নরওয়ে চির-জাগ্রত সুন্দর দেবতার কাছে প্রার্থনার সজলচোখ তুলে ধরতে বলেছে।
নরওয়ের দু'জন বিখ্যাত সাহিত্যিক হ্যামসুন ও বোয়ারের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত:

> হ্যামসুন বোয়ারের প্রত্যেকেই অর্ধেক Dreamar অর্ধেক ঔপন্যাসিক। যোহান বোয়ারের Great Hunger-এর Swan যেন ভারতেরই উপনিষদের আনন্দ। তাঁর The Prisoner Who Sang-এর নায়ক যেন পাপে-পুণ্যে অবিশ্বাসী নির্বিকার উপনিষদের সচ্চিদানন্দ। হ্যামসুনের Growth of the Soil-এর Pan-এর ছত্রে ছত্রে যেন বেদের ঋষিদের মত ধ্যানের আকুতি। যে করুণ সুন্দর দুঃখের যে মানবতাত্মার বেদনা এঁদের লেখায় সিন্ধুতীরের উইলোতরুর মত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে তার তুলনা জগতে কোন কালের কোন সাহিত্যে নেই।

নজরুল বলছেন সহিষ্ণুতার এই আত্মিক বুদ্ধভঙ্গিকে ভ্রূকুটি কুটিল, বিদ্রূপের অবিশ্বাসের নির্মম হাসিতে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন 'বার্নার্ডশ'—আনাতোল ফ্রাঁস—জেসিতো বেনাভাঁতে। পকিন্তু দার্শনিক গুরু

যেমন মার্কস তেমনি এঁদের গুরু ক্রসেড। নজরুল তাই বলেন 'তাঁদের পেছন থেকে উঁকি দেয় ক্রসেড।' নজরুলের ধারণা এঁদের সন্দিগ্ধ হাসির মধ্যেও পার্থক্য আছে। যেমন বেনাভাঁতে—
"বেনাভাঁতেও হাসেন, কিন্তু এ বেচারা ওঁদের মধ্যেই একটু ভীরু। ...সে নির্মম কিন্তু সে বার্নার্ড শ'র মত অবিশ্বাসী নয়।"

কিন্তু এই প্রবীণ বৈদগ্ধিক মতাদর্শের পাশে আর এক ধরনের সাহিত্য বিরাজ করছে। যদি মধ্যে চমকে দিয়ে যাচ্ছে কখনো শাণিত চিৎকার নেই আছে জনাড়িতের নীরব কর্মপ্রবাহ। নজরুল বলছেন:

> এরি মাঝে আবার শান্ত লোক চুপ ক'রে কৃষাণ জীবনের সুখ-দুঃখের কথা ব'লে যাচ্ছে— তাদের একজন ওয়াদিশল্ রেমন্ট—পোলিশ আর একজন গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা ইতালীয়ান।'

এ-যেন কোলাহলের বাইরের প্রশান্ত পল্লীজীবনের কর্মবিলাসের কয়েকটি সুখের মুহূর্তের কথা। কিন্তু যুদ্ধবাদী সাহিত্যের রণতূর্য হঠাৎ এই স্বপ্নঘোর কাটিয়ে দেয়। অবশ্য এ-যুদ্ধ বিপ্লবীদের নয়— সাম্রাজ্যবাদীদের, ফ্যাসিস্তদের। আর এর অগ্রনায়ক হ'লেন ইতালীর দ্যআনন্‌ৎসিও ও কিপলিং। নজরুলের ভাষায়:

> কিন্তু গল্প শোনা হয় না—হঠাৎ চমকে উঠে শুনি, আবার যুদ্ধ বাজনা বাজছে—এ যুদ্ধ-বাদ্য বহু শতাব্দীর পশ্চাতের। দেখি, তালে তালে পা ফেলে আসছে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত সেনা। তাদের অগ্রে ইতালির দ্যআনন্‌ৎসিও, কিপলিং প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন এই চিন্তাধারার সংঘর্ষে—কবির মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। কোন্‌টি ঠিক, কোন্‌টি যথার্থ? মানুষের মঙ্গলের জন্য শুভঙ্কর কি? —এই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ ক'রে কবি যখন ক্লান্ত তখন তার কানে আসে আর এক সাহিত্যিকের বাণী—নোগুচির বাণী। নজরুলের ভাষায়:

> ক্লান্ত হ'য়ে নিশীথের অন্ধকারে ঢুলে পড়ি। হঠাৎ শুনি দূরাগত বাঁশীর ধ্বনির মত প্রাচ্যের স্বপনচারী নোগুচির গম্ভীর অতলতার বাণী—The sound of the bell, that leaves the bell itself!

পাঁচ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদে প্রবন্ধে বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে নজরুল তাঁর সুস্পষ্ট ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এ-কথা ঠিক যে বিশ্বের বহু দেশের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক তাঁর আলোচনা থেকে বাদ গেছেন। কিন্তু যাঁদের সংগে তাঁর পরিচয় হয়েছে, এবং তাঁদের অনেকেই সে দেশের প্রায় প্রতিনিধিত্বমূলক সাহিত্যব্যক্তিত্ব, তাঁদের সাহিত্যের একটা মোটামুটি ধারণা এতে তিনি দিতে পেরেছেন। এই কাজটি সামান্য হ'লেও খুব সহজ নয়। পরিপাক শক্তির অসাধারণত্ব ব্যতীত বিদ্যুৎ-গতিতে বিষয়টিকে উদরস্থ এবং আত্মস্থ ক'রে পরিবেশন করা দৈবপ্রতিভাবান ব্যক্তি ভিন্ন সম্ভব নয়।
উপরের আলোচিত প্রবন্ধটি ছাড়া কেবল সাহিত্যের উপর লেখা নজরুলের পাঁচটি প্রবন্ধ চোখে পড়ে। এর একটি 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান', 'জনসাহিত্য,'* 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজে'র মুখবন্ধ; 'মুলকুল-ই-

*এই প্রবন্ধটি নজরুলের একটি অলিখিত বক্তৃতা। এর লিখিত রূপদান করেন কবি আবদুল কাদির অবশ্য কবির অনুমোদন নিয়ে।

শিরাজ' (হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী) ও ওমরের কাব্য ও দর্শন।' এইসব প্রবন্ধ যে গবেষকের নিষ্ঠা নিয়ে লিখিত হয়েছে তা নয়। কিন্তু এই প্রবন্ধেও নজরুলের সাহিত্য-বিচার দৃষ্টির আলোকপাত ঘটেছে।

প্রথমে 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধটির কথা ধরা যাক। গোটা প্রবন্ধে তিনি বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন এবং তার ভবিষ্যৎ প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন। মাত্র তিন পৃষ্ঠার ছোট্ট প্রবন্ধে তিনি সাহিত্য, শিল্প সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণার যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। এ থেকে তাঁর সাহিত্য-সাধনার পিছনে পাহারারত তাঁর সজাগ মনটিকে বোঝা যায়। নজরুলের মূল বক্তব্য ছিল যে সাহিত্য হবে উদার সজীব, আন্তরিকতাময়, প্রাণময়, বৈচিত্র্যময়, আনন্দময় এবং সৌন্দর্যময়। এতে তিনি নিষ্প্রাণ অনুদার জড়তাগ্রস্ত সাহিত্যকে সাহিত্য নয় ব'লে মন্তব্য ক'রেছেন। তিনি প্রবন্ধটিতে সাহিত্য ও শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। এতে তাঁর প্রসিদ্ধ বক্তব্যগুলো হ'ল:

১. যে সাহিত্য জড়, যার প্রাণ নাই, সে নির্জীব সাহিত্য দিয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না, আর তাহা স্থায়ী সাহিত্যও হইতে পারে না।

২. সাহিত্যের মুক্তধারায় থাকিবে চলার আনন্দ, স্রোতের বেগ এবং ঢেউ-এর কলগান ও চঞ্চলতা।

৩. যে সাহিত্যিকের স্বাস্থ্য যত ভাল, যিনি যত বেশী প্রফুল্ল চিত্ত, তাঁর লেখা তত বেশী স্বাস্থ্যসম্পন্ন তত বেশী কলমুখর।

৪. 'গুঁয়ে মারা' পিলে রোগাক্রান্ত সাহিত্যিকের লেখাই দেখিবেন অসুস্থ (morbid); ইহাই সাহিত্যের স্বচ্ছ ধারায় আবিলতা আনে।

৫. লেখকের লেখা হইতেছে তাঁহার প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি। যেখানে লেখা সত্য, তাহার লেখাতেও সে-সত্য সত্যভাবেই ফুটিয়া উঠিবে; যেখানে লেখক মিথ্যা, সেখানে সেই মিথ্যাকে তিনি হাজার চেষ্টা করিলেও লুকাইতে পারিবেন না।

৬. সাহিত্যিকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মত উন্মুক্ত উদার, তাহাতে কোন ধর্মবিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ, বড়-ছোট জ্ঞান থাকিবে না। বাঁধ-দেওয়া ডোবার জলের মত যদি সাহিত্যিকের জীবন পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্য সাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হইবে। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আঁতুড় ঘরেই মারা যাইবে।

৭. সাহিত্যিক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথায় ছোঁয়া দিবেন। সাহিত্যিক যতই কেন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে-কোন লোক বলিতে পারে, ইহা তাঁহারই অন্তরের অন্তরতম কথা ;-----এই রূপেই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকে বলে সাহিত্যে সার্বজনীনত্ব। ---আমাদিগকেও তাই এখন করিতে হইবে সাহিত্যে সার্বজনীনতা সৃষ্টি। অবশ্য নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়াইয়া, না হারাইয়া।

৮. তিনিই আর্টিষ্ট, যিনি আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। আর্ট-এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth), এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়। আর্টকে

> সৃষ্টি, আনন্দ বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যাইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

১৯২০ সালে নজরুলের বয়স যখন ২২ বছর মাত্র তখন তিনি এটি লেখেন। সেই বয়সেই সাহিত্য শিল্প সম্পর্কে একটি নিজস্ব মতাদর্শ গ'ড়ে নেওয়া কম কথা নয়। পরবর্তীকালে নজরুলের নিজের সাহিত্যে এই আদর্শ বহুলাংশে রূপায়িত হয়েছে। বলা বাহুল্য এই লেখাতে তাঁর সমালোচনা দৃষ্টি আচ্ছন্ন হ'য়ে নেই। নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যখন বলেন:

> সাহিত্য হইতেছে প্রাণের অভিব্যক্তি, যাহার নিজের প্রাণ নাই, যে নিজে জড় হইয়া গিয়াছে, সে লেখায় প্রাণ দিবে কোথা হইতে? যাহার নিজের বুকে রসের আলিম্পনা ফুটে না, সে চিত্রে রঙ ফুটাইবে কেমন করিয়া? আমাদের অধিকাংশই হইয়া গিয়াছে জড়, কেননা আমাদের জীবন একঘেঁয়ে, তাহাতে না আছে কোন বৈচিত্র্য, না আছে কোন সৌন্দর্য। তাছাড়া, বোঝার উপর শাকের আঁটির মত আমরা নাকি আবার জন্ম হইতেই দার্শনিক, কাজেই বয়স কুড়ি পার না হইতেই আমরা গম্ভীর হইয়া পড়ি অস্বাভাবিক রকমের। আর, গম্ভীর হইলেই অমনি নির্জীব অচেতন প্রাণীর মত হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। এই যে চলার আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জড় ভরতের মত বসিয়া থাকা, ইহাই আমাদের প্রাণশক্তিকে টুটি টিপিয়া মারিতেছে।

তখন বিশ্লেষণ দ্বারা আত্মোপলব্ধির প্রচেষ্টা লক্ষ্য না ক'রে উপায় থাকে না।

এর পর 'জন সাহিত্য।' 'জনসাহিত্যে'র মূল বক্তব্য কবির কথায়—বলা যাক:

> জনসাহিত্যের উদ্দেশ্য হ'ল জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য রসের পরিবেশন করা। ----তাদের মত ক'রে তাদের কথা, তাদের গল্প বলুন। তারা তা বুঝতে পারবে। কিন্তু সাবধান, আপনাদের মুরুব্বিয়ানার ভাব যেন প্রকাশ না পায়---জনগণের সাথে সম্বন্ধ করতে হলে তাদের আত্মীয় হ'তে হবে।----জন-সাহিত্যের জন্য জনগণের সাথে যোগ থাকা চাই।

সম্ভবতঃ কৃষকের গান, শ্রমিকের গান এবং ধীবরের গানে কবি এই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁর পরীক্ষা যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে না।

এবারে "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজে"-র 'মুখবন্ধ' ও 'নমুনা-ই-পিয়াজ' প্রবন্ধ দু'টির কথা বলা যাক। এই দুটি প্রবন্ধকে হাফিজের Critical appreciation বলা যেতে পারে। তবু এর মধ্যে সমালোচকসুলভ আত্মসচেতনা দেখা যায়। 'মুখবন্ধে' তিনি বলছেন:

> আমি হাফিজের মাত্র দুটি রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি—যদিও আরও তিন চারটি বাদ দেওয়া উচিত ছিল। যে দুটি রুবাই বাদ দিয়েছি তার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হ'ল। সমস্ত রুবাইয়াতের আসল সুরের সংগে এই দুটি রুবাইয়াতের সুরের কোন মিল নেই। (পাঠকদের এই রুবাইয়াৎ দুটি নজরুলের রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজের অনুবাদের মুখবন্ধে দেখে নিতে অনুরোধ জানাই।) রুবাইয়াতে আগাগোড়া শারাব, সাকী, হাসি, আনন্দ, বিরহ ও অশ্রুর মধ্যে এই উপদেশের যে

সুর কানে রীতিমত বেখাপ্পা ঠেকে। আমার অনুবাদের আটত্রিশ নম্বর রুবাই-ও প্রক্ষিপ্ত ব'লে মনে হয়। কেননা প্রথম দু'লাইনের সাথে শেষের দু লাইনের কোন মিল নেই, এবং ওর কোন মানেও হয় না। দিনের ঔরসে রাত্রি গর্ভবতী হবেন, এ আর যিনি লিখুন—হাফিজ লিখতে পারেন না।

'ওমরের কাব্য ও দর্শন' প্রবন্ধেও দেখা যায় নজরুল বলছেন:

আমি ওমরের রুবাইয়াৎ ব'লে প্রচলিত প্রায় এক হাজার রুবাই থেকেই কিঞ্চিদধিক দু'শ রুবাই বেছে নিয়েছি; এবং তা কালী ভাষার রুবাইয়াৎ থেকে। কারণ আমার বিবেচনায় এইগুলি ছাড়া বাকী রুবাই ওমরের প্রকাশভঙ্গী বা স্টাইলের সঙ্গে একেবারে মিশ্ খায় না।

এ-সব তাঁর রুচি ও শিল্পবোধসম্পন্ন সমালোচকসুলভ ছাঁকুনি যে ব্যবহৃত হ'য়েছে তা সম্ভবতঃ বলা বাহুল্য।

হাফিজের কবিতার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে নজরুল বলেছেন:

হাফিজের গান অতল গভীর সমুদ্রের মত। কূলের পথিক যেমন তাহার বিশালতা, তরঙ্গলীলা দেখিয়া অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে, অতল-তলের সন্ধানী ডুবুরী তেমনি তাহার তলদেশে অজস্র মণিমুক্তার সন্ধান পায়। তাহার উপরে যেমন ছন্দ-নর্তন, বিপুল বিশালতা; নিম্নে তেমনি অতল গভীর প্রশান্তি, মহিমা।

বলা বাহুল্য হাফিজের দর্শন সম্পর্কে এ-প্রবন্ধে কোন বিস্তারিত বিশ্লেষণ তিনি করেন নি। শুধু একটি বাক্যে তিনি বলেছেন 'হাফিজ ছিলেন উদাসীন সুফী।' কিন্তু 'ওমরের কাব্য ও দর্শন' প্রবন্ধে ওমরের দর্শন নিয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। বলেছেন:

----আমাদের কাছে, বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানপুষ্ট কারণজিজ্ঞাসু মনের কাছে, ওমরের কবিতা যেন আমাদেরই প্রশ্ন, আমাদেরই প্রাণের কথা। আমরা জিজ্ঞাসা করি করি করেও যেন সাহস ও প্রকাশ ক্ষমতার দৈন্যবশতঃ তা জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না। বিগত মহাযুদ্ধের মতই আমাদের আজকের জীবন মহাযুদ্ধ ক্লান্ত। অবিশ্বাসী মন বিদ্রোহ ক'রে ওঠে—কেন এই জীবন, মৃত্যুই বা কেন? স্বর্গ, নরক, ভগবান ব'লে সত্যই কি কিছু আছে? আমরা ম'রে কোথায় যাই? কেন এই হানা-হানি? এই অভাব, দুঃখ, শোক? এমনি শত অতৃপ্তি প্রশ্ন, যার উত্তর কেউ দিতে পারেনি। যে উত্তর দিয়েছে, সে তার উত্তরের প্রমাণে কিছুই দেখাতে পারেনি; শুধু বলেছে: বিশ্বাস কর। তবু আমাদের মন বিশ্বাস করতে চায় না, সে তর্ক করতে শিখছে? এই চিরন্তন প্রশ্ন ওমরের জ্ঞান-প্রশান্ত মনে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝড়ের মতই দোল দিয়েছিল। সেই তরঙ্গ সংঘাতের সংগীত, বিলাপ, গর্জন, শুনতে পাই তাঁর রুবাইয়াতে।-----

ওমর বলতে চান, এই প্রশ্নের হাত এড়াবার জন্য কত অবস্থার পরপারে এলেন, তবু যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নই রয়ে গেল। মানুষের দুঃখ এক তিলও কমল না। তাই তিনি বলছেন, এ-সব

মিথ্যা, পৃথিবী মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, পাপ-পুণ্য মিথ্যা, তুমি মিথ্যা আমি মিথ্যা, মরণ মিথ্যা, বিশ্ব মিথ্যা। একমাত্র সত্য—যে মুহূর্ত তোমার হাতের মুঠোয় এল তাকে ছুঁয়ে ভোগ ক'রে নাও। স্রষ্টা যদি কেউ থাকেনও, তিনি আমাদের দুঃখ-সুখে নির্বিকার—আমরা তাঁর হাতের খেলার পুতুল। সৃষ্টি করছেন ভাঙছেন তাঁর খেয়াল-মত, তুমি কাঁদলেও যা হবে, না কাঁদলেও তা হবে—যা হবার তা হবেই। যে চ'লে গেল, সে একেবারেই চলে গেল; যে আর আসবেও না ফিরবেও না। তাঁর পাপ-পুণ্য স্রষ্টারই আদেশে—তাঁর খেলা চালাবার জন্য। মোটকথা স্রষ্টা একটা বিরাট খেয়ালী শিশু বা ঐন্দ্রজালিক।

কাব্যেরও এক ধরনের সমালোচনা। সে-ভাবে উপরের উদ্ধৃত অংশ সমালোচনা কিন্তু তাত্ত্বিক ও রস-তত্ত্বের পার্থক্য নিরূপণার্থে যে সমালোচনা এটি তা নয়। সে সমালোচনা এই প্রবন্ধে নজরুল করেছেন তবে তা ওমরকে নয় তাঁর অনুবাদক ফিটজিরাল্ড ও তাঁর সমর্থকদের। নজরুল বলছেন:

ওমরকে তাঁর কাব্য প'ড়ে যাঁরা তাঁকে Epicurean ব'লে অভিহিত করেন, তাঁরা পূর্ণ সত্য বলেন না। ওমরকে Epicurean বলা যায় শুধু তাঁর 'রুবাইয়াত' শ্রেণীর কবিতার জন্য। ওমরের কাব্যে শারাব সাকীর ছড়াছড়ি থাকলেও তিনি জীবনে ছিলেন আশ্চর্য রকমের সংযমী। তাঁর কবিতায় যেমন ভাবের প্রশান্ততা, অথবা সংযমের আঁটসাঁট বাঁধুনি, তাঁর জীবনও ছিল তেমনি।
ফিট্জিরাল্ডের মুখে ঝাল খেয়ে অনেকেই ব'লে থাকেন, ওমর যে শারাবের কথা বলেছেন তা দ্রাক্ষারস, তাঁর সাকীও রক্ত-মাংসের। ফিট্জিরাল্ড তাঁর মতের পরিপোষকতার জন্য কোন প্রমাণ দেননি। তাঁর মতে মত দিয়েছেন যাঁরা তাঁরাও কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। ওমর তাঁর রুবাই'তে অবশ্য শারাব বলতে আঙুরের উল্লেখ করেছেন; কিন্তু ওটা পারস্যের সকল কবিরই 'বলার জন্য বলার' বিলাস।"

অর্থাৎ ফিটজিরাল্ডের ওমরের রুবাইয়াতের অনুবাদ পাঠে ওমর সম্বন্ধে যে একটা ছন্নছাড়া দায়িত্বহীন অসংযমী ভোগ-বিলাসী মানুষের চরিত্র চোখে ভাসে নজরুল ওমরের সেই ইমেজটাকে, সেই ভাবমূর্তি-টাকে প্রকৃত ওমরের চরিত্রের যথার্থ স্বরূপ নয় বলে মনে করেন। নজরুলের ধারণা জ্ঞানী ও সবার শ্রদ্ধেয় ওমর ইচ্ছা থাকলেও আত্মমর্যাদার জন্যে অসংযত হ'তে পারেননি—তাঁর মতে ওমর 'শারাব-সাকীর স্বপ্নই দেখেছেন,—তাদের ভোগ ক'রে যেতে পারেননি। ভোগস্পৃহা মনে এমন আগুন জ্বেলেছে।' আবার ঐতিহ্যগত ধারণাকে নজরুল উল্টে দিতে চাননি। পারসী সাহিত্যে শরাব প্রেমের প্রতীক, সাকী মুর্শিদের প্রতীক। নজরুল বলছেন—"ইরানের কবিরা শরাবকে সত্যিকার মদ ব'লে ধ'রে নেন না। তাঁরা শরাবকে আনন্দ ভূমানন্দকে বোঝেন—যে আনন্দরূপিণী সুরার নেশায় আমরা ঋষি সংস্কারের সব ভুলে গিয়ে আপনাতে আপনি বিভোর হ'য়ে থাকেন। সাকী বলতে বোঝেন মুর্শিদকে, গুরুকে, যিনি সেই আনন্দ-শরাব পরিবেশন করেন।" এই কথা বলার পর অবশ্য তিনি একটি আশ্চর্য কথা বলেছেন এবং সেটা দার্শনিক দৃষ্টির কথা নয়, কবি-দৃষ্টির কথা। নজরুল বলছেন:

> যাক ও-সব তত্ত্বকথা দিয়ে আমাদের প্রয়োজন নেই; কেননা আমরা তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, আমরা রসপিপাসু। ওমর কবিতা লিখেছেন এবং তা চমৎকার কবিতা হয়েছে, আমাদের পক্ষে এই যথেষ্ট। আমরা তা প'ড়ে অত্যন্ত আনন্দ পাই;

কবিতা সম্পর্কে এটাই কিন্তু রসজ্ঞের শেষ কথা। দার্শনিক কবিতা লেখেন না, কবিতা লেখেন কবি। সুতরাং যা কবিতা হ'য়েছে তার দর্শন নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? কাব্যানুভূতি স্বভাব বিশেষে এক একজনের কাছে এক এক মূর্তি নিয়ে দাঁড়াবে। নজরুলের কাছে ওমরের ভাবমূর্তি একজন প্রজ্ঞাবান বিদগ্ধ কবির।

সাহিত্যের উপর লেখা নজরুলের প্রবন্ধাবলীতে তাঁর রসজ্ঞ দৃষ্টির আলোচনা করা গেল। এবার তাঁর অভিভাষণাবলীর বক্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এই অভিভাষণে তাঁর সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কিত নিজস্ব ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। বেতার বাংলার নজরুল-সংখ্যা, ১৯৭৭-এ মৎ রচিত 'সমালোচক নজরুল' প্রবন্ধে তাঁর একবার্টি হলের প্রতিভাষণ থেকে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণার কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। বলা বাহুল্য এই অভিভাষণগুলিতে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের সমাজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে যেমন তেমনি তাঁর নিজের সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সমাজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে সেখানে তিনি ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তবে প্রতিটি অভিভাষণে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তা যে একজন সমাজহিতৈষী, দেশপ্রেমিক এবং উদার মানবপ্রেমিক মহাপুরুষের চিন্তা তাতে কোন সন্দেহ নেই। বোঝা যায় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যে মুসলিম জাগরণ ঘটেছিল তার পিছনে নজরুলের অবদান অসামান্য। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামী, কর্মবিমুখতা, প্রগতি বিমুখতা, শিল্পচর্চা-বিমুখতা, কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, স্বার্থপরতা, অসহিষ্ণুতা, অনুদারতা, রক্ষণশীলতা পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, শরাফতী, ভণ্ডামী প্রভৃতিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। তবে তাঁর এই সমালোচনা ধ্বংসশীল নয়, সৃজনশীল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কি উপায়ে, কূপমণ্ডুকতা এবং অজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আলোকে আসতে হবে তারও নির্দেশ দিয়েছেন। ১৯২৭-এ ইব্রাহীম খাঁকে লেখা পত্রোত্তরে তিনি বলেছিলেন:

> বাঙলার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙাল কি না জানিনে, কিন্তু মনে যে কাঙাল, অতিমাত্রায় কাঙাল, তা আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব ক'রে আসছি বহুদিন হ'তে।

নজরুলের এই সমালোচনা ছিল ধনী মুসলমান সমাজের প্রতি, ধর্মান্ধ স্বার্থপর গোঁড়া মুসলমানদের প্রতি—যাঁরা কবির কাব্য-প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়া ত দূরের কথা তাঁকে 'কাফের' 'শয়তান' ইত্যাদি শব্দের বিশেষণে তিরস্কার করতে পর্যন্ত দ্বিধা করেননি।

কবি এঁদের তিরস্কারের গঠনমূলক সমালোচনা করেছিলেন এই বলে যে ইসলাম ধর্মকে মোল্লা মৌলবীরা যে-ভাবে গ্রহণ করেছে সত্যিকার ইসলাম তা নয়। সেই চিঠিতেই তিনি জানিয়েছিলেন যে 'ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি: গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।' নজরুলের বিশাল সাহিত্য-জীবনে ইসলামের অনুপ্রেরণার মুখ্য ভূমিকা যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামের সারমর্ম তিনি জেনেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব হ'য়েছিল:

আবুবকর, উসমান, উমর, আলী হাইদার:
দাঁড়ি যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
দাঁড়ি মুখে সারি গান লা-শরিক-আল্লাহ্।

ইসলাম যে পৃথিবীতে আজও টিকে আছে প্রধানতঃ উল্লিখিত পাঁচজন মহামানবের অচিন্তনীয় আত্ম-ত্যাগের আদর্শের ভিত্তিতে। ঐশ্বর্যভোগ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এঁরা কোন দিন লোভ-রাক্ষসের দ্বারা পরাজিত হননি। রাজা হ'য়েও এঁদের যে অনাসক্তিতে আত্মবলিদান এই আদর্শের অটল নিদর্শন ইসলামের আয়ুকে চিরঞ্জীব করেছে। কবির বক্তব্য ছিল এই আদর্শের ভিত্তি যে ধর্মের আছে তার কখনও মৃত্যু হ'তে পারে না। দুঃখের বিষয় ইসলামের এই মর্মকথাটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেননি তার ধর্মধ্বজকেরা এবং তাই ধর্মপূজা ক'রেও তাঁরা ধার্মিক হ'তে পারেন না—তাঁরা অধার্মিক থেকে যান। ১৯৪০ এ কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটের ভাষণে এই অধার্মিক ধর্মব্যবসায়ী রাজনীতিকদের তিনি এইভাবে সমালোচনা করেন:

> যার অন্তর বাহির সমস্তটা রইল আত্মতৃপ্তির ক্ষুধায় পূর্ণ সেই ক্ষুধিত মূর্তি আজ বাইরে ত্যাগের গেরুয়া ও খেলকা পরে কৌমের দেশের জনগণকে নিয়ে চলেছে মৃত্যুর পথে, জাহান্নামের পথে।---- আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে--আল্লাহ্‌র মসজিদের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা থাকে যে মুসলমানের—কোরআন মজিদের এক হরফও যারা হৃদয়ঙ্গম করে—তারা জাত ভাইকে জাতিকে এমন মিথ্যার পথ দিয়ে নিয়ে যায় না। এদের খেলকার ভিতরে, এদের চোগা চাপকানের অন্দরে—যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি যায়, তাঁরা দেখবেন—এরা সুদখোর কাবুলীর চেয়েও ভীষণ—দৈত্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের সিরাজগঞ্জের নাট্যভবনের ভাষণে তিনি বলেন:

> আমাদের বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামি, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে, কোনো মুসলমানের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের সমাজের কল্যাণকামী যে সব মৌলানা সাহেবান খাল কাটিয়া বেনো-জল আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ভবিষ্যৎদর্শী হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন—বেনো জলের সাথে সাথে ঘরের পুকুরের জলও সব বাহির হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সেই খাল বাহিয়া কুসংস্কারের অজস্র কুমীর আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মৌলানা মৌলবী সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষুকর্ণ বুজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইঁহারা যে কওমের জাতির ধর্মের কি অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান নাই বলিয়া ইহাদের ক্ষমা করা যায়। ইঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই "মন-মন শাহ্-ফকীর, বর্মন বে ইট।" ইঁহাদের নীতি "মুর্দা দোজখ-মে যায় য়া বেহেশ্‌ত মে যায়, মেরা হালুয়া রুটি সে কাম।"

কুসংস্কারগুলো কি? তা নাম ক'রে ক'রে তিনি অবশ্য দেখাননি। তবে একটা কুসংস্কার পর্দা প্রথার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন :

> আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের বাঙলাদেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে; তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে।--- আমাদের কন্যা-জায়া জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি।--- যৌনার রাজ্যে পুরুষ আজ জালিম, নারী আজ মজলুম। ইহাদেরই অভিশাপে আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের শত হীনবীর্য সন্তানের জন্ম।

আজ থেকে আরম্ভ ক'রে পঞ্চাশ বছর আগে বাঙলার মুসলমান সমাজ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প-চর্চায় নিদারুণ পশ্চাৎপদ ছিল। আর এর মূলে ছিল মোল্লা-মৌলবীদের ধর্ম-ব্যাখ্যা। সে-ধর্মব্যাখ্যা দেখা গেছে সমাজের স্বার্থের চেয়ে আত্মস্বার্থমুখী। নজরুল তাই প্রায় ক্ষেত্রেই মোল্লা মৌলবীদের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদের 'ফতোয়াবাজ' ইত্যাদি বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় বিধিনিষেধের দরুণ বাঙলার মুসলমান সমাজ পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজের থেকে অনেকখানি পিছিয়ে ছিল; আর কারণও ছিল ধর্ম-পুরোহিতদের বিন্ধ্যাচল সদৃশ্য শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার নিষেধ। নজরুল তরুণদের এই নিষেধ অমান্য করার আহ্বান জানিয়েছেন এইভাবে :

> সঙ্গীত শিল্পের বিরুদ্ধে মোল্লাদের স্বষ্ট এই লোকমতকে বদলাইতে তরুণদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নাই। সকল বিধি নিষেধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়।
>
> আজ বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে একজনও চিত্রশিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে? এইসবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া যুঝিতে হইবে। নতুবা আর্টে বাঙালী মুসলমানের দান বলিয়া কোন কিছু থাকিবে না। পশুর মত সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কি, যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছু না থাকে?

মুসলমানদের উন্নতির আর এক অন্তরায় তাঁদের নিজেদের মধ্যে একতার অভাব। নজরুল তাই ১৯৩৬-এ ফরিদপুরে প্রদত্ত ভাষণে বলেন :

> তোমাদের কর্তব্য সম্মিলিত হওয়া, সংঘবদ্ধ হওয়া। যে ইখওয়াৎ সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, যে একতা ছিল মুসলিমদের আদর্শ, যার জোরে মুসলিম জাতি এক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবী জয় করেছিল, আজ আমাদের সে একতা নেই—হিংসায়, ঈর্ষায়, কলহে, ঐক্যহীন বিচ্ছিন্ন। দেয়ালের পর দেয়াল তুলে আমরা ভেদবিভেদের জিন্দানখানা সৃষ্টি করেছি: কত তার নাম— শিয়া, সুন্নী, শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, হানাফী, শাফী, হাম্বলী, মালেকী, লা-মজহাবী,

ভয়াবী ও আরও কত শত দল। এই শত দলকে একটি বোটায়, একটি মৃণালের বন্ধনে বাঁধতে পার তোমরাই। শতধা-বিচ্ছিন্ন এই শতদলকে এক সামিল করো, এক আঘাত করো সকল ভেদ বিভেদের প্রাচীর নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙে ফেল।

আমি বলেছি নজরুল তাঁর সমাজকে সমালোচনা করলেও সে সমালোচনা ছিল গঠনমূলক। উপরের দুটি উদ্ধৃতি তার প্রমাণ। এইভাবে তিরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজকে এগিয়ে দেওয়ার পন্থাগুলিকেও জানিয়ে দিতে ভোলেন নি।

একটা ব্যাপার কিন্তু দৃষ্টি এড়ায় না। নজরুল ধর্মব্যবসায়ীদের দোষারোপ করলেও ধর্মকে নিন্দা করেননি। বরং তিনি ইসলাম ধর্মের মর্মগত আদর্শের স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন ধর্মের প্রধান শিক্ষা অপরের জন্য ত্যাগ, নিঃস্বার্থপরতা, স্বাধীনচিত্ততা, আল্লার পথে আত্মসমর্পণ।

এ-পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম তার সব কিছু মিলিয়ে দেখা যাবে যে দেশ, সমাজ, সমাজের মানুষ, বিশ্বমানব, দেশীয় সাহিত্য, তাঁর নিজের সাহিত্য ও বিশ্ব-সাহিত্য নিয়ে অনির্বাণ চিন্তায় তিনি সদাজাগ্রত ছিলেন। সমাজ বিশ্লেষণ ও আত্ম-বিশ্লেষণে কোথাও তিনি অচেতন ছিলেন না। তাঁর শেষ আত্মবিশ্লেষণ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত-জুবিলী উৎসবে প্রদত্ত তাঁর শেষ ভাষণ। এই ভাষণ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করব:

> অসুন্দরের সাধনা আমার নয়, আমার আল্লাহ্ পরম সুন্দর। তিনি আমার কাছে নিত্য প্রিয়-ঘন সুন্দর, প্রেম-ঘন সুন্দর, রস-ঘন সুন্দর, আনন্দ-ঘন সুন্দর।---- আমার সর্ব অস্তিত্ব, জীবন-মরণ-কর্ম, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যে তাঁরই নামে শপথ ক'রে তাকে নিবেদন করেছি। আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই, আমার ক্ষমা-সুন্দর প্রিয়তম আমার আমিত্বকে গ্রহণ করেছে।

'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী'র যুগে নজরুলের মধ্যে 'আমি'ত্বের ভাব দানা বেঁধেছিল। তিনি 'আমি'ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এই ব'লে যে 'পুরুষোত্তম'ই ঈশ্বরের স্বরূপ। মানুষের পৌরুষ-শক্তিই তার ঈশ্বর। পরবর্তীকালে [illegible] সেই অহঙ্কার আত্মসমর্পণে নিঃশেষ হয়। এখানে তারই উল্লেখ করেছেন। পরে বলছেন:

> আনন্দ রস-ঘন সর্বধর্মের এক না-জানা আকাশ থেকে যে শক্তি আমার মন ক্রয়তেন—আগেই বলেছি, তিনি মহাশূন্যরূপে মাঝে মাঝে হয়ে যান সমাধিস্থ। তখন আমিও হ'য়ে যাই নীরব, আমার বাঁশী আর বাজে না।

পৃথিবীর অনেক ভাববাদী শিল্পীর মত নজরুলের ধারণা ছিল যে এক অলক্ষ্য শক্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারই ইচ্ছা শক্তিতে তিনি কর্মশক্তি পান, কাব্য সৃষ্টিতে সক্ষম হন; তিনি সেই প্রেরণারূপ শক্তি হরণ করলে তাঁর পক্ষে কোন কিছু রচনা করা সম্ভব হয় না। এতে তাঁর সাহিত্যসাধনার উদ্দেশ্যও ব্যাখ্যাত হয়েছে:

> হিন্দু মুসলমানে দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে এক দিকে কঠোর দারিদ্র্য ঋণ অভাব —অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি

কোটি টাকা পাষাণ স্তূপের মত জমা হ'য়ে আছে—এই অসাম্য এই ভেদজ্ঞান দূর করতে আমি এসেছিলাম।

শেষে তিনি বলছেন:

সাহিত্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। আমি সাহিত্যে কি করেছি, তার পরিচয় আমার ব্যক্তিত্বের ভিতর। পদ্ম যেমন সূর্যের ধ্যান করে, তারই জন্য তার দল মেলে, আমি আমার ধ্যানের প্রিয়তমের দিকে চেয়ে গড়ে উঠেছি।

নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা ও ব্যাখ্যায় উপরিউক্ত বক্তব্য সম্ভবতঃ চাবির মত ব্যবহৃত হ'তে পারে। তবে এ-কথা যথার্থ যে তিনি তার প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও পত্রে যে-কথা বলেছেন যে আলোচনা করেছেন সে-কথাগুলোই তিনি তাঁর কবিতাতেও ছন্দে গেঁথেছেন এবং এইভাবে গদ্য-কবিতায় তিনি আমাদের ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনকে সমালোচনা করেছেন।

ধূমকেতুর ঐতিহাসিক পটভূমি

এস. এম. লুৎফর রহমান

বাইরের প্রেক্ষাপট

উপনিবেশিক ভারতের আধুনিক রাজনীতির প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখা যায়,—উনিশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক চেতনার সূচনা হয়। তৎকালীন ভারতীয়দের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে বহিষ্কৃত) প্রচেষ্টায় স্থাপিত, 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'।[১] কিছুকাল পরে এই সংগঠনের অনুকরণে পারসী সোরাবজী গঠন করেন 'বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন'। তারপর ১৮৮১তে 'মাদ্রাজ মহাজনসভা' স্থাপিত হয়।[২] এ সব প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। সংগঠনগুলোর কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক রূপ ছিল না। শাখা-প্রশাখা ছিল না। সেইজন্য অ্যালেন হিউমের প্রচেষ্টায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্থাপিত "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস"-কেই উপনিবেশ ভারতের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করতে হয়। এ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে:

It began as a body not unlike the Indian Association, bur it had its committees scattered over the different provinces, and it was this fact which made it into an organisation worth capturing when nationalism had become more effective.[৩]

কিন্তু কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে রাজনীতি ক্ষেত্রে যে জাতীয়তার উন্মেষ হতে থাকে—তা হিন্দু জাতীয়তা। প্রধানতঃ হিন্দু অভিজাত, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী ও বুর্জোয়াদের স্বার্থের রক্ষক হিসেবে কংগ্রেসের অভ্যুদয় হয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে স্যার সৈয়দ আহমদ কংগ্রেসের বিরোধিতা করা শুরু করেন। তিনি এ-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মুসলমানদের যোগাযোগ স্থাপন না করার অনুরোধ জানান। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে'র বার্ষিক সভায় কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মধারার বিরুদ্ধে তিনি দু'টি অভিযোগ উত্থাপন করেন। স্যার সৈয়দ বলেন—"কংগ্রেসের আশা-আকাঙ্ক্ষা সাধারণ প্রকৃতির নয়; ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক যতটা ঘনিষ্ঠ ও উত্তম হওয়া উচিত ছিল, তা মোটেই হয়নি। দ্বিতীয়তঃ সংখ্যালঘুদের স্বার্থের প্রতি এ সংগঠনের

---

১. See, A.B. Keith, A Constitutional History of India (London—1936), p. 176.

২. মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ। আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম (ঢাকা—পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৬৭), পৃঃ ১৫৮।

৩. E. Thompson & G. T. Garrat, Rise and fulfilment of British Rule in India. (Allahabad—1962), p. 543

বিশেষ সময় নেই।"[৪] এ বক্তব্য সত্য। কারণ জন্মক্ষণ থেকেই কংগ্রেস 'জাতীয় ঐক্যের মনোভঙ্গি সমূহকে সংহত করা'র উদ্দেশ্যে:

...demanded inter alia the presence of elected members in the councils, the right to discuss the budget and to ask questions, the reference to a standing committee of the House of Commons of issues between the councils and Governments simultaneous Examinations at a latter age for the civil service, the limitation of military expenditure, and the abolition of the Secretary of State's council.[৫]

এসব দাবী স্যার সৈয়দ আহমদের প্রীতিপ্রদ মনে হয়নি। সেকালের মুসলমানদের কংগ্রেস বিরোধিতার মূলকারণ ছিল অর্থনৈতিক শ্রেণী স্বার্থ। প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া-অভিজাত হিন্দুদের বিরুদ্ধে উদীয়মান বুর্জোয়া অভিজাত মুসলমানদের শ্রেণী স্বার্থগত দ্বন্দ্বই ছিল স্যার সৈয়দ আহমদের সরকার-তোষণ ও কংগ্রেস বিরোধিতার আসল বনিয়াদ। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের জন্ম ও পরিণামে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠারও ভিত্তি ছিল এই অর্থনৈতিক শ্রেণী দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী স্বার্থ।
কংগ্রেসের নিজস্ব ভূমিকা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে। ও'ম্যালী লিখেছেন:

A few Muhammadans indeed attended the early meetings, but as years went on, the Congress became more and more Hindu in character.[৬]

এমনি অব্যাহত সম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের মনোভংগি সমূহকে সংহত ও বিকশিত করে তোলার সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটি সরকারী কর্মনীতির প্রতিও আক্রমণ ক্রমশ তীব্র করে তুলতে থাকে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে খোলাখুলি কংগ্রেস নতুন 'কাউন্সিল অ্যাক্ট'-এর সমালোচনা করে এবং ভারত শাসনে কতিপয় ভারতীয়ের নিয়োগ ব্যতীত, সরকারী নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে অংশ লাভের দাবী জানায়। এ সময় থেকেই সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে কংগ্রেসে যোগদান নিষিদ্ধ করা হয়।[৭] কংগ্রেসের দাবী দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে ক্রমশ: আবেদন-নিবেদনের সুর পরিবর্তিত হতে থাকে এবং সদস্যদের মধ্যে নরম ও চরমপন্থীদের আবির্ভাব ঘটে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বালগঙ্গাধর তিলক-এর নেতৃত্বে কংগ্রেসে চরমপন্থীদের আত্মপ্রকাশ করে।[৮] ক্রমে ক্রমে কংগ্রেসের মুসলিম সদস্যদের সঙ্গেও নরম ও চরমপন্থীদের বিরোধ তীব্রতা লাভ করতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান সদস্য কংগ্রেস থেকে তাঁদের সদস্যপদ প্রত্যাহার করেন। মাত্র সতেরজন মুসলমান তখনও এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন।[৯]

---

৪. ওয়ালীউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬০।
৫. Keith, Ibid. P. 177.
৬. L.S.S. O'Malley. History of Bengal, Bihar & Orissa Under British Rule (Calcutta—1925), p. 518.
৭. Thompson. Ibid, p. 544.
৮. প্রীতিবিকাশকর রায় চৌধুরী। প্রীতিবিম্ব (প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা—১৯৫৬), পৃঃ ২৪০।
৯. Thompson. Ibid, p. 544.

কিন্তু জনতার গণ-আন্দোলনের তিলক ধারণ করে বিশ শতকের অভ্যুদয় হয়। ব্রিটিশ ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম ধর্মঘট দেখা দেয়—১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর এমপ্রেস্ মিলস্-এ। তারপর ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'কমপক্ষে পঁচিশটি ধর্মঘট কার্যে পরিণত হয়।'[১০] এসব ধর্মঘটের প্রধান দাবিগুলো—সুবিবেচনক শর্ত আদায় সাপেক্ষে মালিক পক্ষের সঙ্গে আপোষ। কিন্তু বুর্জোয়া-অভিজাত শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন অপেক্ষা মজুরদের ধর্মঘট সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত ছিল। সমগ্রভাবে তাঁরা শ্রমিক জনতার স্বার্থের প্রতিও দৃষ্টিপাত করতো।

বিশ শতকের প্রথম দশকে বাঙলা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা দ্রুত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এক অভূতপূর্ব জনজাগরণ দেখা দেয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার জনসংখ্যা দাঁড়ায় সাত কোটি আশি লক্ষ এবং বাঙলা দেশের আয়তন তখনকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তনকে ছাড়িয়ে যায় এবং ফ্রান্স ও জার্মানীর আয়তনের কাছাকাছি পৌঁছে।[১১] লর্ড কার্জন 'রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড রাইফেলে' প্রাপ্ত অনেক সমস্যার অনুরূপ এ-সমস্যা সমাধানের জন্যও তৎপর হন। তাঁর সরকার এত বড় দেশের প্রশাসনিক অসুবিধা দূর করার জন্য বাঙলা দেশকে ভাগ করার একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু এই প্রস্তাব, বিরোধের সম্মুখীন হলে ভারত সরকার সম্পূর্ণ ভিন্ন আর একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। পূর্ব পরিকল্পনা অপেক্ষা এ পরিকল্পনার প্রধান বিশেষত্ব হোল, নতুন ব্যবস্থায় বাঙলা ভাষাভাষী একটি দেশের দ্বিধাবিভক্তি এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চেতনা ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অংশ পশ্চিম বাঙলাকে পশ্চাৎপদ পূর্ব বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন করণ। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই ঘোষিত রূপরেখা অনুযায়ী বাঙলা বিভাগ ঐ সালের অক্টোবর থেকে কার্যে পরিণত হয়। ১৪১ হাজার বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট ও ৫ কোটি ৫০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত বাঙলার বড়লাট হন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার এবং ১১২ হাজার বর্গমাইল আয়তন ও ৩ কোটি ১০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত পূর্ব বাঙলার বড়লাট হন আসামের চীফ কমিশনার স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার।[১২]

এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রবল আপত্তি উত্থাপন করে এবং ৭ই আগস্ট সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। জনসাধারণ কংগ্রেসের আহ্বানে বিপুল সাড়া দেয়। কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকে। ফলে বঙ্গভঙ্গ চালু হবার দিন ১৬ই অক্টোবর কংগ্রেস কলকাতায় শোক দিবস পালনের আহ্বান জানায়। ঐদিন হরতাল, শোভাযাত্রা এবং রাখী বন্ধন উৎসব পালিত হয়। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। তখন লণ্ডনে মন্ত্রীসভার রদবদল হয় এবং উদারনীতিকগণ সরকার গঠন করেন। মিঃ মর্লি ভারতের জন্য 'সেক্রেটারী অব্ স্টেট' নিযুক্ত হন। কংগ্রেস আশা করেছিল তিনি এ-ব্যবস্থা রহিত করবেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গকে মিঃ মর্লি 'সেটেলড্ ফ্যাক্ট' বলে ঘোষণা করায় আন্দোলন আবার তীব্র হয়ে ওঠে। বিলেতী পণ্য বর্জন ও বিলিতি কাপড়

১০. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ (কলিকাতা – ১৯৪৩), পৃঃ ৮১।
১১. O'Mally. Ibid. P. 468.
১২. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯০।

দমন রূপ নাশকতামূলক কার্য চলতে থাকে। 'স্বদেশী' পণ্যদ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই আন্দোলনকে স্বদেশী আন্দোলনও বলা হয়। আন্দোলন অব্যাহত থাকা অবস্থায় কংগ্রেস ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে "স্বরাজ" দাবী করেন।

নতুন ঘোষণা দ্বারা কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ নরম ও চরমপন্থীদের বিরোধ সাময়িকভাবে হ্রাস পায়। 'স্বরাজ'কে কেন্দ্র করে সারা দেশে আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমানরাও কংগ্রেসের পতাকা-তলে শরীক হয়। অন্যোন্যপায় ব্রিটিশ সরকার—"সনাতন ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক অল্প মুসলমান সমাজের কাঁধে ভর করেন। মুসলমানদিগকে বুঝান হইতে লাগিল, পূর্ব বঙ্গ ও আসাম একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইলে তথায় সংখ্যাগুরু হিসাবে তাহাদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।"[১৩] ঢাকার জমিদার নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ্ সহজেই কাঁধে পা দেন। শীঘ্রই ব্রিটিশ সরকারের সাথে কিছু সংখ্যক সামন্ত অভিজাত ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী মুসলিম নেতাদের আঁতাত গড়ে ওঠে। ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন।

অনুরূপ আবহাওয়াতেই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগে'র জন্ম হয়। কংগ্রেসের বিপরীত, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ধ্বজাধারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হয়— 'ব্রিটিশ-রাজের অধীনে দেশের নিয়মতান্ত্রিক উন্নতি (The orderly development of the country under the Imperial Crown.)[১৪] মুসলিম লীগ প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ধারা অনুসরণ করতে থাকে এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে বুর্জোয়া অভিজাত-সামন্ত স্বার্থ সংরক্ষক কংগ্রেসের মতই, বরং অধিকতর অনুদারতা ও পাল্টা সাম্প্রদায়িকতাসহ, বুর্জোয়া-অভিজাত-সামন্ত স্বার্থ সংরক্ষক সাম্রাজ্যবাদ-সহযোগী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কাজেই পূর্ব বঙ্গীয় মুসলিম জনতার স্বার্থে বঙ্গভঙ্গ করা আবশ্যক বলে পেশকৃত সরকারী যুক্তি ছিল বিভেদমূলক ও বিভ্রান্তিকর।

শীঘ্রই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নেতাদেরমধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতিলাল রায়ের এবং বিপিনচন্দ্র পালের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে।' 'তখন উত্তেজনাকে আশ্রয় করিয়া বাংলায় তরুণদের মধ্যে দলগড়ার প্রেরণা দেখা দেয়। ...'অনুশীলন সমিতি', 'ব্রতী সমিতি', 'আত্মোন্নতি সমিতি' প্রভৃতি নানাদল বাংলার চতুর্দিকে যুবক শক্তিকে জাগাইয়া তুলে। নেতাদের সহিত ইহার বড় সম্পর্ক ছিল না।"[১৫] মতিলাল রায়-এর এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য বলা যায় না। সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক ছিল না একথা পুরাপুরি সত্য নয়। বস্তুতঃ কংগ্রেসের চরমপন্থীরাই সন্ত্রাসবাদী সমিতি সমূহের, সর্বক্ষেত্রে না হউক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচালক ছিলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাঙলার সন্ত্রাসবাদীদের বোমার আঘাত ও পিস্তলের গর্জন শুরু হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের 'নিউজ পেপার অ্যাক্ট'' অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়। সন্ত্রাস-বাদী কার্যকলাপও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অন্যদিকে মুসলিম লীগ, জন্মক্ষণ থেকে উত্থাপিত মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ও বঙ্গভঙ্গ চিরস্থায়ী করার দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের করাচী অধিবেশনে,

---

১৩. [illegible]ল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭০।
১৪. O'Mally. Ibid, P. 561.
১৫. শ্রীমতিলাল রায়। স্বদেশী যুগের স্মৃতি (।–১৩৩৮), পৃঃ ১২০।

পরবর্তীকালে আলীগড় সম্মেলনে এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশন সমূহে—কংগ্রেসী কর্মনীতির সমালোচনা, বিরোধিতা, স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী ও বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে ভারত সরকারের ভূমিকা ঐকান্তিকভাবে সমর্থন করা হয়। অমৃতসরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দ্বিতীয় অধিবেশনের পর "লণ্ডনে লীগের শাখা প্রতিষ্ঠান বিলাতে তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড মর্লিকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। অভিনন্দন-পত্রে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী যথাযোগ্যভাবে প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের আরো বহু অভাব-অভিযোগের কথা লণ্ডন লীগ-শাখা বৃটিশ গভর্নমেন্টের দরবারে পেশ করেন।"[১৬] অচিরেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের তরফ থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচনের যৌক্তিকতা স্বীকার করা হয়।

ভারতে তখন মুসলিম লীগ পুরোপুরিভাবে সরকারী স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থ ভেবে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে কংগ্রেসবিরোধিতা, সরকারী কর্মনীতি সমর্থন এবং রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। মুসলমান-দের মানসিকতা সম্পর্কে স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরল "উন্‌রেস্ট ইণ্ডিয়া" (India Unrest) গ্রন্থে লেখেন :

It may be confidently asserted that never before have the Muhammadans of India as a whole identified their interests and their aspirations so closely at the present day with the consolidation and permanence of British Rule.[১৭]

কিন্তু ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের গোপন সমঝোতার ফলে লীগ-নেতৃবৃন্দের অগোচরে ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রহিত করার কথা ঘোষিত হয়।

১৯১২-তে আসামকে আলাদা করে দার্জিলিং জেলাসহ সমগ্র বাঙলা ভাষা-ভাষী অঞ্চল নিয়ে বাঙলা দেশ পুনর্গঠিত হয়। আর বিহার, ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যা সমবায়ে আলাদা প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। বাঙলার গভর্ণর নিযুক্ত হন লর্ড কারমাইকেল। মুসলিম লীগ এঘটনাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করে। তাঁদের রাজনৈতিক সংকটের পরিচয় দিতে গিয়ে ও'ম্যালি লিখেছেন :

It seemed that the Muhammadan support of Government throughout that agitation had gone for nothing, and the conservative section found it difficult to meet the argument that more was to be got from active agitation than from passive acquiescence.[১৮]

ফলে, মুসলিম লীগের নিকট সরকার সমর্থনের যৌক্তিকতা আর রইল না। কায়দে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস এ সময়ের বিশেষ ঘটনা। কিন্তু তা বিফল হয়। একদিকে দু'টি সম্প্রদায়ের বুর্জোয়া অভিজাত-সামন্তদের পারস্পরিক স্বার্থের লড়াই যখন এরূপভাবে অগ্রসর হচ্ছিল তখন অন্যদিকে প্রসার লাভ করছিল সন্ত্রাসবাদ ও মজুর আন্দোলন।

সন্তোষ বসুর নেতৃত্বে ১৯০৭ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের এক কারখানায় ধর্মঘট হয়। এ বছর বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলে যে ধর্মঘট আত্মপ্রকাশ করে তার সমর্থনে সহানুভূতিসূচক বিভিন্ন রেল লাইনে ধর্মঘট দেখা দেয়।[১৯] রাজনীতির সঙ্গে ধর্মঘটসমূহের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। তাঁর প্রমাণ—

১৬. আবুল কালাম শামসুদ্দীন। পলাশী থেকে পাকিস্তান (ঢাকা – ১৯৬৮), পৃঃ ১২৩।
১৭. O' Mally. Ibid- P. 561,
১৮. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬৩।
১৯. মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিলকের ছ' বছর কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের ছয় দিন ব্যাপী ধর্মঘট।

বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এখন মজুর আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে। জার্মানি ও রাশিয়ার শ্রমিক সংগঠন বৈপ্লবিক সংস্থায় পরিণত হয়। ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ভি, আই, লেনিন ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে থেকে স্বদেশ ও বিদেশের শ্রমিক আন্দোলনকে মার্কসীয় প্রণালীতে সুসংবদ্ধ করে গড়ে তোলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে, ভারতীয় মজুর শ্রেণী ও বিশ্বশ্রমিক আন্দোলনের বৈপ্লবিক চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের "কামগার হিতবর্ধক সভা" নামক মজুর সংঘ শ্রমিকদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়।[২০] কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পূর্ব পর্যন্ত এদেশের মজুর শ্রেণী যথেষ্ট আত্মসচেতন হয়ে ওঠেনি। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের চক্রান্তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হ'লে, বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন বিশেষ-ভাবে গতিশীল হয়ে ওঠে। যুদ্ধ সমাপ্তির অব্যবহিত পরে এদেশের মজুরদের মধ্যেও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য সংগঠন তৈরীর প্রেরণা প্রবল হয়।

পরবর্তী অবস্থা

পুঁজিবাদী শাসকরা ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবী ব্যাপী প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধায়। যুদ্ধের জন্য পণ্য, অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় বুর্জোয়া শিল্পপতি ও সামন্ত শাসক-বর্গের নিকট সহযোগিতার আবেদন জানায়। ব্রিটিশ ভারতীয়দের নিকট থেকে বিপুল সাড়া পায়। উপনিবেশ-ভারত সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশকে অর্থ, সৈন্য এবং শিল্পদ্রব্য যোগান দেয়।[২১] যুদ্ধ শুরু হবার এক বছরের মধ্যে ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন নতুন শক্তি সঞ্চয় করে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। এ-অধিবেশনে স্যার এস, পি, সিংহ ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব কি তা প্রকাশ করার দাবী জানান।[২২] মিসেস অ্যানি বেসান্ত পরবর্তী বছর 'ভারত ভারতবাসীদের' এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে 'হোমরুল লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। 'স্বরাজ' তখন আর একটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র ছিল না। ফলে, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে আর একটা সান্ত্বনা বাণী উচ্চারণ করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। লর্ড চেমস্ ফোর্ড তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে ভারতকে স্বায়ত্ত শাসন দানের প্রতিশ্রুতি দেন। যুদ্ধকালে ভারতীয় মুসলমানদের সহানুভূতি পুনরায় লাভের জন্যও সরকারকে তুরস্কের ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হয়। কারণ বলকান যুদ্ধের পর মিত্রশক্তির দুরভিসন্ধি স্পষ্ট হয়ে ওঠায় তুরস্ক সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। সরকার এ-অবস্থায় তাঁদেরকেও এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন যে, যুদ্ধের সময় তারা ব্রিটিশ রাজকে সাহায্য করলে তুর্কী খিলাফতের উচ্ছেদ সাধন করা হবে না ; তুরস্ক দখল করা হবে না। আশ্বাসে পরিতুষ্ট মুসলিম লীগ পুনরায় সরকার সমর্থক নীতি গ্রহণ করে এবং যুদ্ধকালে কংগ্রেসের ন্যায় লীগ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সর্বপ্রকারে সহায়তা দানে অগ্রসর হয়।

২০. মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩।
২১. Keith, Ibid. P. 240.
২২. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪২।

কিন্তু চেমস্‌ফোর্ড যা-ই প্রতিশ্রুতি দিননা কেন—দৃশ্যত ভারত সরকার তখন—মিউনিসিপাল কাউন্সিলে, জেলা বোর্ডে দেশীয় প্রতিনিধিদের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রশাসন বিভাগে সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আইন পরিষদেও তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ভোটের যোগ্যতা শিথিল করা অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হতে চাননি এবং হননি।[২৩]

বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর অর্থাৎ 'কলার পরিবর্তে মূলো'—খবারের পরিবর্তে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এ উপহার প্রত্যাখ্যান করে। অ্যানি বেসান্ত একে 'চিরস্থায়ী দাসত্ব' নামে অভিহিত করে বলেন যে, একমাত্র বিপ্লবের দ্বারাই এ-অবস্থার অবসান ঘটানো যায়।[২৪] ১৯১৭-তে কংগ্রেস ১৫ বছরের মধ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল স্বরাজ লাভের কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯১৯-এর রাউলাট অ্যাক্ট এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে আরো উত্তেজিত করে তোলে। পাঞ্জাব এ-আইনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ফলে শীঘ্রই সেখানে সামরিক আইন জারী হয়। হান্টার-কমিটি পাঞ্জাবের বিক্ষোভকে প্রকাশ্য বিদ্রোহ বলে ঘোষণা করে। খিলাফত প্রশ্নে মুসলমানরাও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন এসময় শুরু হয়। এপ্রিল মাসে কলকাতায় হরতালকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। সেনাবাহিনীর সাহায্যে সরকার পরিস্থিতি আয়ত্বে আনেন। তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশের শত্রুতামূলক মনোভাব প্রকাশ পেতে থাকে। মোস্তফা কামাল পাশার অভ্যুদয়কে ব্রিটিশ সরকার দমনের প্রয়াস পায়। লয়েড জর্জ কর্তৃক খোলাখুলি তুরস্ক গ্রাস করার কথা ফাঁস হয়ে পড়ায় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সত্যাগ্রহের পাশাপাশি মুসলমানগণ খিলাফত আন্দোলনও শুরু করেন। এমনিভাবে যুদ্ধকালে সরকারের প্রদত্ত সকল প্রতিশ্রুতি পালিত হওয়ার পরিবর্তে দেশবাসী লাভ করে একটি দাসত্বমূলক শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, সামরিক আইন ও নিপীড়ন—তথা বিশ্বাসঘাতকতা এবং তৎসহ যুদ্ধের সকল রকম কুফল ও বোঝা। এসময়কার অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে নেহেরু লিখেছেন :

A better sense of humiliation and a passionate anger filled our people. All the unending talk of Constitutional reform and Indionization of the services .was a mockery and an insult when the manhood of our country was being crushed and the inexorable and continuous process of exploitation was deepening our poverty and supping our vitality.[২৫]

এমনি অবস্থায় কংগ্রেসের পরবর্তী কার্যক্রম; অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি-তৈরী হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এদেশের শ্রমিক আন্দোলনেরও অগ্রগতি ঘটে। শ্রমিকদের রাজনীতি ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করে। যুদ্ধোত্তরকালে শ্রমিক জনতার আন্তর্জাতিক সংহতির ভিত্তি দৃঢ় হয়। সোভিয়েত জন-প্রজাতন্ত্র উদ্ভূত হয়। রাশিয়ার বলশেভিক সরকারের প্রতিষ্ঠায় সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক যোগ্যতা সপ্রমাণিত হওয়ায় তার ঢেউ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষও তা' থেকে বাদ যায়নি। তখনও এদেশের শ্রমিকদের কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। শিল্প-

২৩. Keith. Ibid P, 242.

২৪. See. O'Mally, Ibid. P. 576,

২৫. Jawaharlal Nehru. The Discovery of India (India, Reprinted—1964). P. 378.

কারখানার তাঁদের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয় দুর্দশাগ্রস্ত। লক্ষ লক্ষ অদক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় বাড়েনি। এ-অবস্থায় কোন ধর্মঘট সফল হতে পারে না।[২৬] তথাপি ১৯১৯-এর প্রথম দিকে বোম্বাইয়ের ধর্মঘটে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার শ্রমিক যোগদান করে। ১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই, মাদ্রাজ, আহ্‌মেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে শ্রমিক জাগরণ দেখা দেয়। কানপুর পশমকলে, জামালপুর রেল-কারখানার কলকাতা পাটকলে, শোলাপুর কাপড়ের কলে, জামশেদপুর টাটা কারখানার শ্রমিক ধর্মঘট বন্যার মত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ছ'মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক ২০০টি ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে। ১৯১৯-এ কুখ্যাত রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা বার বার হরতাল ও শোভাযাত্রা পালন করে।[২৭] ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই শহরে "নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-এর" প্রতিষ্ঠা হয়। শিল্পকারখানার শ্রমিকদের এইটিই প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

পুঁজিবাদী ব্রিটিশ শাসকদের নিকট তৎকালীন ভারতের এ-সব ধর্মঘট তখনো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। শ্রমিকদের উপর গুলি চালনা, তাদের গ্রেফতার, কারাগারে নিক্ষেপ প্রভৃতি রকম নির্যাতনে তারা অবশ্য কখনো অনীহা প্রকাশ করেনি। তবে, 'কমিউনিজমের সংক্রমণ থেকে ইউরোপের খাস্য রক্ষাতেই ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা সর্বাধিক উদ্বেগ অনুভব করছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লয়েড্ জর্জ, উড্রো উইলসন, হার্বার্ট হুভার প্রভৃতির লেখায় ও বক্তৃতায় "ইউরোপ বলশেভিক হয়ে যাচ্ছে"—এই আশংকা প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯২৩ অবধি ইউরোপে সমাজ বিপ্লবের ব্যাপক আশংকা অব্যাহত থাকে। ইতোমধ্যে ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের 'গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত' তুরস্কে মোস্তফা কামাল পাশার অভ্যুদয় হয়। মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে বিদ্রোহভাব দেখা দেয়। আয়ার্ল্যাণ্ডেও বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। ভারতেও রাজনৈতিক আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়।

মওলানা আবুল কালাম আজাদ-এর প্রস্তাবিত অসহযোগ-নীতি এবং তার অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ-নীতি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের খিলাফত সম্মেলনে প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়। অতঃপর মওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল খিলাফত সম্পর্কে আলোচনার জন্য ইউরোপে গমন করেন। কিন্তু তাঁদের ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়।[২৮] সেপ্টেম্বরে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বিরোধিতার মধ্য দিয়েও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। গান্ধীজী ঘোষণা করেন—'অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে এক বছরের মধ্যেই 'স্বরাজ' অর্জিত হবে।'[২৯] কিন্তু স্বরাজের কোন ব্যাখ্যা তিনি দেননি। এবছর আইন পরিষদের নির্বাচন—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রত্যাখ্যান করে। আইনজীবীগণ আদালত ও ছাত্রেরা ইউরোপীয় শিক্ষা বর্জনের জন্য স্কুল,

২৬. See. Nehru. Ibid. P. 374.

২৭. মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪-৮৫।

২৮. ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৭-'০৮।

২৯. O' Malley. Ibid, P. 584.

করেন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী খেতাবধারীরা খেতাব বর্জন করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে ৬০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে প্রায় ছ'ভাগ অংশগ্রহণ করে।[৩১] খুব কম সংখ্যক আইনজীবী আদালত বর্জন করেন। খেতাব ত্যাগ করেন মাত্র একজন। আর কয়েকজন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ অফিসার চাকুরীতে ইস্তফা দেন। কলকাতায় 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন' নামে একটি দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানে দেশীয় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মহাত্মা গান্ধী মাদক দ্রব্য বর্জন, খদ্দর প্রচলন ও চর্কা ব্যবহারের আবেদন জানান। অক্টোবর মাসে তিনি সামরিক ও বেসামরিক উভয় প্রকার ভারতীয় জনসাধারণকে এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। ৩১শে ডিসেম্বর তিনি সরকারী ক্ষমতা এবং সরকার ও তার আইনের অবসান ঘটানোর জন্য বেসামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা পেশ করেন।[৩২] বর্দৌলিতে কর বন্ধেরও সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয়নি। মহাত্মা গান্ধী অহিংস উপায়ে স্বরাজলাভের জন্য জনসাধারণকে বার বার অবহিত করলেও আন্দোলন শীঘ্রই সহিংস পথে পা বাড়ায়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদল যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা থানা আক্রমণ ক'রে ২০ জন কনেস্টবলসহ দারোগাকে পুড়িয়ে মারে।[৩৩] ঘটনায় আতংকিত হয়ে মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। এ সময় একটি রাজদ্রোহমূলক রচনা প্রকাশের অজুহাতে তাঁহাকে ৬ বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। তাছাড়া…

Proceedings taken against local leaders guilty of lawlessness, and the break-up of organizations pursuing methods of intimidation and violence.

তখন অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সমগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে বিপর্যয় নেমে আসে। নামমাত্র খিলাফত আন্দোলন তখনও চলতে থাকে। কিন্তু মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সদ্ভাব না থাকায় ঐক্যের অভাবে তাঁদের কোন কর্মসূচী ও প্রস্তাব —অসহযোগ আন্দোলনের স্থান অধিকার করতে পারেনি। ফলে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় ও খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ায় দেশব্যাপী রাজনৈতিক শূন্যতা, হতাশা ও নৈরাশ্য দেখা দেয়।

শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ছ'মাসে শিল্পকারখানায় মোট ১০৬টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ১ লক্ষ ৭০ হাজার শ্রমিক অংশ গ্রহণ করে।[৩৪] পরবর্তী বছর আসামের চা-বাগানের শ্রমিকগণ দীর্ঘ আড়াই মাস ব্যাপী ধর্মঘট চালায়। ধর্মঘটি শ্রমিকদের উপর দারুণ নির্যাতন চলে। মালিক পক্ষগুলি চালায়। তবু ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। তাদের সমর্থনে আসাম-বেঙ্গল রেল

৩০. Keith, Ibid, P. 227.

৩১. O'Malley, P. 585.

৩২. See, O'Malley. Ibid P. 603.

৩৩. [illegible], পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১১। এবং Keith, Ibid. P. 283.

৩৪. O'Malley, Ibid, P. 612.

৩৫. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৮৪।

শ্রমিকরাও সহানুভূতি-সূচক ধর্মঘট পালন করে। এবছর শুধু মাত্র বাঙলা দেশে ১৪২টি ধর্মঘট কার্যে পরিণত হয়। ২ লক্ষ ১২ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদান করে। ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। ১৯২১-এ অরিয়ার অধিবেশনে তার প্রথম রাজনৈতিক রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। ইউনিয়নিস্টরা স্বরাজের দাবীতে প্রস্তাব পাশ করেন।[৩৬]

এসময় কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের নেতৃত্বে নিখিল ভারত কমিউনিস্ট পার্টিও গঠিত হয়। ১৯২২-এ রেল এবং কারখানার শ্রমিকরা দেড়মাস ব্যাপী ধর্মঘট চালায়। ঈস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কর্মচারীদের ধর্মঘট অর্থাভাবে ভেঙে পড়ে। বহু শ্রমিক কর্মী দালালদের বিশ্বাসঘাতকতায় নির্যাতীত হন। তথাপি ধর্মঘটে সরকারের দেড় কোটি টাকারও অধিক লোকসান হয়। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের অধিবেশন এ-বছর কলকাতায় বসে। তাঁরা বিলিতি দ্রব্য বর্জন, চর্কা প্রচলন ও গান্ধীবাদের প্রতি আনুগত্য জানায়। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ভারতীয় বিভাগের কর্মকর্তাদের নির্দেশে কংগ্রেস ও খিলাফত আন্দোলনের সমর্থনে সামন্ত বুর্জোয়া নেতৃত্বের পতাকাতলে কাজ করতে থাকেন।[৩৭] ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের বিপর্যয় তাই বিপুলভাবে রাজনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটায়। আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে বুর্জোয়া-অভিজাত সামন্ত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং শ্রমিক কৃষক জনসাধারণ তথা সকল শ্রেণীর-ই মানুষ সেকালে যেন চোখ ধাঁধানো আলোর বন্যা থেকে হঠাৎ অমাবস্যার ঘোরান্ধকারে ডুবে যায়। সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে আলো, আশা, উদ্দীপনা, কর্মপ্রেরণা, চাঞ্চল্য প্রায় একেবারে লুপ্ত হয়।

দেশকাল ও সমাজের এই প্রেক্ষাপটেই তরুণ কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের সম্পাদনায় বিপ্লবী বাঙলার মুখপত্র রূপে "ধূমকেতু"র প্রকাশ। 'ধূমকেতু'র বুকে একালের প্রায় সকল লক্ষণ স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত। কিন্তু 'ধূমকেতু' হতাশাকে লালন করেনি। সকল নিরাশা, নিষ্ক্রিয়তা ও বিমূঢ়তা কাটিয়ে বাঙালী জনতার মনে আবার আত্মবিশ্বাস সঞ্চারণের ব্রত নিয়ে 'ধূমকেতু'র উদয় হল। তখন শাসকের সঙ্গে শাসিতের বিরোধই শুধু দেখা দেয়নি; শাসকশ্রেণীর বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী মৈত্রী সংঘের মধ্যে অন্তর্বিরোধ, পুঁজিবাদের সঙ্গে সাম্যবাদের বিরোধ; স্বাধীনতার দাবীতে জনতার সঙ্গে সুবিধেবাদীদের বিরোধও তীব্র হয়ে ওঠে। এ সময় বাঙালা দেশের বিস্‌ধ্বস্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আবর্ত রচনা করে "পূর্ণ স্বাধীনতা" লাভের রাজনৈতিক দাবী-ই 'ধূমকেতু'র কাল পরিচয়ের তারকা চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী ও সমকালীন অপর কোন পত্রিকা এ-কৃতিত্বের অধিকারী নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ-বলিষ্ঠ ও সোচ্চার কণ্ঠের জন্যই 'ধূমকেতু' আজও তুলনায় দ্বিতীয় রহিত।

৩৬. O'Malley. Ibid P, 608.

৩৭. পূরণচন্দ্র জোশী। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট (ভব প্রেস, কলিকাতা, ১৯৪৪), পৃঃ ৮।

স্মৃতি-সত্তার আলোকে টি· এস· এলিয়ট

সিদ্দিকুর রহমান

এলিয়ট-এর কবি-মানস ও তাঁর শিল্পবোধ আলোচনা করার আগে একটি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া দরকার যে তিনি কোনো প্রকার অস্পষ্ট জীবনবোধ কিংবা খামখেয়ালী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাব্য রচনা করেননি। জগৎ ও জীবন তথা তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি সজাগ। স্বীকার্য, তিনি কাব্য রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে Contrapuntal method-এর আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ'ও বলা দরকার উক্ত মেথড-এর যথাযথ ব্যবহার কেবলমাত্র অসাধারণ কবিদের দ্বারাই সম্ভবপর।

তাছাড়া আরেকটি দিক্‌ও রয়েছে যা যে কোনো কবির জন্যে আদর্শ হওয়া উচিত। কবিতা রচনার জন্যে প্রচুর পড়াশোনা থাকা দরকার। এলিয়টের সৃষ্ট জগৎকে বুঝতে হলে বিশ্বের সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের সাথে মোটামুটি পরিচয় থাকা প্রয়োজন। কবিতা তাঁর কাছে মুহূর্তের উচ্ছ্বাস-কেন্দ্রীক নয়। এর সাথে রয়েছে মানবিক সত্তার জাগ্রত প্রয়াস যা কিনা বিশেষ মুহূর্তের উচ্চারণেই সীমিত নয়। মানুষের ইতিহাস সভ্যতা ঐতিহ্য কবিতার শব্দাবলী গায়ে মেখে অপূর্ব সৌন্দর্য চয়নে নির্ধারিত। আর এখানেই এলিয়টের সৃষ্টি-নৈপুণ্য।

শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০)-এর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ The World as Will and Idea প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। এ গ্রন্থে বিধৃত তাঁর চিন্তাধারা দর্শনের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। তিনি বলেছেন, সব কিছুর প্রাথমিক স্তরে যা নিঃশব্দে কাজ করে যায় তা হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি। তিনি বোঝাতে চান, ইচ্ছাশক্তির সাথে জড়িত রয়েছে মানুষের সপ্রাণ মূলসূত্র। এবং ওই Will হচ্ছে মূলতঃ বস্তু প্রকৃতির।

শোপেনহাওয়ার মানুষের সহজাত দুর্বলতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এ দুর্বলতা থেকে মুক্ত হওয়া মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

ডক্টর স্যামুয়েল জনসন সম্ভবতঃ ওই বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করে বসওয়েলকে বলেছিলেন, কোনো কিছুই অতোটা তুচ্ছ নয় যতোটা তুচ্ছ হচ্ছে মানুষ নামের জীব— Nothing is insignificant to so insignificant a creature as man.

এলিয়টের চিন্তাধারা প্রায় কাছাকাছি হলেও একটু ভিন্ন ধরনের। তিনি তাঁর Essays Ancient and Modern গ্রন্থে লিখেছেন We must apply the whole history of our civilization upon our particular emergencies.

মানুষকে তিনি খাটো করে দেখেননি। অশুভ শক্তির সাথে মানুষের সংঘাত চিরন্তন। আর ওই অশুভ অসুস্থ অকল্যাণকর প্রতিক্রিয়া তার মানসিকতার বিপর্যয়ের সূচনা করেছে সত্যি কিন্তু তিনি কখনো বিভ্রান্ত হয়ে পড়েননি।

এলিয়ট বলছেন :

> The knowledge imposes pattern and falsifies,
> For the pattern is new in every moment
> And every moment is a new and shocking
> Valuation of all we have been.
>
> ["East Coker," II]

এলিয়টের কাব্য সৃষ্টির সাথে অস্তিত্ববাদের প্রশ্ন বিজড়িত। তবে তা কতোখানি, এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেয়া যাক।

জে, এম, স্পাইয়ার অস্তিত্ববাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করার প্রয়াসে বলছেন, Existentialism is a philosophy of crisis—Christianity and Existentialism. স্পাইয়ার সংকটের দর্শন প্রত্যক্ষ করছেন অস্তিত্ববাদে। আর এ দর্শনটা কি তার প্রতি ইঙ্গিত দিতে গিয়ে বলছেন খৃষ্টধর্ম ও অস্তিত্ববাদের কথা। উভয়ের মধ্যে বিরাজমান মধ্যে অস্তিত্ববাদের মূল উপাদান রয়েছে বলে তিনি মনে করছেন। তবু সংকট কেনো এবং কোথায় তার সুস্পষ্ট জবাব উল্লিখিত বক্তব্যে অনুপস্থিত।

'সংকটের দর্শন' কথাটা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন রাল্ফ্ হারপার তাঁর Existentialism, a Theory of Man গ্রন্থে। হারপার বলছেন :

Man is on the operating table, naked, ashamed, worried; he faces pathologists rather than surgeons ......Man's nobility as well as his misery is on display.

মানুষ অস্ত্রোপচারের টেবিলে শায়িত। উলঙ্গ লজ্জিত অসহায়। প্রয়োজন হলো Surgeon-দের অথচ তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে pathologists। ফলে একদিকে যেমন মানুষের মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটছে, তেমনি আরেক দিকে তার দুঃখ যন্ত্রনারও প্রদর্শনী হচ্ছে।

যদিও 'অপারেটিং টেবিল'-এর সাথে 'লাশকাটা ঘরে'র তেমন কোনো একটা মিল নেই, তবু জীবনানন্দ দাশ-এর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা যায় :

> শোনো
> তবু এ-মৃতের গল্প ;—কোনো
> নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
> বিবাহিত জীবনের সাধ
> কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,
> সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
> মধু—আর মননের মধু
> দিয়েছে জানিতে ;
> হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
> এ-জীবন কোনো দিন কেঁপে ওঠে নাই,
> তাই
> লাশকাটা ঘরে
> চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে,
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই,
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

[মহাপৃথিবী]

না, অস্তিত্ববাদের কথা বলছিনে। উদ্ধৃত অংশে জীবনানন্দ দাশের মহৎ কাব্য প্রতিভারই ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু 'লাশকাটা ঘরে' জীবনের অনিবার্য পরিণতি কিংবা এর ধর্মাশ্রিত বিষয় ভাবনার মধ্যে অস্তিত্ববাদ নেই। অস্ত্রোপচারের টেবিলে মুমূর্ষু রোগীর ক্লান্তিপূর্ণ চিকিৎসার চিত্র তুলে ধরার মধ্যে ধর্মের প্রতি যে উদ্দেশ্যময় ইঙ্গিত রয়েছে কেবলমাত্র এর মাধ্যমেই অস্তিত্ববাদের মূল সূত্র সম্পর্কে আঁচ করা যায়।
এলিয়টের কবিতায় অসুস্থতা, ব্যাধি মৃত্যুর চিত্রকল্প পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। আর এই চিত্রকল্প অস্তিত্ববাদী ধারণা থেকে উৎসারিত। কেননা ব্যাধি মৃত্যু জীবনের চরম অসফলতারই নামান্তর। Four Quartets কবিতায় ব্যাহত হৃদয়ে এলিয়ট উচ্চারণ করছেন:

Our only health is disease
If we obey the dying nurse
Whose constant care is not to please
But to remind of our, and adam's cur
And that to be restored, our sickness must
grow worse......

এলিয়টের বাক্যচেতনায় অস্তিত্ববাদের লক্ষণ রয়েছে। তবু বলা যায় অস্তিত্ববাদ তেমন কোনো প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, The absense of logical consistency in existency in existential thought is a common charge levelled against it, and that perhaps rightly. সম্ভবতঃ এ ধরনের ধারণা এলিয়ট নিজেই পোষণ করতেন। তাছাড়া এলিয়টের জগৎ ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। জীবনের প্রতি তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গী তা হচ্ছে মূলতঃ ধর্মভিত্তিক। পার্থিব দুঃখ যাতনার যোগ-বিয়োগ নিয়েই

তিনি জীবনকে বিচার করতে চাননি। নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না-হলেও, পরিচিত জগতের বাইরে এবং যা সময়ের সীমারেখায় নির্দিষ্ট নয় এমন কোনো মূল্যবোধের প্রতি আস্থা রাখাও অসম্ভব ব্যাপার নয়। বিষয়টার ব্যাখ্যা তিনি করছেন এভাবে :

The real issue of our time is not between those who believe in recourse to war and those who do not : the frontiers are vague. The real issue is between...... those who believe only the values realizable in time and on earth, and those who belive also in values realized out of time.

['The Criterion,' P. 68]

আর এই যে ধর্মীয় অনুভূতি, তা কি প্রচলিত অর্থে এলিয়ট-এর ধ্যান ধারণাকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়েছিলো ? সোজা জবাব হচ্ছে ; না। ধর্মকে তিনি একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করতেন। এ প্রসঙ্গে এ. জি. জর্জ বলছেন :

The religious man need not necessarily be a Christian (or a follower of any particular variety of religion). Even an atheist who in all earnestness and sincerety repudiates all belief in God is religious, according to Eliot. The essential point is that one should seriously consider the spiritual problems.

[T.S. Eliot : His Mind and Art]

ধর্মের ব্যাপারে তাঁর উদার মনোভঙ্গী প্রশংসনীয়। ধর্মীয় কোন্দলে যেতে তিনি নারাজ। আসল কথা হচ্ছে আন্তরিকতা। কেউ যদি হৃদয় দিয়ে স্রষ্টার মাহাত্ম অনুভব করতে ব্যর্থ হন অথচ তার কথা ও কাজে কোনো প্রকার ভণিতা নেই, তাহলে তিনিও ধার্মিক ব্যক্তি। এলিয়ট তাই বিশ্বাস করতেন।
অবশ্য অস্তিত্ববাদের সারবত্তা যে এলিয়ট অস্বীকার করেছেন, এমন নয়। অস্তিত্ববাদের উৎপত্তি সম্পর্কে ফিলিপ মেইসেটের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

Existentialism is a reaction of the philosphy of man against the excesses of the philosophy of ideas and the philosophy of things."

[Philip Maiset : Existentielism and Humanism]

অস্তিত্ববাদ হচ্ছে মানুষের জীবন-দর্শনের এক প্রকার বিদ্রোহ। এবং ওই বিদ্রোহটা হচ্ছে দর্শনের অনাবশ্যক ছড়াছড়ির বিরুদ্ধে।
এদিক থেকে এলিয়ট-কাব্য-জগতের সাথে অস্তিত্ববাদের যোগাযোগ অনস্বীকার্য। যে-কোনো জীবন-ধর্মী লেখকের লেখার অস্তিত্ববাদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। কেননা জীবনের মৌল সমস্যা এবং নিয়তির অনিবার্য গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সজাগ লেখক কিংবা শিল্পী ইচ্ছে করলেও অস্তিত্ববাদের প্রশ্ন থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন না।
মানুষ কি ?

এলিয়ট এবং হিউম উভয়েই বিশ্বাস করেন :

Man is essentially limited and imperefct endowed with Original Sin, a wretched creature who can yet apprehend perfection, though he can never reach it.

আদি-পাপ থেকে মুক্তির পথ নেই। Wretched creature এবং মিল্টনে-র Innocent frail প্রায় সমধর্মী। অসহায় মানুষ তবু আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মুখর। অথচ তার এ প্রচেষ্টা কখনো সফল হবার নয়। কিন্তু কেনো এমন হয়? এর জবাব আংশিকভাবে পাওয়া যায় Animula কবিতায় :

> The heavy burden of the growing soul
> Perplexes and offends more, day by day ;
> Week by week, offends and perplexes more
> With the imperatives of 'is and seems'
> And may and may not, desire and control.

প্রত্যেক শিল্পীরই জীবন সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য কিংবা জীবন দর্শন থাকা চাই। শিল্পীর বৈশিষ্ট্যও এখানে। এলিয়ট বলছেন : Life is an act of faith। বিশ্বাস—জীবনে বিশ্বাস, মূল্যবোধে বিশ্বাস, নিজের প্রতি বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস—মহৎ শিল্প রচনায় শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করে। শিল্পী যদি নিজেই কোনো কিছুতে বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হোন, অপরকেও তিনি বিশ্বাসের কথা বলতে পারেন না। এর ফলে শিল্পীর অপরকে দেবার মতোন কিছুই থাকে না।
তাই, এলিয়টের কাছে জীবন হচ্ছে বিশ্বাসের প্রক্রিয়া।
এলিয়টের ওই মানসিকতায় কিয়ের্কেগার্ডের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিয়ের্কেগার্ড বলছেন, :

> সে (মানুষ) অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণই থেকে যায়। পাপ-প্রবণতা তার মধ্যে বিদ্যমান। ভালো করার ক্ষমতাও সীমিত। তার সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হলো আত্মিক মুক্তির সন্ধান।
> সব ব্যাপারেই দৃশ্যমান জগতের ওপরে অলৌকিক ঘটনার প্রাথমিক ক্ষমতা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।
> মানুষ হচ্ছে অসীম ও সসীম ক্ষণকাল ও অনন্তকাল, মুক্তি ও আবশ্যকতার সংশ্লেষ—সংক্ষেপে বলতে গেলে সে হচ্ছে একটা সংশ্লেষ।

শোপেনহাওয়ার মনে করেন :

Pain is the fundamental and positive condition of existence and evil is inseparable from human nature. [World as Will and Idea]

বেদনা মনুষ্যজন্মের পূর্ব-শর্ত। মানব প্রকৃতির সাথে অশুভ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অথচ এর কোনো সীমারেখা নেই। আদিও নেই। অন্তও নেই।
বের্গসঁ-এর মতে 'ভবিষ্যৎ, অতীত, বর্তমান বলে কিছুই নেই।'
তাহলে সময়কে নির্দিষ্ট করা যাবে কিভাবে? এর জবাবে তিনি বলছেন :
Duration knows no such distinction. The past exists in the present which contains

the future. The concrete and ever present instance of duration is life, for each of us living individuals is his own time.

এলিয়ট Bumt Norton কাব্যে ওই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করেছেন :

Time present and time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable.
What might have been is an abstraction
Remaining a perpetual possibility
Only in a world of speculation.
What might have been and what has been
Point to one end, which is always present.

The Dry Salvages-এর এলিয়ট আরো গভীরে প্রবেশ করেছেন। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত অনন্ত-বর্তমানের স্রোতে বাঁধা পড়লেও, মুহূর্তের ঝলক মাঝে মাঝে আরো কিছু রহস্য, আরো কিছু অব্যক্ত বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে :

It seems as one becomes older
That the past has another pattern, ceases to be a mere sequence
The moments of happiness—not the sense of well-being
Fruition, fulfilment, security or affection
Or even a very good dinner, but the sudden illumination—
We had the experience, but missed the meaning,
In a different form, beyond any meaning
We can assign to happiness.

ম্যাকবেথের অবিস্মরণীয় স্বগোক্তি.. ...Tomorrow and to-morrow and to-morrow স্মরণে রেখে এলিয়ট বলছেন :

There is no end, but addition : the trailing
Consequence of further days and hours......

'ওই পটভূমিতেই উচ্চারিত হলো Moments of happiness........ the sudden illumination. আর এর মাধ্যমেই জীবনের অর্থহীনতার নিগড় থেকে মুক্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করা যায়।
এলিয়ট বের্গসঁর মতবাদ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর সাযুজ্যে স্পষ্টতর করে তুলেছেন :

I have said before
That the past experience revived in the meaning
Is not the experience of one life only
But of many generations...

কিন্তু বের্গসঁ সময় ব্যাপারটাকে metaphysics-এর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে চেয়েছেন। এলিয়ট তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন :

'your shall not think' the past is finished'
Or 'the future is before us'.

তাহলে এলিয়ট কি বোঝাতে চান?
তিনি বোঝাতে চান :

time past and time future
always point to one end, which
is always present.

অতএব এলিয়টের জীবন দর্শনের মৌল উপাদান হচ্ছে ধর্মভিত্তিক অস্তিত্ববাদ। মানব প্রকৃতি, পাপ এবং আদি-পাপ সম্পর্কে তাঁর যে মতবাদের সাথে মিল রয়েছে। সেন্ট অগাস্টাইন, পাসকাল এবং কিয়েরকেগার্ডের মতবাদের।
নির্দিষ্ট সময় ও অনাদিকাল সম্পর্কে অগাস্টাইন—কিয়েরকেগার্ডের তত্ত্ব এলিয়টের কাব্যে অনুরণিত।
এলিয়টের কাব্যিক আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা কঠিন ব্যাপার। তিনি কবি। সমালোচকও তিনি। এবং দু'টি ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। এলিয়টের কাব্য বুঝতে হলে সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর নির্ধারিত বক্তব্য ও চিহ্নিত তত্ত্ব বোঝা দরকার। একটি বাদ দিয়ে অপরটি বুঝতে চাইলে সম্পূর্ণ এলিয়টকে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না।
কাব্য তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ধারণা হলো : emotion recollected in tranquility'। এলিয়ট তা মেনে নিতে রাজী নন। তিনি মনে করেন ক্ষণিকের মুহূর্তে উচ্ছ্বাসের অভিজ্ঞান কাব্য নয়। আর এ কথা বলতে গিয়ে তিনি সরাসরিভাবে ওয়ার্ডসওয়ার্থকে বক্রোক্তি করে বলছেন : Poetry is neither emotion nor recollection, nor without distortion of meaning, tranquility.
কেবলমাত্র বিদ্রূপ মন্তব্য করা হলেই কিংবা অপরের মতবাদকে খণ্ডন করলেই সাহিত্য ক্ষেত্রে কারো মূল্য দেয়া হয় না। যুক্তিনির্ভর মন্তব্য, এমনকি তা খুব জনপ্রিয় না হলেও, সাহিত্যিক মূল্য বহন করে। এলিয়ট তাই অত্যন্ত সংযত উপায়ে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলছেন : Poetry is not a turning loose of emotion but an escape from emotion, it is not an expression of personality but an escape from personality.

[Selected Essays]

এলিয়ট, কাব্যতত্ত্ব বলি কিংবা সমালোচনা তত্ত্ব বলি, উভয়ক্ষেত্রেই নিজস্ব ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অনন্য ছাপ রেখেছেন। সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর দিক্-নির্দেশ হলো, কবিতা হচ্ছে মূল লক্ষ্যবস্তু—কবি নন। বিষয়টা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

There are many people who appreciate the expression of sincere emotion in verse·····But very few people know when there is an expression of significant

emotion, emotion which has its life in the poem, and not in the history of the poet. The emotion of art is impersonal,

[Selected Essays, Page ; 22]

এলিয়ট শুধু ঐসব কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি যে কোনো কালের কবিদের জন্যে তাঁর ভাবনার সোনার ফসল তাদের জীবন-জিজ্ঞাসার সূত্র হিসেবে উচ্চারণ করেছেন :

It is an advantage to mankind in general to live in a beautiful world; that no one can doubt. But for the poet is it so important ? We mean all sorts of things... ...by beauty. But the essential advantage for a poet is not to have a beautiful world with which to deal : it is to be able to see beneath both beauty and ugliness, to see the boredom, the horror and the glory.

[The Use of Poetry and the Use of Criticism, Page : 106]

সাধারণ মানুষ সুন্দর পৃথিবীতে বাস করতে চায়।
কিন্তু কবির জন্যে কি তা অত্যাবশ্যক? কবি সুন্দরের উপাসনা করেন। সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন। এলিয়ট এর কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না।
তিনি এপ্রসঙ্গে যে বক্তব্য রেখেছেন তা সত্যিই অপূর্ব।
সুন্দর ও কুৎসিতের আড়ালে কী আছে তা দেখার জন্যে কবিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করতে হবে। দেখতে হবে অবসাদ, আতংক গৌরব কীভাবে প্রবহমান রয়েছে সুন্দর আর কুৎসিতের গভীরে।
কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণার উৎস সম্পর্কে এলিয়টের তত্ত্ব হলো : মানুষের পরিস্থিতি নিয়ে কবিকে ভাবতে হবে—এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে—এক কথায় এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। প্রুফ্রক, জিরোনশিয়ন, দা ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড প্রভৃতি কাব্য এলিয়টের হিউম্যান সিচুয়েশন সম্পর্কে সচেতনতারই প্রতীক। এবং ঐসব কাব্যে রচিত জগৎ তাঁর vision of the boredom, the horror, and the glory of life-কে নিখুঁতভাবে প্রতিভাত করছে। বিশেষভাবে প্রুফ্রক থেকে আংশিক উদ্ধৃতি দেয়া যাক :

Do I dare
Disturb the Universe ?
In a minute there is time
For decisions and revisions which a minute will reverse.
For I have known them all already, known them all
Have known the evenings, mornings, afternoons,
I have measured out my life with Coffee spoons ;
I know the voices dying with a dying fall
Beneath the Music from a farther room.
So how should I presume ?

প্রচণ্ড হতাশার চিত্র।
আতংকের পাখা বিস্তার।

produce various and complex results. The poet must become more and more, comprehensive, more allusive, indirect, in order to force to dislocate if necessary language into his meaning.

[Selected Essays, Page : 101]

এলিয়ট বর্তমান সভ্যতার মূল সুর প্রত্যক্ষ করেই এর জটিলতার কথা বলেছেন। কথাটা বিতর্ক-সাপেক্ষ। সভ্যতার জটিলতা যদি স্বাভাবিক পরিণতির সুবাদে ঘটে, তর্ক অনাবশ্যক। বলতিলাম, স্বেচ্ছাকৃত জটিলতার কথা। পাণ্ডিত্যের বেড়াজালে আঁটকে থেকে শিল্পী যদি আত্মপ্রসাদের উদ্যান রচনা করে তাহলে তার ভক্ত-মৌমাছিরা দূরেই থেকে যাবে।
অথবা এলিয়ট সভ্যতার কথা বলেছেন। বৈচিত্র্য ও জটিলতা আধুনিক সভ্যতার নিঃশ্বাস। তাই কবিকে হতে হবে পরোক্ষ, অধিকতর ইঙ্গিতময়, আরো বিস্তৃত মানসিকতার অধিকারী। প্রয়োজন-বোধে তাকে ভাষার পরিচিত বলয়কে নিজস্ব নির্বাচিত অর্থে রূপান্তরিত করতে হবে।
হাঁ, to dislocate...language into his meanings কবির ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এখানে এলিয়ট আধুনিক কবিতার নিরন্তর পরিবর্তনশীল অপিচ দুরন্ত তরঙ্গ প্রবাহের কথা বলছেন। এই যে বোধ তা কিছুতেই সাধারণ মননশীলতার পরিচায়ক নয়।
তারপরেও যে কথা থেকে যায় তা হচ্ছে এলিয়ট-এর বিরাট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান, অর্থাৎ UNIFICATION OF SENSIBILTY' কে সম্ভবপর করে তোলার প্রয়াস। 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি একত্রীকরণ' বলতে তিনি বোঝাতে চান ভাবনা ও অনুভূতির পারস্পরিক সাহচর্য বিধান। এলিয়ট কাব্যের এদিকটার যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। নইলে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা কী, তা কিছুতেই বোঝা যাবে না।

এলিয়ট কাব্যে প্রতীক ব্যবহার

Symbols ও Metaphor তিনি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রতীক ও রূপক কবিতার অলংকার হিসেবে পরিগণিত। এক্ষেত্রে এলিয়ট ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। তিনি মনে করেন প্রতীক ও রূপক অভিজ্ঞতা থেকেও স্বতন্ত্র অর্থাৎ তারও বাইরে বিরাজমান কোনো কিছু প্রকাশের একমাত্র উপায় অথবা মাধ্যম।
বস্তুতঃ এলিয়টের সারা কাব্য-সৃষ্টি জুড়ে প্রতীকের ছড়াছড়ি। তাঁর কবিতা Burnt Norton -এ Rose হচ্ছে মানুষের পার্থিব অভিজ্ঞতার প্রতীক, Little Gidding-এ মৃত্যুর—

The moment of the rose and the moment of the new tree
. Are of equal duration

Yew tree আবার মৃত্যুর প্রতীক। East coker-এ factory হচ্ছে বাড়িঘর মানুষ শস্যক্ষেত্রের অবক্ষয়ের প্রতীক, Field mouse ধ্বংসের উপাদানের, Dancers and ocean ঐতিহ্যের, Still point ঈশ্বরের, sea অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ একত্রীকরণের—আবার কখনো ইঙ্গিতময় 'the sea's throat' মৃত্যুর প্রতীক। Rock ধর্মের ও নিষ্ঠার প্রতীক। Smell of food and drinks

ভয় ও বিচ্ছিন্নতার প্রতীক। বলা বাহুল্য প্রতীক ও রূপক ব্যবহারে এলিয়টের সাফল্য অসাধারণ। তেমনি USE OF IMPLICATIONS/এর ব্যাপারেও এলিয়টের অসাধারণ নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়। আর এ পদ্ধতি সম্পর্কে এলিয়ট-এর বক্তব্য যা তা হচ্ছে 'in the use of statements which carry a weight far beyond their ostensive meaning. কিন্তু এর কি কোনো প্রয়োজন ছিলো ? এলিয়ট বলেছেন, it helps the poet to avoid direct statements of his beliefs, and attitudes, leaving the reader to reconstruct meanings for himself. তাহলে Implications বলতে আমরা বুঝতে পারছি :—ক. পরিচিত শব্দাবলী অধিকতর জোরালো ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করা যায়; খ. সরাসরিভাবে বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ থেকে বিরত থাকা যায়; গ. শব্দের অর্থ পুনর্গঠনে পাঠকদের সুযোগ দেয়া সম্ভবপর হয়।
উদাহরণ দেয়া যাক:

And indeed there will be time
To wonder, 'Do I dare ?' and, 'Do I dare ?'
Time to turn back and descend the stair,
With a bald spot in the middle of hair—

• • •

Do I dare
Disturb the Universe ?
In a minute there is time
For decisions and revisions which a minute will reverse.
For I have known them all already, known them all—
Have known the evenings, mornings, afternoons,
I have measured out my life with coffee spoons;
I know the voices dying with a dying fall
Beneath the music from a farther room.
So how should I presume ?

[Prufrock]

Implications এর পদ্ধতি কবিতার নামকরণেও পরিলক্ষিত: Burnt Norton বায়ুর প্রতীক। East coker পৃথিবীর, The Dry Salvages জলের Little Gidding অগ্নির প্রতীক। মধ্যযুগে কাব্যের ভাবার্থ ব্যাখ্যায় প্রতিটি বক্তব্য তিন, চার কিংবা সাতটিরও অধিক অর্থে উপস্থাপিত করা হতো। দান্তে Vita Nuova কাব্য গ্রন্থে নিজস্ব কবিতাসমূহের ব্যাখ্যায় একাধিক অর্থ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।
উপরোক্ত পদ্ধতির সুষম বিকাশ ঘটেছে নিম্নোক্ত কাব্যসমূহে:

East coker, V :

···Trying to learn to use words, and every attempt
Is a wholly new start, and a different kind of failure
Because one has only learnt to get the better of words

For the thing one no longer has to say, or the way in which
One is no longer disposed to say it·········
Home is where one starts from. As we grew older
The world becomes stranger, the pattern more complicated
Of dead and living. Not the intense moment
Isolated, with no before and after
But a lifetime burning in every moment
And not the life of one man only
But of old stones that cannot be deciphered ··

The Dry Salvages, II :

···We had the experience but missed the meaning,
And approach to the meaning restores the experience
In a different form, beyond any meaning
We can assign to happiness.

Little Gidding V :

We shall not cease from exploration
And the end of our exploring
Will be to arrive when we started
And know the place for the first time.

এক কথায় শব্দাবলী—কবিতার, অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। কেননা :

These are only hints and guesses,
Hints followed by guesses ; and the rest
Is prayer, observance, discipline, thought and action,
The hint half guessed, the gift understood, is Incarnation.
(Burnt Norton, V)

অথবা আবার Prufrock-এ ফিরে যাওয়া যাবে :

And indeed there will be time
To wonder, 'Do I dare ?" and "Do I dare ?"

এলিয়টের কাব্যে OBTECTIVE CORRELATIVE

এলিয়ট Objective Oorrelative তত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন :
a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion; such that when the external facts, which must terminate in sensory experiences, are given, the emotion is immediately evoked.

আর এ সূত্র ধরে আসে 'stream of consciousness.' চেতনার প্রবাহ' এলিয়টের প্রুফ্রক কাব্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে তিনি সময়কে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা লক্ষণীয়। কবিতার গতিশীলতার সময় এর নিজস্ব গতি হারিয়ে ফেলেছে। কিংবা বলা চলে, সময়ের প্রবাহ থামিয়ে দেয়া হয়েছে। ঘটনার ধারাবাহিকতাও নেই। আরো নেই সময় এগিয়ে চলার সম্ভাব্য পথ। সময়ের গতি থামিয়ে দেয়ার উপমা নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করা যায় প্রুফ্রক কাব্যের নিম্নে বর্ণিত অংশে:

…the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a taple;

প্রুফ্রক-এর অতীত এবং ভবিষ্যৎ একটি স্থিরবিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এ স্থির বিন্দুই হচ্ছে চেতনাবোধের একটি বিশেষ মুহূর্ত। Time এবং Space নিশ্চল। অগ্রগতি বন্ধ। যেখান থেকে কবি শুরু করেছেন সেখানেই তাঁর ভাবনার পরিসমাপ্তি। কিন্তু সময়ের এ স্থির অবস্থান কেন্দ্র দিয়েই প্রুফ্রককে বিচার করা চলবে না। প্রুফ্রক-এর অন্তর্গত জগতের আভ্যন্তরীণ অন্বেষণ থেমে নেই। তা যথানিয়মেই চলছে।
Objective Correlative বিশেষ অর্থে যা হলো, emotion that an audience wants to be justified in the plot: আপাতঃদৃষ্টিতে যা অসংলগ্ন—হয়তোবা অপ্রাসঙ্গিক, অথচ বিষয়ের কেন্দ্রীয় সুরের সাথে সম্পৃক্ত। এদিক থেকে বলা যায়, এলিয়টের প্রায় সব কয়টি নাটকের মধ্যে তাঁরই ব্যবহৃত phrase—objective Correlative-এর প্রতিধ্বনি। The Family Reunion-এর নিম্নোক্ত সংলাপে:

Can't you see them ? You don't see them,
but I see them,
And they see me. This is the first time
that I have seen them.

এবং ব্যবহৃত phrase সমূহে-

'the unexpected crash of the iron catact';
'the bright colour fades,' 'the bird sits ;
on the broken chimney'—

যদিও ঘটনা প্রবাহের সাথে পুরোপুরিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তবু উক্ত উচ্ছ্বাসের সাথে প্লটের অবিচ্ছিন্ন সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। তেমনি The Cocktail Party নাটকে স্যার হেনরি'র বক্তব্য তুলনীয়:

That was her destiny, the only question
Then was, what sort of death ? I could not know……
She did not know, so all that I could do
Was to direct her in the way of preparation.

ইতিহাস সম্পর্কে এলিয়টের ধারণা

ইতিহাস সম্পর্কে এলিয়টের ধারণা রীতিমতো ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি ইতিহাসকে সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিতে বিচার করতে চান। প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সাথে তাঁর মতবাদের তেমন কোনো মিল নেই। Gerontion কাব্যে বলা হচ্ছে—After such knowledge, what forgiveness? আর তার পরেই শুরু হলো ইতিহাস সম্পর্কে যুগান্তকারী বিশ্লেষণ:

> ···Think now
> History has many cunning passages, contrived corridors
> And issues, deceives with whispering ambitions,
> Guides us by vanities. Think now
> She gives when our attention is distracted
> And what she gives, gives with such supple confusions
> That the giving famishes the craving. Gives too late
> What's not believed in, or if still believed,
> In memory only, reconsidered passion······
> Unnatural vices
> Are feathered by our heroism. Virtues
> Are forced upon us by our impudent crim es.

উপরোক্ত কথাগুলো ইতিহাস থেকে অর্জিত জ্ঞানের ব্যাপারে সরাসরি জিজ্ঞাসা। ইতিহাস থেকে কি আমরা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করি? কিংবা অর্জন করি কোনো জ্ঞান? অথবা ইতিহাস কি আমাদের চূড়ান্ত সত্য সম্পর্কে কোনো ধারণা প্রদান করে? এবং যদি কোনো জ্ঞান সত্যিই অর্জন করা হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে ওই জ্ঞান কি আমাদের আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে পরিচালনা করে? সোজা জবাব হচ্ছে, না। এর কোনো মূল্য নেই। অথবা এর মূল্য সন্দেহাতীত নয়।
তাহলে কোন জ্ঞান প্রয়োজন? অথবা কোন প্রজ্ঞার? যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সমস্যাসংকুল পৃথিবীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে—আমাদের চূড়ান্ত নিয়তির ধারা বদলে দিতে পারে? সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাই কেবল আমাদের প্রয়োজন। বিমূর্ত মতবাদের পেছনে ছুটে কোনো লাভ নেই। ব্যর্থতাই হচ্ছে এর পরিণতি। এর জন্যে আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে নিয়োজিত করার অন্যতম অর্থ হচ্ছে অযথা কালক্ষেপ করা। জিরোনশিয়ন তাই করেছিলেন। শেষটায় বৃদ্ধ বয়সে, উপলব্ধি করলেন কী চরম ব্যর্থতার শিকার তিনি হয়েছেন। এবং এর কলশ্রুতি হলো, জিরোনশিয়নের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি। ইতিহাস একেবারেই অর্থহীন। ইতিহাস কখনো কোনো ব্যক্তিকে কিংবা ব্যক্তি-সমষ্টিকে সঠিক পথের নির্দেশ দিতে পারেনি। শুধু তাই নয়। ইতিহাস কখনো মানুষকে তার অনিবার্য পরিণতি থেকে রক্ষাও করতে পারেনি। এর কি কোনো কারণ নেই? এই ব্যর্থতার কি কোনো হেতু নেই?
এলিয়ট বলছেন, ইতিহাস deceives with whispering ambition, Guides us by vanities. ইতিহাস থেকে যে প্রজ্ঞাবোধের সূত্রপাত ঘটে তা অত্যন্ত বিলম্বিত। তখন এর প্রয়োজনও নিঃশেষিত।

ইতিহাস Gives too late. What's not believed in, or if still believed, in memory only, reconsidered passion.

এলিয়ট ঐতিহাসিক নন। ইতিহাসের ঘটনাপারম্পর্য বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ নেই, ইচ্ছাও নেই। ইতিহাসকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন কবি হিসেবে। কিন্তু ইতিহাস নিয়ে যে তত্ত্বের অবতারণা তিনি করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। Gerontion কাব্যের শীর্ষে তিনি শেক্সপীয়ার থেকে যে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন বর্তমান আলোচনায় এর গুরুত্ব রয়েছে:

> Thou hast nor youth nor age
> But as it were an after dinner sleep
> Dreaming of both

এলিয়ট কর্তৃক নাটক সমূহের কয়েকটি বিশেষ দিক:

এলিয়টের নাট্য সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে এর পটভূমির উপরে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। Tragic Sense ও Tragic vision যদিও আপাতদৃষ্টিতে অর্থগত দিক থেকে তেমন কোনো তারতম্য বহন করেনা তবু বলতে হয়, শব্দ দু'টি পুরোপুরি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। বলা হয়ে থাকে খৃষ্টান ধর্মে Tragic vision-এর কোনো স্থান নেই। খৃষ্টান ধর্মে এবং খৃষ্টান ট্র্যাজেডী সমূহে যে আবহাওয়া, পরিবেশ উপলব্ধি বিরাজ করে তা মূলতঃ বিয়োগান্ত উপলব্ধি বা Tragic. Sense. ব্যতিক্রম দেখা যায় নীৎশে এবং শোপেনহাওয়ার কর্তৃক উপস্থাপিত Tragic vision বা বিয়োগান্ত দর্শন শক্তিতে। তাদের মতবাদ হলো Tragic vision। এই Tragic vision মানুষের বেদনা থেকে মুক্তির কোনো পথ দেখে না। মানুষের দুঃখ দুর্দশা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা সময়ের অস্তিত্বের বাইরেও কোনো অবস্থায় লাঘব হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মানুষের জন্মের সাথে মিশে আছে দুঃখ-বেদনা-দুর্দশা-যন্ত্রণা বোধ। এ হচ্ছে স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত অবস্থা—যে অবস্থা যা ছিলো, তাই রয়েছে, থাকবেও তাই। আর Tragic vision-এর দ্বিতীয় স্তর হলো, জীবনের কোনো অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা নেই। বিশ্লেষণ নেই। জীবন অর্থহীন। জীবন এমন এক হতাশাবোধের জন্ম দেয়, যে হতাশাবোধ থেকে মুক্তির সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত। তদুপরি রয়েছে নির্ভেজাল হতাশা। আর ওই হতাশার আবর্ত এতোটা গভীর যে তা থেকে পালিয়ে বিশ্বাসবোধের স্তরে উপনীত হওয়ার কোনো পথের সন্ধান Tragic vision দিতে পারে না।

Tragic vision যা দিতে পারে তা হচ্ছে নিশ্ছিদ্র হতাশা। অপার শূন্যতা। অভিজ্ঞতা অর্জনের সম্ভাবনা এখানে নেই।

অপরপক্ষে Tragic Sense মানবিক সীমাবদ্ধতার অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। পাপের উপলব্ধি, অনুশোচনা, পাপের পরিণাম সম্পর্কে সচেতনতা Tragic Sense এর মূলে রয়েছে। কিন্তু তা Tragic কেনো? কারণ মানুষ জন্মসূত্র থেকেই যে অবস্থার—যে উদ্বিগ্নতার শিকার তা হচ্ছে, 'the thousand natural shocks that flesh is heir to' অথচ কিছুই করার নেই। অনুশোচনা আত্মোপলব্ধির জন্ম দেয় সত্যি কিন্তু এর স্থায়িত্ব স্বল্পকালীন। এই যে অসহায় ভাব তাই বিয়োগান্ত পরিণতির জন্ম দিয়েছে।

Tragic Vision-এর কিছু উদাহরণ দেয়া যাক:

১. হ্যামলেট হোরেশিও'কে বলছেন:

> If thou didst ever hold me in thy heart
> Absent thee from felicity awhile
> And in this harsh world draw thy breath in pain.
> To tell my story.

২. কিং লিয়ার:

> As flies to wanton bays are we to the Gods
> They kill us for their sports;

৩. ম্যাকবেথ:

> Life's but a walking shadow...a tale
> Told by an idiot, full of sound and fury
> Signifying nothing.

খৃষ্টান ধর্মীয় আশাবাদ—যন্ত্রণা রোগ শোক থেকে মুক্তির আশাবাদ ক্ষণিকের জন্যে স্বস্তি এনে দিতে পারে। কিন্তু সমাধানে পৌঁছিয়ে দিতে ব্যর্থ:

Christian optimism is not a document which can be signed, sealed and delivered to a suffering world to solve the problem of suffering,
[দ্রষ্টব্য: টি. বি. কিলপ্যাট্রিকের 'Suffering', Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edited by James Hasting]

এলিয়টের নাটকে যে সুর তা হচ্ছে Mystery of Suffering-এর। এ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে নানা ধরনের বিতর্ক রয়েছে। এক শ্রেণীর সমালোচকেরা মনে করেন, এলিয়ট মৃত্যু চিন্তার একটানা প্রভাবে পড়ে জীবনের সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর কাব্যে, তাঁর নাটকে মানুষের অনিবার্য অথচ স্বাভাবিক যে পরিণতি, এ নিয়ে তিনি অহেতুক বাড়াবাড়ি করেছেন। এর ফলে জীবনের কর্মিষ্ঠ গতিতে পরোক্ষ মৃত্যুর পদধ্বনি সর্বত্র অবসাদের ছায়া বিস্তারিত করে চলেছে। আরেক শ্রেণীর সমালোচকেরা এর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন ধর্মীয় অনুভূতি, যা কিনা প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়—কেননা জীবন ক্ষণস্থায়ী, এখানকার যন্ত্রণা 'a life here after' -এ গিয়ে অনন্ত সুধার সন্ধান দেবে। প্রকৃত পক্ষে, এলিয়টের চিন্তাভাবনা আরো গভীরে। তিনি জীবনের প্রতি মমত্ব অনুভব করেন বলে জীবনের যন্ত্রণাকে, এবং যা জীবনের সাথে নিঃশ্বাসের মতো জড়িয়ে, তাকে অস্বীকার করতে পারছেন না। মানুষের suffering বড়ো বেশি তাঁর হৃদয়কে নাড়া দেয়। তাঁর নাটক Murder in Cathedral এবং Cocktail Party মূলত: Suffering-এর রহস্য নিয়ে বিরচিত।

কিন্তু গভীরতর অর্থে 'যন্ত্রণার রহস্য' নাটকের বিষয়বস্তু হলেও, অস্তিত্ববাদের উপাদানই এ অনুভূতির পটভূমি রচনা করেছে। অস্তিত্ববাদী নাটকগুলো হচ্ছে: Murder in Cathedral [1935], The Family Reunion [১৯৩৯]

The cocktail Party [1950], The Confidential Clerk [1953], The Elder Statesman [1950]

অস্তিত্ববাদী উপাদান কি? তা হচ্ছে জীবনের 'বিয়োগান্ত উপলব্ধি'। এর উৎস কি? যন্ত্রণার রহস্য মেনে নেয়া ও তা থেকে মুক্তির কোনো সম্ভাবনার দিশা না-পাওয়া। যন্ত্রণা জাগতিক নিয়মে পর্যবসিত। এর কোনো প্রতিকার নেই। প্রতিকার নিয়ে দার্শনিক ব্যাখ্যা চলে কিন্তু এর ফলে দু:খভোগের কোনো প্রকার অবক্ষয় ঘটে না। জ্ঞান প্রজ্ঞা পাণ্ডিত্য বুদ্ধিমত্তা সবই যাতনা নিরসনে ব্যর্থ। মানুষ কেবলমাত্র একটা কাজই করতে সক্ষম। আর তা হচ্ছে অস্তিত্ববাদের অবস্থায় সব কিছু সয়ে যাওয়া। আবার তাও স্বেচ্ছাকৃত নয়। ভয় ও আতঙ্ক এর সাথে জড়িত। মানুষ তার সঞ্চিত শক্তি দিয়ে শত চেষ্টা সত্ত্বেও যখন বিরূপ কিংবা অশুভশক্তিকে কাবু করতে পারে না তখনই ভয় ও আতঙ্ক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। টমাস বেকেট ওই ধরনের মানসিক অবস্থা অনিবার্য পরিণতি হিসেব গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি জানেন:

> Action is suffering
> And suffering is action
> [Murder in Cathedral]

The Family Reunion নাটকের হ্যারিও ওই অবস্থায় নিপতিত। পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্তকে তাকেই করতে হচ্ছে। হ্যারি হচ্ছেন bird sent flying through the purgatorial flame. তাছাড়া তার যন্ত্রণার আরো একটা বিশেষ দিক হলো তিনি একাকী এর প্রচণ্ডতা উপলব্ধি করছেন অথচ কাউকে এর ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না। গ্রীক ট্র্যাজেডীর Orestes-এর অব্যক্ত যন্ত্রণার গোঙানী হ্যারি'র জীবনেও প্রতিধ্বনিত: you don't see them, you don't - but I see they are hunting me down, I must move on.

The Elder Statesman-এর Lord Cleverton ভয়াবহ শূন্যতার জ্বালা অনুভব করছেন। এ বোধ থেকে তিনি আতংকিত। তিনিও সব সময়ে থাকছেন শূন্যতার ভয়ে। তার এ মানসিক পরিস্থিতি অপরকে বোঝানো অসম্ভব। বরং অপব্যাখ্যার বিস্তর সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য কেউ মনে করতে পারে তার যাতনার কারণ হচ্ছে:

> Morbid consience
> From brooding over faults—
> I might well have forgotten

টমাস বেকেটের অন্তর্জ্বালার উৎস হচ্ছে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর নিজেরই অনিশ্চিত ধারণা। একজন সিদ্ধ পুরুষ মৃত্যুর পথ বেছে নিতে চান। আর এ করুণ অনুভূতি আলোচ্য নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব করেছে:

> Peace. And let them be in their exaltation.
> They speak better than they know, and beyond your understnding.

They know and do not know what is to act or suffer
They know and do not know that action is suffering
And suffering is action. Neither does the agent suffer
Nor the patient act. But both are fixed
In an eternal action, an eternal patience
To which all must consent that it may be willed
And which all must suffer that they may will it.

যাহোক শহীদ হওয়ার পথ বেছে নেবার অর্থ হচ্ছে মৃত্যুকে বেছে নেয়া। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, যে কোনো কারণেই হোক, নিজের মৃত্যুর পথ বেছে নেবার ব্যাপারে কোনো প্রকার আধ্যাত্মিক অধিকার কি মানুষের রয়েছে? শহীদ হওয়া ও আত্মহত্যা করার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মেনে নেয়া যাক, কোনো ব্যক্তি সঠিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও যথার্থ কারণে মৃত্যুবরণ করতে পারে। কিন্তু কথা থেকে যায়। যে বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করে প্রাণ বিসর্জন দেয়া হচ্ছে সে বিশ্বাসের যথার্থতা সম্পর্কে কি পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়?

টমাস বেকেট ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের নির্দেশ লাভ করেছেন। তাই তিনি শহীদ হতে চান। নৈতিক কর্তব্য এক্ষেত্রে উপেক্ষিত। সমবেত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বেকেট যে বাণী দিয়েছেন এর মধ্যে রয়েছে অস্তিত্ববাদের প্রশ্ন। রয়েছে অস্তিত্ববাদী রহস্য:

Just as we rejoice and mourn at once, in the Birth and in the Passion of our Lord; So also...we both rejoice and mourn in the death of martyrs.

আনন্দ ও দুঃখবোধ পাশাপাশি। আর এ ধরনের যে অবস্থা, এর মূলে রয়েছে মানুষের নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে এক দারুণ হতাশার প্রতিধ্বনি। এখানেই নিহিত রয়েছে অস্তিত্ববাদের প্রক্রিয়া।
নাটকটি নাট্যমঞ্চে যেমন জনপ্রিয় তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। সুদূরপ্রসারী এর আবেদন। কেন না এলিয়ট এ নাটকের ঐতিহাসিক ধারায়—বিশেষতঃ বেকেটের নিহত হওয়ার ঘটনায় objective correlative তত্ত্বের বিকাশ লক্ষ্য করেছেন। উক্ত ঘটনায় রয়েছে ধর্মীয় উচ্ছ্বাস। এর সাথে ধর্মীয় আশাবাদ। এলিয়টের মানসিকতা ধর্ম সম্পর্কে মোটামুটি স্পষ্ট করলেন। ধর্মকে তিনি কেবল খেয়ালের বশে গ্রহণ করতে নারাজ। যথাযথ, এলিয়ট মনে করেন, নিবিষ্টচিত্তে, ধর্মের মূল্যায়ন হওয়া দরকার।

Murder in Cathedral-এর পরবর্তী পর্যায়ে রচিত নাটকসমূহে ভিন্ন সুর ধ্বনিত। প্রায় প্রতিটি নাটকই জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্বের বিভিন্ন দিক উপস্থাপিত করছে। জীবন অনাদিকালের প্রবাহে একটি নিঃশ্বাসমাত্র। এর কাছে কোনো কিছু প্রত্যাশা করা অর্থহীন। শুধু তাই নয়। জাগতিক প্রত্যাশার অন্তরালে রয়েছে প্রতারণা।

নাটকসমূহের কেন্দ্রীয় সুর হচ্ছে: timeless reality.
মুক্তির পথ হচ্ছে এব্যাপারে বিশ্বাসবোধ জাগ্রত করা। এর উপরে আস্থা স্থাপন করা।
The Family Reunion: মায়ের জন্মদিনের উৎসবে যোগদানের জন্যে ছেলে বাড়ি ফিরে এসেছে।

মনে আশা, এবার সে শান্তি পাবে। পারিবারিক পুনর্মিলনে স্বস্তি অনুভব করবে। শেষটায় তার সব আশাই ব্যর্থ।

The Cocktail Party : নর-নারীর রোমান্টিক সম্পর্কে ফাটল ধরবেই। এটি হচ্ছে এর অনিবার্য পরিণতি। হতাশা এর প্রতিপাদ্য।

The Confidential Clerk : একই ধরনের রোমান্টিক হতাশার আবর্ত এখানেও বিধৃত।

The Elder Statesman : বাহ্যিক দিক থেকে সফল কোন এক রাজনীতিবিদের অন্তঃসারশূন্যতা এর প্রতিপাদ্য বিষয়। উক্ত রাজনীতিবিদ সসম্মানে অবসর গ্রহণের অপেক্ষায় আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে। কাব্য নাটক সম্পর্কে এলিয়টের মতবাদ হলো :

Characters must some how (not necessarilly) disclose a deeper reality than that of most of our conscious living, and ...show their real feeling and ovlitions, instead of just what in actual life, they would normally profess or be conscious of.....

It (Poetic drama) must reveal, underneath the vacillating or infirm character the indomitable unconscious will, and underneath the resolute purpose of the planning animal, the victims of circumstances and the doomed or sanctified being.

[T. S. Eliot : Introduction to Bathell's Book]

কয়েকটি নাটকে উক্ত মতবাদের সাদৃশ্য প্রতিধ্বনিত উদ্ধৃতি নেয়া যাক :

> Murder in the Cathedral : কর্ম ও দুঃখ ভোগ। 'the suffering of the witness and the action of the witnesses are one and the same thing.

বেকেট কোনাসের প্ররোচনায় ক্ষণিক দুর্বলতা ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত হন। শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জনের ভাবনা একটু কেঁপে ওঠে। তবু তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে– হয়তো অলক্ষ্যে :

> The last temptation is the greatest treason
> To do the right deed for the wrong reason.

The Family Reunion : ওয়েস্টল্যান্ড-এর বাণী যে, দুঃখভোগ নারকীয়—এবং সহিষ্ণুতাও আছে। এর জন্যেও নারকীয় যন্ত্রণা সহ্য করার মত ক্ষমতা থাকা চাই। ম্যাকেট মার্ডার ইন ক্যাথেড্রালে ওই বক্তব্যের প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ। দুঃখ ভোগ ও কর্মের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। দুঃখভোগ অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্যে সহ্য করে যাওয়া। যারা সৎকর্ম করে তারা হচ্ছে 'শহীদ' ও 'সাক্ষী'। নিপীড়িত ইচ্ছাশক্তিকে পরিশীলিত করতে হবে। আর এসব বক্তব্যের প্রতিধ্বনি হয়েছে 'দ্য ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' কাব্যনাট্যে :

> 'Can't you see them? You dont see them, but I see them
> And they see me. This is the first time that I have seen them.

The Cocktail party : এখানে Problem of Choice --এলিয়ট বোঝাতে চান কোনো মানবিক সম্পর্কই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যারা ভালোবাসে, তারা বিয়ে করতে পারে না। বিবাহিত ব্যক্তিরা

শেষ হয়ে যায়। Celia-এর নিঃশেষ হয়ে যাবার অবস্থা Heywoods-এর A woman killed with kindness-এর সাথে তুলনীয় :

'O God, O God, if I could return to yesterday
Before thougt that I have made a decision'

এ নাটক সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে এ হচ্ছে সংসার বিরাগী মানুষের বিমর্ষতার প্রতিধ্বনি। প্রকৃত-পক্ষে তা সত্যি নয়। এখানে এলিয়ট এ মতবাদের সপক্ষে : জীবনে উচ্চতর কোনো স্তরে আরোহণ করতে হলে ব্যক্তিত্ববোধ বিসর্জন দিতে হয়।

সাহিত্য সমালোচক টি.এস.এলিয়ট

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এলিয়টের ভূমিকা ও অবদান আলোচনা করার আগে সমালোচনার ক্ষেত্রে লিখিত তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে একটি তালিকা দেয়া যাক :

Sacred wood—1920
Homage to John Dryden (1924)
Essays, Ancient and Modern (1936)
Study of Dante (1929)
After Strange Gods (1934)
The Use of Poetry and
the Use of criticism (1933)
The Music of Poetry (1942)
The Classics and the man
of Letters (1942)
What is a Classic (1945)
Milton 1947
The Three Voices of Poetry (1953)
Collected Wores 'on Poetry and Poets' (1957)

সমালোচক সম্পর্কে তিনি বলেন, "সমালোচক ও সৃজনশীল সমালোচক অবিচ্ছিন্নভাবে একই ব্যক্তি হওয়া উচিত।" [The Sacree Wood, P. 16]

একই গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠায় তিনি উক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই আবার বলছেন :

The true generalization is not something super imposed upon an accumulation of perception; Perception dont, in a really appreciative mind, accumulate as a mass, but form themselves as a structure; and criticism is the statement in language of this structure ; it is a development of sensibility.

আধুনিক কালে সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার প্রবণতা দেখা যায়।

এলিয়ট ওই প্রবণতার বিরোধিতা করে বলেছেন :

Personality tends naturally to be the unregenerate personlity, pastly self deceived, and partly irresponsible because of its freedom terribly limited by prejudice and self-conceit, capable of much good or great mischief according to the natural goodness or impurity of the man: and we are all naturaly impure.

মিল্টন সম্পর্কে এলিয়ট বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন। মিলটনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বড়ো রোমান্টিক কবিরা মানবতার নিকৃষ্ট অভিব্যক্তি। এলিয়টের এই মনোভাবের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জন হেওয়ার্ড বলেছেন, মিলটন কাব্যের গুণাগুণ নির্ধারণের ব্যাপারে এলিয়টের যে দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে তা হ'ল : An antipathy towards Milton as a man. ড্রাইডেনকে তিনি উচ্চমার্গে তুলে ধরেন যদিও তাঁর কাব্য মিলটনের কাব্যের চেয়ে মহত্তর নয়। পোপ ও অগাষ্টাইনকে মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুন মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এলিয়টের বিচারে, ডক্টর স্যামুয়েল জনসন 'একজন সঠিক, নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য সমালোচক।' এলিয়ট মেটাফিজিকেল কবি জন ডানের জনপ্রিয়তার পুনর্জাগরণের নিশ্চয়তা বিধান করেন। ডানের কাব্য বুদ্ধিদীপ্ত, শ্লেষবিদ্ধ। ডান সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন : a thought to Danne was an experience, it Modified his sensibility

এলিয়ট বরাবরই এ ধারণা পোষণ করতেন, তাঁর তাবৎ সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলী রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁর ভিন্নমত তুলে ধরেছে।

প্রসঙ্গক্রমে এবিষয়ে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য স্মরণ করা যায়, 'সৎ সমালোচনা এবং সংবেদনশীল প্রশংসা কাব্য মূল্যায়নে নির্দিষ্ট— কবির নয়।' (দ্রষ্টব্য : Selected Essays, P. 17]

রোমান্টিক আন্দোলনের হোতা হচ্ছেন রুশো (১৭১২—১৭৭৮)।

তিনি তাঁর Social contract theory-তে উল্লেখ করেছেন, Man is born free and everywhere he is in chains.

Emile তে রুশো জোর দিয়ে বলছেন : God makes all things good; man meddles with them and things become evil.

উপরোক্ত দুটি কথাই হচ্ছে রোমান্টিকতার সংক্ষিপ্ত সার। ধর্মীয় মতবাদের সাথে এর বিরোধ রয়েছে। ধর্মীয় মতবাদ হচ্ছে, Man is born sinful, and he is finite and free only in a limited sense.

রোমান্টিক কবিরা 'এই জীবন, এই সংসার বা এই জাগতিক সম্পর্ককে গোড়নীয় গ্রহণীয় সত্য বলে স্বীকার করেন না ; এই মুহূর্তে প্রবাহিত হতে থাকা জীবন যেন এক বিভীষিকাময় বন্দীশালা, যেখানে তাদের বন্দী অন্তরাত্মা ব্যাকুল তীব্রতায় সতত কাঁদে, কোথায় মুক্তি কোথায় সেই মায়াবন্দু বঙের দেশ ও জীবন যেখানে কবির কণ্ঠে মুক্ত উল্লাস।

যাহোক, রোমান্টিক কবি-মানস সম্পর্কে T. E. Hulme বলছেন, 'এখানে হচ্ছে রোমান্টিকতার মূল : মানুষ, ব্যক্তি-বিশেষে, অনন্ত সম্ভাবনার ভাণ্ডার। যদি আপনি সমাজকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারেন যেখানে শোষণের ব্যবস্থা বিলুপ্ত তাহলে ওইসব সম্ভাবনার বিকাশ ঘটার সুযোগ আসবে। আপনি প্রগতির সন্ধান পাবেন।

আলোচনার সুবিধার্থে বোদলেয়ারের একটি সুন্দর মন্তব্যের উদ্ধৃতি নেয়া যেতে পারে:

Man – all men, that is to say – is so naturally depraved that he suffers less from the degradation of the universe than from the establishment of a reasonable heirarchy.

এক কথায় রোমাণ্টিক মানসিকতা তাবৎ আপ্তবাক্য বিরোধী। প্রচলিত ব্যবস্থার আড়ালে মানবতা নিষ্পেষিত। এলিয়ট এ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন যে-সব কারণে সে-সবের মধ্যে প্রধান হলো মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে রোমাণ্টিক মানসিকতার অতিরঞ্জিত ধারণা। তিনি আরো মনে করেন, রোমাণ্টিক কবিরা মানবিক ব্যক্তিসত্তায় জীবনের চূড়ান্ত মূল্য প্রত্যাশা করেন। অতএব, তিনি এ'ও মনে করেন, ওই' ধরনের ধারণা থেকে ব্যক্তিগত মোহবিকার এবং অভিজ্ঞতা সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করবে। এলিয়টের ওইসব কাব্যিক মতাদর্শের ভিত্তি হলো তাঁর 'নিজস্ব থিওরী'—অর্থাৎ Theory of impersonality in art.

উক্ত থিওরীর উপরে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

A Practical sense of realities·······which is anti-Romantic: not to expect from life more than it can give or more from human beings than they give: to look to death for what life cannot give. [Selected Essays, P. 275]

শিল্পে নৈর্ব্যক্তিকতা ও বস্তুগত দিক নিয়ে এলিয়টের ধারণা হলো: মানুষকে ধর্মীয় বিধিব শৃংখলা মেনে চলা প্রয়োজন। এমন কি অনুভূতি ধর্মীয় বিধি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। ঐতিহ্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শিল্প কর্মে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা প্রয়োজন। মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ বিশুদ্ধ স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত তত্ত্ব পুরোপুরিভাবে রোমান্টিকতা বিরোধী। মানবতাবাদ মূলত: নৈতিকতার সপক্ষে। মানবতাবাদ নীতিশাস্ত্রের পটভূমি নির্মাণের উদ্দেশ্যে মানব ইতিহাসের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের উপরে নির্ভরশীল। তাছাড়া মানুষের আত্মিক শক্তির নৈতিক সম্পূর্ণতা অর্জনের যে অনিবার্য গতি, মানবতাবাদ যত্ন সহকারে তাও প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারে আগ্রহী। অতএব একথা সত্যি, মানবতাবাদ ঐতিহাসিক জ্ঞান বা প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে।

যুক্তির ধী-শক্তি দিয়ে অতীতকে নিরীক্ষা করার ব্যাপারে আমরা কি ইতিহাস থেকে পাঠ নিতে পারি? এ প্রশ্নের জবাবে মানবতাবাদীরা বলেন, ইতিহাস হচ্ছে একটি Cumulative process। কিন্তু এলিয়ট ইতিহাসের Cumulative process-এ বিশ্বাস করেন, এমন কোনো প্রমাণ নেই।

বরং ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত সুস্পষ্ট মতামত রয়েছে:

history has many cunning passages, contrived corridors,/And issues, deceives with whispering ambitions,/Guides us by vanities.....

[Complete Poems and Plays, P. 22]

•

ইতিহাস সম্পর্কে অমন বিরূপ ধারণা থাকার কি কারণ? কারণ, এলিয়ট মনে করেন, 'সত্য' বিশেষ কোনো সময়ের কথা নয়। এ হচ্ছে অনন্তকালের কথা।

'সত্য'কে আমরা জানি যুক্তির মাধ্যমে নয়। প্রতিষ্ঠানগত ধারণাও এখানে বিকল। 'সত্য'কে আমরা জানি Revelation বা ঈশ্বরপ্রদত্ত বাণীর মাধ্যমে।

এলিয়ট 'ঐতিহ্যের' প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন, একথা আগেও বলেছি। ঐতিহ্য চেতনার মাধ্যমে তিনি এবিষয়ের উপরে জোর দিতে চান যে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে মূল্যবোধকে যুগ থেকে যুগান্তরে সচল রাখার উপলক্ষ মাত্র।

সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে এলিয়টের স্থান চিহ্নিত করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচক এলিয়টকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকজন খ্যাতনামা সমালোচনা-বিশেষজ্ঞদের অভিমত উল্লেখ করা প্রয়োজন :

John Crowe Ransom মনে করেন, 'সম্ভবত: এলিয়টের চেয়ে ভালো সমালোচক আমাদের মধ্যে নেই।' [The Great Critics P. 713]

Edmond Wilson এলিয়টের লেখায় ধর্মান্ধতার ঝলক লক্ষ্য করেছেন। উপরন্তু তিনি মনে করেন, নিজের বক্তব্যের ব্যাপারে এলিয়ট উচ্চকণ্ঠ। তারপর অবশ্য তিনি এও স্বীকার করছেন, 'এলিয়টের লেখায় এমনসব ব্যাপার অনেকখানি আছে যার ফলে বোঝা যায়, তাঁর নিজের যুগের গালভরা পাণ্ডিত্য ও অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিফলন সেখানে ঘটেছে।' [Axe's Castle P. 124]

Wyndham Lewis টি. এস এলিয়ট সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁর বক্তব্য নিন্দা আশ্রয়ী, কাজেই মোটামুটি নিরপেক্ষ ; গ্রহণযোগ্য কিনা বিতর্ক সাপেক্ষ ; তবুও গুরুত্বপূর্ণ :

If there is anything more than another paraded by Mr. Eliot, the literary critic, it is a supposed logical precision of statement, a fastidious carefulness in the use of words. Is it a gross self-delusion, one sometimes wonders, or a mere bare-faced bluff. [Men Without Art]

'Bare faced bluff' কথাটি এলিয়টের ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়। সমালোচক হিসেবে তিনি গভীরভাবে সব কিছু পর্যালোচনা করতেন, পরীক্ষা করতেন এবং নিজস্ব ফর্মুলা, সুচিন্তিত পদ্ধতি, অতুলনীয় বিশ্লেষণ ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। হয়তো তাঁর বহু বক্তব্যই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু তাই বলে কিছুতেই bluff শব্দ সঠিক কিংবা তথ্যনির্ভর নয়।

অবশ্য A. G. George মন্তব্য করেছেন, he has some defects as a critic. He is often pontifical and sometimes overweening. [T. S. Eliot : His Mind and Art]

কথাটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে A. G. George ম্যাথু আর্নল্ড সম্পর্কে এলিয়টের নেতিবাচক মন্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

এলিয়টের দৃষ্টিতে ম্যাথু আর্নল্ড হচ্ছেন, 'দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে একজন আগন্তুক/অনুপ্রবেশকারী। ধর্মের ব্যাপারে তাঁর বাহ্যিক ঠাট বজায় থাকলেও প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতাপূর্ণ।''

স্বীকার করি এটা সমালোচনা নয়। অথবা এ'ও বলা যেতে পারে, সমালোচনার ক্ষেত্রে গৃহীত কোনো বিধি ম্যাথু আর্নল্ডের ব্যাপারে তিনি মেনে চলেননি। একইভাবে তিনি মিলটনকেও কটাক্ষ করেছেন। আর্নল্ডকে তিনি আরো নির্মমভাবে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আর্নল্ড ছিলেন একজন স্কুল পরিদর্শক। পরবর্তীকালে তিনি হয়েছিলেন কবিতার অধ্যাপক।'

সমালোচক হিসেবে এলিয়ট-এর প্রধান ত্রুটি হলো, তিনি সমালোচনার ক্ষেত্রে যে মানদণ্ডের কথা বলতেন তা নিজের সুবিধে মতো আবার পরিবর্তনও করে ফেলতেন। এ ধরনের স্ববিরোধিতা বিভ্রান্তিকর অবস্থার সূত্রপাত করেছে। অথচ তাঁর মত সমালোচকের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটা উচিত ছিল না।

দান্তে সম্পর্কিত রচনায় তিনি মন্তব্য করেছেন, কোনো কবির কবিতার রসোপলব্ধির জন্যে তাঁর জীবনদর্শন কিংবা আইডিয়ার আস্থা স্থাপনের প্রয়োজন নেই। অথচ একই সাথে তিনি শেলীর কাব্যকে 'Repellent ideas' বা 'অরুচিকর ভাবধারার' অজুহাতে নিন্দা করেছেন।

এ ধরনের বিভ্রান্তিকর মানসিকতা সমালোচনার ক্ষেত্রে নিতান্ত দুঃখজনক। এবং এর ফলে সমালোচনার মান বিঘ্নিত হয়। সমালোচনার জগতে যার স্থান অবিসংবাদিত —যিনি সবল সতেজ সুষ্ঠু সমালোচনার গতিধারা প্রবর্তন করেছেন, তিনিই বা কেমন করে শেলী ও মিল্টনের মত লেখকদের প্রতি অতটা নির্দয় হতে পারলেন, এর যথাযথ ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। তবু মনে হয়, 'ব্যক্তির প্রতি বিরূপ ধারণার' বশবর্তী হয়ে তিনি তা করেন নি। শিল্পকলার উর্ধ্বে কিংবা পিছনে কিংবা অন্তরালে যে ব্যক্তি-চরিত্রের অস্তিত্ব তিনি গৌণ বলে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন, চূড়ান্ত পর্যায়ে সম্ভবত: তা' তাঁর কাছে সঠিক বলে মনে হয়নি। তাছাড়া, মতবাদ বিবর্তনের আওতামুক্ত—একথাও মেনে নেয়া যায় না। এলিয়ট বিশেষজ্ঞরা বোধ করি এদিকটার প্রতি গুরুত্ব দেননি। A. G. George-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

...his capacity for subtle analysis and the widely admired lucidity and severity of his prose style make him one of the most distinguished among contemporary critics.

শুধু কী তাই। ক্ষুরধার দৃষ্টিভঙ্গী, সূক্ষ্মবিশ্লেষণ ক্ষমতা ও সাবলীল রচনাশৈলী তাকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে তাঁর কাব্যের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য তাঁকে কবি ও সমালোচক হিসেবে এক অবিভাজ্য সত্তায় রূপান্তরিত করেছে। তাঁর কবিতার সাথে তাঁর গদ্য রচনার তুলনা করা হলেও দেখা যাবে যে এমন সব সমালোচকদের সংখ্যা নিতান্ত কম যারা এতো অধিক লিখতে পারেন—এতো নিখুঁতভাবে, এতো কম কথায়।

এখানেই এলিয়টের মাহাত্ম্য। ঘোরতর নিন্দুকেরাও তাঁর লেখায় অপ্রয়োজনীয় শব্দাবলীর ব্যবহার দেখাতে পারবেন না। কবিতায় যেমন প্রতিটি শব্দ অর্থবহ এবং প্রয়োজনীয় তেমনি তাঁর গদ্য লেখারও তিনি সদাসতর্ক। মনে হয় এলিয়টের একটি কবিতা আরেকটি কবিতার সমালোচনা। নিজের সৃষ্টির ব্যাপারে নিজেই সদা-সমালোচনা মুখর—এমন নজির, টি.এস. এলিয়ট ছাড়া, আর কেউ রয়েছেন কিনা বলা কঠিন। Miss M. C. Bradbrooke যথার্থ বলেছেন : his equipment as a critic is congruent with his equipment as a poet. [Eliot's Critical Method, edited by B. Rajan, p. 126]

সামাজিক সমালোচক হিসেবে

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন : "সংক্ষিপ্ত আর অসহায় হচ্ছে মানুষের জীবন। নিশ্চিত নিয়তি নিষ্ঠুরতা ও অন্ধকার নিয়ে নেমে আসে তার এবং তার জাতির উপরে।"

উপরোক্ত ভাবধারা H. G. Wells, George Orwell, Aldous Huxley, Arnold, Hardy, Pater প্রমুখ লেখকদের রচনায় বিকশিত। গাঢ় অন্ধকার প্রকৃতির নিলিপ্ত পটভূমিতে ক্রমশ: পাখা বিস্তার করে চলেছে আর এর মাঝে মানুষের অস্তিত্ব অসহায় কাতরানি ও ব্যর্থতার দীর্ঘনিশ্বাসে ভরপুর। এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ কোথায় মানুষের জানা নেই। উল্লিখিত লেখকদের সৃষ্ট জগতে তাই নিষ্ঠুর নিয়তির নি:শব্দ অথচ সুনিশ্চিত পদচারণা মানুষের হাসি-কান্নার অন্তরালে একটানা করুণসুরের আবহাওয়া বিস্তারিত করেছে।

কোনো কোনো লেখক এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন সামাজিক অবক্ষয়ের চিহ্ন। কিন্তু কেনো এ অবক্ষয়—কেনো এ হতাশার আবর্তন—মানুষের বহমান যন্ত্রণার সূত্রপাত কোথায় এবং এর কী কারণ, এসবের ব্যাখ্যা নানাজনে নানাভাবে করেছেন। আর্নল্ড মনে করছেন, এসব হচ্ছে কালচার'কে অবহেলা করার প্রতিফল। তাঁর 'কালচার' সম্পর্কে ধারণার সাথে মিশে আছে 'ধর্ম'। অতীতকে তিনি পরীক্ষা করতে চান কেননা তিনি বিশ্বাস করেন, এর মাধ্যমে ভবিষ্যত পৃথিবীর মানুষের জন্যে পথচলার নির্দেশ পাওয়া যাবে।

এলিয়টের ধারণা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তিনি মনে করেন, সময়কে অতীত বর্তমান ভবিষ্যতে বিভক্ত করা অর্থহীন। তাছাড়া তিনি এ'ও মনে করেন, সময়ের সাথে অনন্তকালের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। বর্তমান ধারণ করছে অতীত এবং ভবিষ্যতকে। Here and now-এর অন্তর্গত হচ্ছে অতীত ও ভবিষ্যত। যাহোক, 'সময়' সম্পর্কে উভয়ের ধারণা প্রায় কাছাকাছি। যদিও এলিয়টের চিন্তাধারা আরো গভীর। অধিকতর সুদূরপ্রসারী। এলিয়ট দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরের উপরে ঈমান ছাড়া সামাজিক উন্নতিকল্পে যতোরকম পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক না কেনো, সেসব ব্যর্থ হতে বাধ্য। তিনি বলেন: ''আমাদেরকে সদাসর্বদা বলা হয়ে থাকে, অর্থনৈতিক সমস্যা অপেক্ষা করতে পারে না। এটাও সমভাবে সত্যি, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্যাও অপেক্ষা করতে পারে না। এসব আগে থেকেই দীর্ঘকাল যাবত অপেক্ষা করছে।''

আমরা বর্তমানকে উপেক্ষা করি। অবহেলা করি। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় বর্তমানের দাবি আমাদের কাছে গৌণ বলে মনে হয়। এর ফলে আমাদের আত্মিক বিকাশের পথ বিঘ্নিত হয়। আমরা Ego-centric হয়ে পড়ি।' Over complacent historical knowledge এ অবস্থার জন্যে দায়ী।

সাহিত্য কর্ম বিশেষ যুগের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। সাহিত্য বিচার ওই বৈশিষ্ট্যের পথ ধরে নিজস্ব গতি নির্ধারণ করে। কিন্তু সাহিত্যকে কালজয়ী হতে হলে সর্বকালের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন করতে হবে। নইলে কোনো শিল্পকর্মই স্থায়ী হতে পারে না।

সামাজিক সমালোচনার ক্ষেত্রে এলিয়টের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, মানবিক অসম্পূর্ণতা। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেনো, তার কাজের ফলাফল সম্পর্কে সে কখনো নিশ্চিত হতে পারবে না। সুখ-শান্তি ভবিষ্যতে অর্জিত হবে, এমন ধারণাও সঠিক নয়। ভবিষ্যতের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন, তা হচ্ছে ব্যক্তি-বিশেষের সাথে ঈশ্বরের যথাযথ সংযোগ স্থাপন। আর এ সংযোগ স্থাপন সম্ভবপর হলে, সুখ-শান্তির পরশ প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করা যাবে। •

এলিয়ট ব্যক্তি বিশেষের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করছেন। সমষ্টির ধারণা ব্যক্তি থেকে আসে। অতএব ব্যক্তি যদি নিজে একজন ইউনিট হিসেবে সমাজকে অর্থপূর্ণ পথে পরিচালিত করতে চান তাহলে

ব্যক্তি ও সমষ্টির সাথে সাথে সমাজেরও কল্যাণ সাধিত হয়। সামাজিক সমস্যার মূলীভূত কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলছেন:

> If humility and purity be not in the heart, they are not in
> the home: and if they are not in the home they are
> not in the city.
> The man who has builded during the day would return to
> his hearth at nightfall: to be blessed with the gift of
> silence, and dose before he sleeps.
>
> [Choruses from 'The Rock'v]

বিচ্ছিন্নতা—বিংশ শতাব্দীর অন্যতম অভিশাপ—সামাজিক কিংবা মানসিক অথবা উভয়বিধ অর্থে, মানুষের আত্মিক শক্তিসমূহের ক্ষতি সাধন করছে। এলিয়ট মনে করেন, এ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া দরকার এবং অবিলম্বে।

এলিয়টের অবদান

It is a function of all art to give us some perfection of an order in life, by imposing an order upon it. [H. W. Carr: Proceedings of British Academy. Vol. VIII, P. 6]

শিল্পের কাজ হচ্ছে জীবন-বিন্যাসে কিছুটা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা-বিধান করা। উপরোক্ত উদ্ধৃতি এলিয়টের ব্যক্তি মানস উন্মোচনে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। জীবনভর ওই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তিনি সাধনা করে গেছেন।

জ্ঞানের কথা মুখস্থ করা এক ব্যাপার জ্ঞান অর্জন করা আরেক ব্যাপার। আবার, জ্ঞান থেকে নির্যাস গ্রহণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভিন্নতর ব্যাপার। জ্ঞান হজম করে এর মাধ্যমে নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপন করা অতি কঠিন ব্যাপার। উঁচুদরের শিল্প চেতনা ব্যতিরেকে তা সম্ভব নয়। এলিয়ট তাই করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদিক থেকে এলিয়টের প্রতিভার জুড়ি নেই। শুধু ইংরেজী সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যে এধরনের প্রতিভা বিরল।

মিলটন সম্পর্কে একবার তিনি বলেছিলেন, মিলটনের মতো এতো অধিক জ্ঞান অর্জনের সার্থকতা কোনো কবিই প্রমাণ করতে পারেননি। একথাটা তাঁর নিজের বেলাও সমভাবে প্রযোজ্য। বিশ্ব-কোষের মতো জ্ঞান তাঁর। আর ওই জ্ঞান সুচারুভাবে তিনি তাঁর কাব্যে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন।

A. G. George বলছেন:

human dignity springs from the fact that man is a compact of the finite and infinite, of good and of freedom and necessity, the natural and the supernatural, the contigent and the eternal, of matter and spirit.

আলো-আঁধারের বিরোধী উপাদান আছে মানুষের জীবন ও স্বভাবে। এর একটিকে অস্বীকার করা হলে অপরটিও অস্বীকার করতে হয়। অথচ এ দুয়ের উপস্থিতি রয়েছে মানুষের চরিত্রে।

অতএব দু'টির যে কোনো একটি উপেক্ষা করা হলে কোনো মানুষের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হবে না। বরং এর ফলে মানুষ সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। এলিয়ট ওই ভাবধারার প্রতি আস্থাবান ছিলেন।

এবং নিজের কাব্যে এর সম্প্রসারণ করেছেন। আর এটা হলো এলিয়টের উল্লেখযোগ্য অবদান সমূহের অন্যতম।

চিন্তার ক্ষেত্রে এলিয়টের বিশেষ অবদান হলো : মানব প্রকৃতি পর্যালোচনা করে তিনি ধর্ম সম্পর্কে এমন এক মতবাদ সৃষ্টি করেছেন যা বিশু-মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। ধর্মীয় বিশু-মতবাদের রূপরেখা তিনি তাঁর শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কিন্তু প্রচলিত উপায়ে এর বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। তাই তিনি এক ধরনের নতুন আঙ্গিকে কবিতা রচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ Four Quartets-এর কথা উল্লেখ করা যায়।

তিনি মনে করেন কোনো প্রকার মন্তব্য কিংবা সমালোচনা ব্যতিরেকে কাব্যে হৃদয়ের যন্ত্রণা কিংবা হতাশ্বাস স্বার্থকভাবে প্রকাশ করতে পারে।

আধুনিক কালের দুঃখ-দুর্দশা এবং জীবনের বিয়োগান্ত পরিস্থিতি প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে তিনি তাঁর কাব্যে কথোপকথনের ঢঙ ব্যবহার করেছেন।

তদুপরি ব্যবহার করেছেন, প্রাত্যহিক চিত্রকল্প, Objective correlative, প্রতীক ও রূপক। অতীতের মহৎ রচনা থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে এর পাশাপাশি নিজস্ব ধারণা প্রকাশের পদ্ধতি। এসবের মাধ্যমে তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন।

তাঁর জীবন-দর্শনে ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। কাব্যে প্রবন্ধে নাট্য সৃষ্টিতে তিনি যে জীবন দর্শন উপস্থাপিত করেছেন এর মধ্যে কোনো প্রকার অহেতুক জটিলতা নেই। আরো একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, এলিয়ট এমন একজন ক্ষণজন্মা কবি যার একটা নির্দিষ্ট জীবন দর্শন আছে—মানুষের জন্যে যে সেন্স আছে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, একমাত্র অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন লেখকেরাই তাই পারেন।

Irony বা শ্লেষ এলিয়ট কাব্যে ইঙ্গিতবহ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ। মানুষের সহজাত দুর্বলতা তাঁর 'শ্লেষ'-এর বিষয়বস্তু। কিন্তু কোনো কারণেই তিনি নিষ্ঠুর অমানুষিক 'শ্লেষ' ব্যবহার করেন না। জনাথন সুইফট্-এর 'শ্লেষ' তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। গভীর সংবেদনশীল হৃদয় তাঁর। মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসার কারণে তিনি মানুষের সহজাত দুর্বলতার উর্ধ্বে মনুষ্যত্ববোধকে স্থান দিয়েছেন।

চিন্তাবিদ হিসেবে এলিয়টের স্থান অবিসংবাদিত। শুধু কাব্য জগৎ নিয়েই তিনি চিন্তা করেননি। কল্পনার দুরন্ত পাখা ছেড়ে তিনি মাঝে মাঝে চার পায়ের রূঢ় বাস্তবতাকেও প্রত্যক্ষ করেছেন। ভেবেছেন মানুষের মুক্তির পথ কোথায়। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা হলো, এর মাধ্যমে has no solution to perennial problem of individual boredom, একথাটা বলেই তিনি হালছেড়ে দেননি। তিনি এর কারণ নির্দেশ করেছেন। বলেছেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতির বক্তব্য হচ্ছে, 'বর্তমানকালে নৈতিক ও আত্মিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা কোনো রাজনৈতিক অর্থ-নৈতিক দলের সরাসরি লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।'

এলিয়ট The Symposium পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো এক নিবন্ধ সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। উক্ত নিবন্ধে কম্যুনিজমকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলো। এলিয়ট বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলছেন,

ওই ধরনের পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যবস্থা মানবিক মূল্যবোধের মারাত্মক বিপর্যয় সূচনা করে। মানুষের এদিনের সঞ্চিত মূল্যবোধ উল্টিয়ে ফেলে দিয়ে অসঙ্গত জীবনধারার সপক্ষে বক্তব্য তুলে ধরে। 'কম্যুনিজম', তাঁর মতে, 'ওই ব্যবস্থার চেয়ে অধিকতর সুখপ্রদ জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলে। বিশেষত: সাধারণ মানুষের বেলায় সেটি প্রযোজ্য।' কারণ কম্যুনিষ্টরা not only feed the hungry, and clothe the naked, but remove the feeling of 'boredom' which is what the average man cannot stand.

রাজনীতি সম্পর্কে এলিয়টের চিন্তাধারা

রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ব্যক্তি বিশেষের মানবিক মূল্যায়নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ব্যক্তি বিশেষের মর্যাদা বিনষ্ট হয়। ব্যক্তি সমষ্টির অসঙ্গত চাপে পড়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। ব্যক্তির বিকাশ বিঘ্নিত হয়। সংখ্যাগুরুর অত্যাচার থেকে বিপদ নেমে আসে। শুরু হয় জনতার একনায়কত্ব।

The mass can more effectively stiffle individuals than totalitarianism.

জনতার উচ্ছৃংখল আচরণ ব্যক্তির বিকাশের পথে ভয়ংকর দেয়াল রচনা করে। এক্ষেত্রে অবশ্য এলিয়ট গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি মনে করেন সত্যিকারের গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় এ অবস্থার অবসান নিশ্চিত করা উচিত। কথাটা গণতন্ত্রবিরোধী মনের পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে এলিয়ট গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যদিও সাধারণ অর্থে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

তবু বলা যায়, তিনি গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী। আর গণতন্ত্রের ব্যাপারে তাঁর মত সুস্পষ্ট : 'আসল গণতন্ত্র সর্বদাই বাধাবন্ধনযুক্ত গণতন্ত্র। এর বিকাশ কেবলমাত্র বংশানুক্রমিক অধিকার ও দায়িত্বের মাধ্যমেই সম্ভবপর।' [The Criterion, Vol. viii. December, 1921]

তিনি প্রচলিত রাজনৈতিক শ্লোগান-এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর নিজস্ব মতবাদ প্রকাশ করে বলেছেন :

The emotional excitements which political slogans [Communism, Fascism, Republic-canism, Nationalism] arouse seem to be a crude substitute for the loss of religious emotions.[The criterion, vol. viii, Dec. 1928]

সাধারণত: লেখকদের বেলায় যা ঘটে, এলিয়ট রাজনীতির ব্যাপারে অনাগ্রহী ; তাঁর আগ্রহ ছিলো রাজনৈতিক ভাবধারা সম্পর্কে।

কম্যুনিজম-এর প্রাথমিক স্তর—যে স্তর মানুষের পার্থিব সমস্যার সন্ধান দেয়, এ নিয়ে তিনি প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছেন। তবে কম্যুনিজমকে যখন অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের স্তরে নিয়ে আসা হয়, এলিয়টের কণ্ঠ তখন প্রতিবাদমুখর। তিনি ওই ধরনের বিশ্বাসকে 'মিথ্যাচার' বলে মনে করেন।

এলিয়ট প্রসঙ্গক্রমে এ'ও বলেন, the same is true of Fascism and of extreme nationalism. [The Criterion, viii, 1928, P. 282]

তবু বলা যায়, এখানে এলিয়ট সম্পূর্ণ নির্ভুল নন। ফ্যাসীবাদ ও চূড়ান্ত জাতীয়তাবাদ কম্যুনিজমের সযোচ্চারিত শত্রুবাদা হতে পারে না। কম্যুনিজম হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। ব্যক্তির নিপীড়ন থেকে সমষ্টিকে রক্ষা করার এক মানবিক দলিল। ফ্যাসীবাদ ওই ধারার ব্যতিক্রম। চূড়ান্ত জাতীয়তাবাদও তাই।

তিনি রাজার শাসনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সম্ভবতঃ বৃটিশদের রাজ-প্রীতি এলিয়টের মনেও দোলা জাগিয়েছিলো। বৃটিশদের দৃষ্টিতে রাজতন্ত্র হচ্ছে কর্তার ঐশ্বরিক সূত্রের পার্থিব বিকাশ। এলিয়ট প্রবর্তন করলেন the idea of loyalty to a king who incarnates the idea of the Nation. [The Criterion, VIII, July 1929, P. 690]

রাজতন্ত্রের প্রতি মানুষের আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এলিয়ট-এর যে মতাদর্শ রয়েছে, তা হচ্ছে, তাঁর মতে "সত্যিকারের বৈপ্লবিক ভাবধারা—পক্ষান্তরে ফ্যাসীবাদ কিংবা কম্যুনিজম নতুন কিছুতো নয়ই—বিপ্লবাত্মকও নয়।" [The Criterion, VIII, July 1929, P. 691]

উপরোক্ত মতবাদের সাথে সেণ্ট অগাস্টাইন-এর The City of God ও কিয়ের্কেগার্ড-এর The Present Age (1846) গ্রন্থে বিধৃত রাজনৈতিক মতবাদের মিল রয়েছে। এলিয়ট তাঁর Essays, Ancient and Modern গ্রন্থের ১২৩ পৃষ্ঠার বলছেন, 'ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ ধারণাপোষণকারী ব্যক্তি হোন—তিনি ফ্যাসিবাদী অথবা কম্যুনিষ্ট অথবা গণতন্ত্রী অথবা যুক্তিবাদী, যে নামেই নিজেকে ডাকুন না কেনো, তার আদর্শ সর্বদা নীচু মানের এবং প্রত্যাশা উর্ধ্বগামী।'

১৯৩৩ সালে এলিয়ট যুবকদের বিপথগামী হওয়া সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছিলেন। তিনি দেখলেন তাদের অধিকাংশই উদ্দেশ্যবিহীন, ওদের মাঝে রয়েছে হতাশার দীর্ঘশ্বাস। এ অবস্থার জন্যে দায়ী মৌলিক কারণসমূহ জরীপ করার পরে এলিয়ট সিদ্ধান্তে পৌছুলেন, it is far better to be stupid in a faith, than to be stupid believe nothing.' [The Criterion, XII, April 1933, P. 472]

রাজ-আনুগত্য বা থিওরি বা Theory of royalism প্রকৃতপক্ষে এলিয়টের কোনো প্রকার রাজনৈতিক আদর্শ নয়। বরং বলা চলে, তত্ত্বগত দিক থেকে এ হচ্ছে তাঁর মানসিক প্রক্রিয়া, ধারণা, নিজস্ব অথবা ব্যক্তিগত মতাদর্শ। আর এসব বকথা বলার পরে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে : রাজনীতির সাথে মানবিক সম্পূর্ণতা অর্জনের যে সাধনা এর সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্ম-বিশ্বাস মানুষকে ওই স্তরে পৌছুতে সাহায্য করে।

তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে সাফল্য আশাবাদ সম্ভবপর এবং তা কেবলি ক্ষুদ্র, কেবলি সাফল্য। তিনি আরো মনে করেন, পার্থিব এবং বস্তুতান্ত্রিক সরকারের উৎপত্তির মূলে রয়েছে মানুষের স্বাভাবিক পাপপ্রবণতা।

রাজনীতি সত্যিকার অর্থে মানুষের আত্মিক মুক্তির সন্ধান দিতে পারে না। রাজনৈতিক কোলাহলে মানুষকে ক্রমিক পর্যায়ে আত্মিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর ওই অবস্থা থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে ধর্ম-বিশ্বাস। এবং এসব হচ্ছে এলিয়টের সামাজিক ও রাজনৈতিক থিওরীর গোড়ার কথা।

প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্তিবিশেষের আত্মিক মুক্তি সম্পর্কে এলিয়টের বক্তব্য থেকে অংশ-বিশেষের উদ্ধৃতি দেয়া আবশ্যকবোধ করছি :

What ultimately matters is the salvation of the individual soul. You may not like this principle; but if you abjure it, you will get something you like less. The world

lends now to scramble for its salvations by taking a ticket (Moscow). [The Criterion, XIII April 1934, 1453]

কারো কারো মতে রোমান্টিক বিষণ্ণতার সাথে অস্তিত্ববাদের ANGST বা হতাশার প্রতিধ্বনি রয়েছে। বাহ্যিক দিক থেকে হয়তো কথাটা মিথ্যেও নয়। রোমান্টিক বিষণ্ণতার সূত্র সম্পর্কে শেলীর বক্তব্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর সূত্র হচ্ছে, the desire of the moth for the star. অথচ গভীরতর অর্থে রোমান্টিক বিষণ্ণতার সাথে অস্তিত্ববাদী উদ্বিগ্নতার কোনো সম্পর্ক নেই।
অস্তিত্ববাদী উদ্বিগ্নতা হচ্ছে, a product of Christain notion of Original sin.
মানুষের নিজস্ব অস্তিত্বের মৌল কাঠামোর ভেতরে রয়েছে অপরাধ, উদ্বিগ্নতা, হতাশা। অথবা এও বলা যেতে পারে ওসব হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বের অন্তর্গত উপাদান। ব্যক্তিবিশেষ এহেন অবস্থায় বাইবেলের অমিয় বাণীর মধ্যে খুঁজে পেতেও পারে তার মানসিক সান্ত্বনার সূত্র:
He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.

এক কথায়, রোমান্টিকতার সাথে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অস্তিত্ববাদের বিরোধিতা বর্তমান। জীবন সম্পর্কে ধর্মীয় মতবাদে ট্র্যাজিক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। জীবন অর্থহীন অযৌক্তিক এবং শূন্যতার প্রতিধ্বনি। জীবন ধারণের মাধ্যমে মানুষের কোন স্বার্থকতা নেই। তেমনি জীবন দিজেও অস্বার্থক ও অপ্রয়োজনীয়। যার এ হচ্ছে জীবনকে পার্থিব কিংবা বস্তুগত দিক থেকে পর্যালোচনা করার ফলাফল।
আরেক দিক—আধ্যাত্মিকতার দিক, সম্পূর্ণ ভিন্নধরনের। এখানে জীবন অর্থবহ। মৃত্যু এখানে মহাজীবনের দরোজা মাত্র। এখানকার দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়ে এর বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। মৃত্যুর দরোজা পেরিয়ে যে জীবনের অবস্থান তাই হচ্ছে সত্যিকারের স্থায়ী জীবন। অতএব অংশবিশেষের আলোকিত কিংবা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক দিয়ে মহাজীবনের মূল্যায়ন সঠিক হতে পারে না।
অস্তিত্ববাদ religious classical-tragic দৃষ্টিভঙ্গীর সমপর্যায়ে। কথাটা T.E. Hulme-এর The Speculation-এ বিধৃত। তিনি এলিয়ট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন:
Eliot stated that our present day ruin is the external sing of a world religious Crisis, and that modern history can also be understood as a metaphysical tragedy.

আর্ট-এর আর কি কাজ থাকতে পারে যদি না এ ট্র্যাজেডীকে তুলে ধরতে পারে-----
[A London conversation with T.S. Eliot. P. 280]
বিষ্ণু দে বলছেন:

'বিজ্ঞান বিরোধী তিনি গতিশীল জীবনে কোনো ডায়ালেকটিক্সের স্থান ধরতে পারেন না। সমস্যাটা একেবারে নতুন নয়। টমাস ব্রাউন এই সমস্যার শিং ধরে সমাধান করেন নিজের মতো, ধর্মে তাঁর বিশ্বাস নেতিবাচক ছিল না, বিজ্ঞানেও ছিল আস্থা; তিনি ভিন্ন স্বতন্ত্র ন্যায় বিশ্বের মতবাদে সমাধান খুঁজে পান যাতে আধ্যাত্ম ও বিজ্ঞান দুইই বিশ্বাস্য। মনটেনের সমাধানও প্রায় এই রকম যদিচ তাতে জিজ্ঞাসার ভারটাই বেশী। মিলটন বৈজ্ঞানিক যুক্তিই এক চেটে ভক্ত ছিলেন।

তাই তাঁর ঈশ্বর প্রায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির রূপক বললেই হয়। যেকনাতো বৈজ্ঞানিক। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরায় সেকালে ডনের কান্নাকাটি খুব করুণ—এও নিউকিনসফি কলস্ অল্ ইন্ ডাউট। এলিঅটের অবস্থা প্রায় ডনের মতো; মনের গঠনে নেই অধ্যাত্মজীবীর ঐশ্বর্য, তবু তিনি ধর্মবাদী স্বামী বন্দোবস্তের মরিয়া ভক্ত। কৃষ্ণ ব্যাপারটা জানলে হয়তো বলতেন, যে জ্ঞানে সর্বজীবের বিবিধ জীবনধারা বিচ্ছিন্নরূপে প্রতিভাত, সে গুণ বাসনা দুষ্ট।

কিন্তু না অধ্যাত্মজীবীর ঐশ্বর্য তাঁর মনে, তাঁর প্রাণে, এবং ওই ঐশ্বর্যের আলোকধারা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে করে তুলেছে স্বচ্ছ—স্ফটিকের চেয়ে স্বচ্ছতর। ব্যক্তিগত জীবনে, চেতনার প্রবাহে, সাধনার সৌকর্যে এবং একাগ্রতায় তিনি সত্যিই অতুলনীয়। তিনি যে শিল্প ও ভাবনার আরাধনা করেছেন সেসব হচ্ছে নির্খাদ, নির্ভেজাল। পার্থিব আকাঙ্খার মৃত্যু তিনি চাননি। কিংবা এ'ও চাননি, মনুষ্যের সামগ্রিক সত্তার কোনো প্রকার অবমূল্যায়ন হোক। তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আমাদের ব্যক্তিগত নিয়তি বৃহত্তর মানব সত্তার নিয়তি থেকে আলাদা কিছু নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, কোনো মানুষ যতো বেশী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে ক্ষমতাসম্পন্ন ততো বেশী তার পক্ষে মানব জাতির সাথে একাত্মতা অর্জন ও বিকাশের পথ সুগম করা সম্ভবপর।
এলিয়ট তাঁর সমগ্র সৃষ্টিব্যাপী চেষ্টা করেছেন ঈশ্বরের সাথে মানুষের যোগাযোগের পথ চিহ্নিত করার জন্যে। A Song for Simeon এবং Little Gidding কাব্যে হিরাক্লিটাসের বাণীর প্রতিধ্বনি করেছেন:

Those who do not die, die, those
Who die, do not die: of one another
They live the death and die the life.

এলিয়ট তাঁর সৃষ্টিতে মানুষের মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা, অবিমৃষ্যকারিতা, অতৃপ্তি প্রভৃতি উন্মোচন করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি ওই সবের পর্দা অপসারণ করে সমগ্র মানবজাতি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। আর এর অন্তরালে যে ইতিহাস রয়েছে—রয়েছে মানবাত্মার ক্রন্দনধ্বনি আর্তনাদ ও বিভীষিকা। তিনি সেসবের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। 'পোড়ো জমিতে' মানবাত্মা নিঃসঙ্গ। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয়, এলিয়ট মানবাত্মার নিঃসঙ্গতাকেই প্রকট করে তুলেছেন, সমাধানের তেমন একটা ইঙ্গিত প্রদান করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে, ওই ধরনের অভিযোগ সত্যি নয়। তিনি মনে করতেন সাহস ও ইমানই কেবল ('বিশ্বাস' শব্দটা একেবারে যথার্থ মনে হয়নি।) মানুষের মুক্তির সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে পারে। এলিয়ট মহৎ জীবন-শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে আমাদের বোধ ও চেতনা শক্তিকে সে-সবের দিকে ধাবিত করতে চেয়েছেন।
তিনি মনে করেন, কোনো শিল্পকর্মই শিল্পকে কিছুটা রদবদল না করে পারে না। আর তা শুধু বর্তমান ও ভবিষ্যতকেই কিছুটা রদবদল করবে না বরং অতীতকেও তাই করে। ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর এ ধারণা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। ঐতিহ্য মানে পুরনো পদ্ধতিকে গ্রহণ করা নয়। ঐতিহ্য হচ্ছে ইতিহাসের মতো যা হচ্ছে humanity's memory of its our past এবং এ কারণেই এলিয়ট বলেছেন, Conscious present is an awareness of the past.

তিনি ছিলেন উঁচুদরের প্রজ্ঞাসম্পন্ন লেখক। এলিয়ট সম্পর্কে বলা হয়েছে:

he brought into poetry something which in this generation was needed: a language spare, sinewy, modern; a fresh and springy metrical form; thought, was adult and imagination aware of what is bewildering and terrifying in modern life and in all life.

উপরোক্ত মন্তব্য সঠিক ও যথার্থ। তিনি তাঁর সমকালীন কবিদের যে কারো চেয়ে নিজস্ব যুগ-সচেতনতাবোধ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে অধিকতর অবদান রেখেছেন। আধুনিক কালের কোনো সমালোচকই সাহিত্য পিপাসুদের মনের উপরে এলিয়ট-এর মতো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। এবং আবার বলা যায়, এলিয়টের মতো কোনো কবিই জীবিত অবস্থায় এতো অধিক পরিমাণে বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হননি।

বিশ্ব-সাহিত্যে নজরুল ইসলাম

অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

সাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপ কি এবং বিশ্ব-সাহিত্য বলতে কি বোঝা যায় এ-সব প্রশ্নের সমাধানের উপরই উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত মন্তব্য করা সম্ভবপর। সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন সম্বন্ধে নানাবিধ সংজ্ঞা ও মতবাদ প্রচলিত থাকায় কোন সর্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছা সম্ভবপর নয়। তবে মানব জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত এ তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত বিষয়ে যে মানবজীবনেরই একটা অনিবার্য অভিব্যক্তি, সে সম্বন্ধে তর্কের অবকাশ নেই। জীবনের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিধিরও যে বিস্তৃতি হয় এটি একটি অতি প্রত্যাশিত বিষয়। অপরদিকে পরিবেশের প্রভাবের ফল হিসাবে বা তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সাহিত্যের সঙ্গে পরিবেশের সম্বন্ধও তর্কাতীত। তবে এ সবই সাহিত্যের বাহ্যিক প্রকাশ এবং তার বাহ্যিক কারণ সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের ফল। সাহিত্যের জন্ম মানুষের অন্তর-সত্তায়। তা থেকেই বহির্বিশ্বের নানাবিধ কারণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তা প্রকাশ পায় নানাবিধ শৈলীর মাধ্যমে। এজন্য সাহিত্যের মৌল উৎসের সন্ধান করতে হলে মানব-জীবনের বিশ্লেষণও হয়ে পড়ে অনিবার্য। কী রয়েছে সে জীবনে—যা থেকে যুগে যুগে কত মানুষ নানাবিধ সৃষ্টিতে এ ধরণীকে সমৃদ্ধ করেছেন? এখানেও সে আদি সত্তার প্রশ্নে মতভেদ দেখা দেবে জানি। যৌন-আকাঙ্ক্ষা, যুদ্ধ-স্পৃহা, শক্তিলাভের বাসনা প্রভৃতি একক প্রবৃত্তির আলোকে সে জীবনকে ব্যাখ্যা করা অতি আধুনিক-কালে একটা ফ্যাশান। অথবা মানব-জীবনের বা মানব-মানসের অতল তলায় প্রবেশ না করেও বলা যায়, ওগুলো তাতে রয়েছে নিঃসন্দেহে। তবে এদের কোনটাই মানবজীবনে একমাত্র কার্যকরী প্রবৃত্তি নয়। এদের মাধ্যমে মানব-জীবনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাতে অনিবার্যভাবেই বহু সব সময়ই অমীমাংসিত থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি, বৃত্তি বা বুদ্ধি যা কিছু অধিকতর সামগ্রিক, তাকেই ব্যাখ্যার মাধ্যম হিসাবে নেয়া বটেই, জীবনের মৌল উপাদান হিসাবেও অধিকতর সফল প্রবৃত্তি বলে গণ্য করা যায়। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আত্মসংরক্ষণই মানব-জীবনের আদি ও মৌলিক প্রবৃত্তি। সে আত্মসংরক্ষণই প্রথম পর্যায়ে আত্মরক্ষা, ও পরবর্তী পর্যায়ে আত্মপ্রতিষ্ঠারূপে দেখা দেয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, যূথচারী প্রবৃত্তি প্রভৃতি বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলো আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠারই নানাবিধ বৃত্তি হিসাবে মানব-জীবনকে তার লক্ষ্যের পানে পরিচালনা করে। আত্মসংরক্ষণ জীবনের সূচনাতে আত্মরক্ষা হিসাবে এবং তার পরিণতিতে যুদ্ধস্পৃহা, শক্তি লাভের বাসনা, অভয় বোধ, আত্মশ্লাঘী হওয়ার বাসনা, প্রবৃত্তি প্রীতি প্রভৃতি উপবৃত্তি হিসাবে দেখা দেয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে-যৌন-আকাঙ্ক্ষা, যূথচারী প্রবৃত্তি, পরার্থপরতা, অপত্য ও বস্তু-স্নেহ, প্রকৃতির রহস্য ভেদের বাসনা, পরলোক সম্বন্ধে আগ্রহ প্রভৃতি উপবৃত্তিগুলো। এদের বিশ্লেষণ মানসিক দিক থেকে সম্ভব হলেও জীবনে

তারা অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। সুদূর অতীতে বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও আধুনিক যুগে সে আদি বৃত্তিগুলোর প্রতিপত্তি স্বীকৃতি লাভ করছে। জীবনের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের সবগুলোর অস্তিত্বই স্বীকার করতে হয়।

এ সব বৃত্তির সন্তোষবিধানের প্রয়াস অথবা ব্যর্থতার চিত্র সাহিত্যে অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। সাহিত্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ভর করে সে চিত্র অংকনের সাফল্যের উপর। তবে তার চেয়েও আরও প্রণিধান-যোগ্য বিষয় হচ্ছে মানবজীবনের প্রকাশের চেষ্টাতে সাহিত্যের সর্বাঙ্গীনত্ব, যে সাহিত্যে মানব-জীবনের বিভিন্ন দিক যত বেশী প্রতিফলিত হবে, সে সাহিত্যই হবে অধিকতর সফল। 'একদেশদর্শী' সাহিত্যে মানব-জীবন দেখা দেবে—ঠুটোজগন্নাথের মত।

বিশ্ব সাহিত্যের আলোচনায় এ তত্ত্বই আমাদের কাছে অতিশয় সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কালের ধ্বংস স্রোত পার হয়ে বিশ্ব-সাহিত্যে আজও যাঁরা সম্মান ও অটুট হয়ে টিকে রয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির মূলে রয়েছে জীবনের সমগ্র দিককে প্রতিফলন করার প্রয়াস। হোমার, বাল্মিকী, শেক্সপীয়র বা গ্যেটের সাহিত্য সাধনার সার্থকতার মূলে রয়েছে জীবনকে সর্বাঙ্গভাবে গ্রহণ করার প্রবণতা। জীবনের পরিবেশের পরিবর্তন নিত্যই ঘটেছে এবং জীবনকে বাধ্য হয়েই তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হচ্ছে। তবে জীবনের মৌলিক উপাদানের কোন বিশেষ পরিবর্তন হয়নি বলে, এ সব স্রষ্টাদের সৃষ্টি তাদের মূল্য হারায়নি। এজন্য এদের সৃষ্ট চরিত্রে পরিবেশের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, আমরা আমাদের জীবনের এক একটি বৃত্তির বা প্রবৃত্তির প্রতিনিধির সাক্ষাৎ পাই এজন্য বিশ্ব সাহিত্যকে তো বটেই, সকল সাহিত্যকেই রূপক বলা যায়। বিশ্ব সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত যে কোন সাহিত্যের আলোচনায় এ বিষয়টিই বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শেক্সপীয়রের নাটকগুলো কেন আমাদের কাছে আনন্দের বিষয়? এ প্রশ্নের উত্তর শেক্সপীয়র সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। অযানুষিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাড়িত ম্যাকবেথ, কন্যাদের কর্তৃক প্রতারিত রাজা লীয়ার, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ভাবনা বিভোর রাজকুমার হ্যামলেট, প্রণয়বিধুর ওথেলো, বিশ্ব প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী প্রসপেরো মানব-জীবনেরই এক একটা প্রবৃত্তির প্রতিনিধি। সে বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলো মানুষের রূপ ধরে এ জীবনের রঙ্গ-মঞ্চে দেখা দিচ্ছে। সে রঙ্গমঞ্চের পরিবেশের পরিবর্তন হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তবে যে সব মানসিক দিকের তারা প্রতিনিধিত্ব করছে সেগুলোর পরিবর্তন হয় নি। এ বক্তব্যের পোষকতায় সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার চমৎকার মন্তব্য করেছেন:

> জীবন যেমন বাহিরের দিকে নিত্য পরিবর্তনশীল, সাহিত্যেও আমরা তেমনই প্রকাশভঙ্গির নবত্ব লক্ষ্য করি। তৎসত্ত্বেও সাহিত্য যে সর্বযুগে এক, তাহার প্রমাণ হোমার বাল্মীকির কাব্য এখনও যে কারণে অমর হইয়া আছে চিরদিনই তেমনই থাকিবে। সাহিত্যের তথা জীবনের নিত্যবস্তু কি তাহার একটু আলোচনা এই প্রসঙ্গে করিতে পারিলে ভাল হইত।*

মানসের গভীরে প্রবেশ করলে তিনি দেখতে পেতেন সে আর কিছু নয় মানবজীবনের বিভিন্ন বৃত্তি ও প্রবৃত্তির চিরন্তনতা। হোমার বা বাল্মীকির রচনায় আমরা এ তত্ত্বেরই উদাহরণ পাই। আমাদের অতি পরিচিত রামায়ণের মধ্যে রাজা দশরথ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য পুত্র কামনা করে তাতে সফল হয়েছেন, সে পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করার কালে তাঁর বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত

* সাহিত্য বিচার : মোহিতলাল মজুমদার : পৃঃ ১১০

করার উদ্দেশ্যে আবার বৈদিক শাসনকে শ্রদ্ধা করতে যেয়ে, তাঁকে দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর বনবাসে প্রেরণ করতে বিমুখ হতে পারেন নি। যে আদর্শ পুত্র রামকে নির্বাসনে পাঠিয়ে আঘাত সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেছেন, সে রামকে ধর্মীয় গণ্ডি থেকে বের করে বিচার করলে তাঁর চরিত্রে এ্যাডলার (Adler) বর্ণিত শক্তিলাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। যে শক্তির প্রয়োগ করে তিনি বনবাসকালে কত প্রাণী হত্যা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তিনি আচারে আচরণে ঘোরতর শাক্ত। মাংস ব্যতীত অন্য আহারে তাঁর রুচি নেই। তবে সীতার মনে ভার্যাইতর নারীসম্ভোগের কোন কামনা নেই। এখানে তাঁর চরিত্রে দেখা দিয়েছে আদর্শ নিষ্ঠা। তবে তাঁর চরিত্রে মানব-সুলভ দ্বান্দ্বিকতা পূর্বাপর রয়ে গেছে।

তিনি রাজনীর চাল পরিবর্তন করেননি। সীতাকে উদ্ধার করার উপায়স্বরূপ তিনি বালী ও সুগ্রীবের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছেন। এক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভ্যালি প্রচারিত লক্ষ্যের আলোকেই উপায়ের যাথার্থের বিচার হওয়া উচিৎ (The end justifies the means) নামক নীতিকে গ্রহণ ক'রে তাঁর মানসিক জগৎকে প্রকাশ করেছেন। তেমনি অপাপবিদ্ধা জেনেও প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে বিসর্জন দিয়েছেন। এতে অতি আধুনিক প্রজাতন্ত্রের নীতির প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার নিদর্শন রয়েছে। এগুলো রামচরিত্রের মধ্যে দেখা না দিলে হয়ত রাম অবতাররূপে এখনও টিকে থাকতেন, তবে মানুষ বলে তার কোন পরিচয় পাওয়া যেতো না। বুদ্ধদেব বসু সত্যিই বলেছেন :

> পৃথিবীর আদি মহাকাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য আমি যা' বুঝেছি, তার নাম দিতে পারি বাস্তবতা, সে বাস্তবতা এমন সম্পূর্ণ, নিরাসক্ত ও নির্মম যে তার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্য রিয়ালিজম-এর চরম নমুনাও মনে হয় দরার্দ্র। যাকে বলা যায় সম্পূর্ণ সত্য, মহাকাব্য তারই নির্বিকার দর্পণ, মহাকাব্যে ট্র্যাজেডির মত্ততা নেই, কমেডির উজ্জ্বলতা নেই ; তাতে গলা কখনো কাঁপে না, গলা কখনো চড়ে না ; বড়ো ঘটনা আর ছোটো ঘটনায় ভেদ নেই —সবটাই সমান, আগাগোড়াই সমতল এবং সবটা ঈষৎ ক্লান্তিকর।

ক্লান্তিকর তো বটেই কারণ যা' অশোভন, মানুষ যাকে পরিহার করতে চায়—সে দিকটা যত জঘন্যই হোক না কেন, তাতে প্রতিফলিত হয়। একারণেই তাকে মানবজীবনের সম্যক অভিব্যক্তি বলা যায়। একারণেই এসব মহাকাব্য কালের করাল ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে, যুগযুগান্তে আপনার মহিমা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। উপরোক্ত আলোচনাতে আমরা যে সূত্রের সন্ধান পাচ্ছি তা কেবল মহাকাব্য সম্বন্ধে সত্য নয়—মহাচিত্রণ সম্বন্ধেও সত্য। বিশ্ব সাহিত্যে আজও যে সব সৃষ্টি ক্লাসিক হিসাবে শ্রদ্ধা লাভে সমর্থ, তাদের সকলগুলোর সেই একই রীতির রূপায়ণ দেখা যায়।

২

নজরুল ইসলামকে বলা যায় বাংলার বিদ্রোহী কবি। শান্ত সমাহিত শ্যামল বাংলার বুকে তিনিই সর্বপ্রথম বিদ্রোহের সুর আমদানী করেছেন বলে তাঁকে বলা হয় বিদ্রোহী কবি। এ উপাধি নজরুল ইসলামের গৌরব বাড়ুক না নিন্দা বাড়ুক বোঝা কঠিন। একথা অবশ্য সত্যি যে

> 'প্রচলিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, রীতি, নীতি, সংস্কার ইত্যাদি সব কিছুর বিরুদ্ধেই তিনি সর্বদা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য এ সবই বিদ্রোহের লক্ষণ। কিন্তু তাই বলে যদি তাঁর একমাত্র পরিচয় দাঁড়ায় যে তিনি বিদ্রোহী কবি ; তা'হলে তার কবিকৃতির প্রতি খুব সুবিচার করা

হবে না ।...এখন খুব স্পষ্ট করার বলা দরকার যে বিদ্রোহ তাঁর কবিতার একটি বৃহৎ লক্ষণ বটে, কিন্তু একমাত্র লক্ষণ নয় তাঁর কবিতার, আর একটি প্রধান উপাদান ভালবাসা।'

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এ বক্তব্য খুবই সত্য। তবে তাঁর বিদ্রোহের পাশে প্রেমের পরিচয় দিলেই তাঁর সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয় না। আরও নানাদিক তার কাব্যে এত পরিস্ফুট যে তাদের সঠিক বর্ণনা না দিলে নজরুল ইসলামের পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 'নজরুল-স্মৃতি' নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃত নানাবিধ প্রবন্ধ থেকে তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ রয়েছে। তাতে কেউ নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী, কেউ প্রেমিক, কেউ মানবতাবাদী, কেউ শ্রেণী সংগ্রামশীল, কেউ মরমী, কেউ সাধক ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। এতে নজরুলের জীবনে যে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, তাও অতিশয় স্পষ্ট। কারণ তাঁর কাব্য জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি পরস্পর-বিরোধী ভাবধারাও প্রকাশ করেছেন। নজরুল-জীবনের নির্বাক পর্যায়ের পূর্ববর্তী পর্যায়ে এ নিয়ে তাঁকে কোন মহল থেকে বিদ্রূপাত্মক কটূক্তি করাতেও ত্রুটি হয়নি। তবে নজরুল 'আমার কৈফিয়তে' তার জওয়াব দিয়ে তা' খণ্ডন করার চেষ্টা করলেও, ওরা তাঁর পিছনে সর্বদাই ফেরুপালের মত লেগেই ছিলেন। ওদের দৃষ্টিভঙ্গি খুব সীমিত ছিল বলেই তাঁরা নজরুলের কাব্যে অবরোহ বা আরোহের নীতিগুলোর ব্যতিক্রম দেখে বিস্ময়ে যতটুকু অভিভূত হয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী সুখী হয়েছিলেন নজরুল ইসলামের মধ্যে অসামঞ্জস্য আবিষ্কার করার সার্থকতায়। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন এ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানকে যখন তাঁর কাব্যের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব প্রদর্শন করা হল তখন তিনি আনন্দের আতিশয্যে বলে ওঠেন: জীবনটাই তো একটা দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলতে চেয়েছিলেন—জীবনের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব রয়েছে তখন কাব্যে তার প্রতিফলন হবে অনিবার্যভাবে, এতে বিস্মিত বা বিক্ষুব্ধ হওয়ার কোন কারণ নেই। এভাবে যাঁরা একটি বিষয়ে গৃহীত সূত্রকে অপর বিষয়ের সূত্র হিসাবে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের এবংবিধ ভ্রান্তিকে অতি আধুনিক দর্শনে বলা হয়--category mistake. অর্থাৎ যেখানে যা' হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই সেখানে তা প্রত্যাশা ক'রে সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা সে ভ্রান্তির মূলে রয়েছে। সুসামঞ্জস্য নীতি হিসাবে ন্যায়শাস্ত্রে বা দর্শনে শৃঙ্খলান্বিত, কাব্যজগতে তার কোন স্থান নেই। কাজেই কাব্যজগতে তার প্রাপ্তির আশা সেরূপ একটি ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কাব্য মানব-মানসের প্রকাশ বলেই তার মধ্যে মানবজীবনের নানাবিধ বৃত্তি ও প্রবৃত্তির দাবী, সন্তোষ ব্যর্থতা তাতে প্রকাশ পাবেই পাবে। গোলাপের মধুর গন্ধে বিভোর হয়ে যে কবি এ বিশ্ব সম্বন্ধে আশার বাণী প্রকাশ করেন, সে কবির মানসে ঝরা গোলাপের ব্যথায় অশ্রুর বন্যা বয়ে চলে। কাজেই কবিগণ মানব-মানসের প্রতিনিধি বলে, তাঁদের মানসে কেবলমাত্র একই ভাবের উদয় হবে এবং তারই অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা ন্যায় শাস্ত্রের বিধান অনুসারে পরিচালিত হবেন, এমন কোন দাসখৎ কোন কবিই পূর্বাহ্নে লিখে দেননি।

নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে তাই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তিনি কোন ভাবের বা আদর্শের কবি নন, তাঁর সম্বন্ধে আসল প্রশ্ন তিনি বাস্তবিকই মানব-মানসের সত্যিকার প্রতিনিধি কিনা এবং সে মানসের বিভিন্ন দিকের সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব তিনি করেছেন কিনা। তাঁর সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্বকবি বা বিশ্ব সাহিত্যিক হিসাবে যাঁরা সাহিত্য জগতের শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন তাঁর অবদান সে-সব কবি বা সাহিত্যিকের অবদানের সম পর্যায়ের কিনা? এস্থলে আরও একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন—এ বিশ্বের মহাকাব্য বা সত্যিকার উপন্যাসে মানব-চরিত্র চিত্রণের যে সুবিধা দেখা দেয়, খণ্ড

কাব্যের মধ্যে সে সুবিধা নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় হোমারের 'ইলিয়ড বা ওডিসি' তে মানব-চরিত্র চিত্রণের যে পরাকাষ্ঠা দেখা যায়, অথবা টলষ্টয়ের ওয়ার এণ্ড পীসের মধ্যে তার যে সার্থকতা দেখা যায়, খণ্ড কাব্যে বা ছোট গল্পে তেমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এজন্য মহা উপন্যাসকে এক পর্যায়ের এবং লিরিক কবিতা ও ছোট গল্পকে অন্য পর্যায়ের সৃষ্টি বলা যায়। কোন সফল ছোট গল্প-লিখিয়ের অনেকগুলো গল্পের সবটি একত্র করে যেমন তাঁর সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা সম্ভবপর হয়, তেমনি সার্থক খণ্ড কবিতার কবিগণের বিভিন্ন ধর্মী কবিতার মধ্যে অনু-প্রবেশ করে, তাঁর জীবন-দৃষ্টির ব্যাপকতার সন্ধান পেতে হয়। সোপানীয় বিভিন্ন গল্পে আমরা তাঁর সৃষ্টিকর্মের মূলসুর আবিষ্কার করতে পারি। সেটি হ'চ্ছে এ বিশ্বের নানাবিধ নীতিতে অমোঘতা। অর্থাৎ তাঁর নায়ক ও নায়িকারা দুইয়ে দুইয়ে মিলে চারই হয়। কোন অদৃশ্য এক কারণের ফলে কোথাও না তিন আবার কোথাও বা পাঁচ হয়ে যায় না। খণ্ড কাব্য রচয়িতাগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি অতি উচ্চ আসনের অধিকারী। তাঁর বিভিন্ন রচনার সমুদ্র মন্থন করলে যে অমৃত ভেসে ওঠে তা হচ্ছে মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের উপর অতি প্রখর আলোকপাত। সুখে-দুঃখে, উত্থানে-পতনে যে মানবজীবন কিভাবে অবস্থিত বিবর্তিত হ'চ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত যে তার জয় অনিবার্য, রবীন্দ্রনাথ তার অনিন্দ্যসুন্দর সৃষ্টির মাধ্যমে সে আশার বাণী আমাদের শুনিয়েছেন। যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানকে ভারতীয় দর্শনে প্রতিভাস বলে উপহাস করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বলোদৃপ্ত কণ্ঠে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করেছেন। 'তুমি নব, নবরূপে এসো প্রাণে, এসো গন্ধে বরণে এসো গানে' প্রভৃতি উক্তিতে তাঁর যে দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশিত হয়েছে। মানবজীবনের এমন কোন দিক নেই, যা তার সূক্ষ্ম দৃষ্টির ছিল বহির্ভূত। এজন্যই আজকের দুনিয়া তাঁকে ক্লাসিক হিসাবে গণ্য করেছে।

নজরুল ইসলামের সৃষ্টিতে সেরূপ সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান। তাঁর বিভিন্ন রচনায় মানব-জীবনের নানাদিক সম্বন্ধে এমন চমৎকার আলোকপাত হয়েছে, যার জন্য তাঁকে বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য অধিকারী বলা যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে—কাব্য বা গল্পের নায়ক নায়িকার রয়েছে একটা প্রতিনিধি মূলক representative চরিত্র। মানব-জীবনের এক একটা দিক তাতে প্রতিভাত হয়। সে প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে মানব-মানসের মৌলিক প্রবৃত্তি আত্মসংরক্ষণ। সে প্রবৃত্তিই প্রথম পর্যায়ে আত্মরক্ষা এবং পরবর্তী পর্যায়ের আত্মপ্রতিষ্ঠা রূপে দেখা দেয়। এ সব প্রবৃত্তির আবার উপ-প্রবৃত্তিও রয়েছে। আত্মরক্ষার উপ-প্রবৃত্তি হচ্ছে যুদ্ধস্পৃহা, শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা। অহমিকা, প্রকৃতি প্রীতি, সাথী হওয়ার বাসনা। আত্মপ্রতিষ্ঠার উপ-প্রবৃত্তি যৌনবাসনা, যুথ-চারী প্রবৃত্তি, পরার্থপরতা, অপত্য ও রক্ত স্নেহ, রহস্য ভেদে বাসনা, পরলোক সম্বন্ধে আগ্রহ প্রভৃতি।

আবার চেতনার জগতে বুদ্ধি, প্রক্ষোভ ও ইচ্ছা শক্তি নানাভাবে আমাদের জীবনে দেখা দেয়। বুদ্ধি সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে পরিচালনা করে এবং তার মধ্যে বিচার বোধ, ঐতিহ্য চেতনা, আদর্শ-বোধ প্রভৃতির অভ্যুদয় হয়। প্রক্ষোভের প্রকাশ হয় ভয় প্রেম ক্রোধ প্রভৃতি রূপে এবং ইচ্ছাশক্তির মধ্যেই আমাদের কামনাবাসনা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এ তিনটে বিভাগ পরস্পরের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে জড়িত যে একটিকে অপরটি থেকে তত্ত্বের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও বাস্তব জীবনে তাদের পার্থক্য আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। বুদ্ধি থেকেই প্রক্ষোভের উৎপত্তি, না প্রক্ষোভই বুদ্ধির সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে বলা খুবই কঠিন। বুদ্ধিকে ইচ্ছাশক্তির জনকও বলা যায় এবং তার পুত্রও বটে। নানাবিধ বৃত্তি ও

উপলব্ধি এবং চেতনার জগতে নানাবিধ ভাব দেখা দেয়। সেগুলো কখনও সন্তোষ লাভের জন্য লালায়িত, কখনও বা ব্যর্থতার মুহ্যমান, কখনও বা তার মধ্যে দেখা দেয় নানাবিধ সমস্যা। আবার আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মানব-মানস নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। কোথা থেকে এ ধরাধামে মানুষ দেখা দিল ? তার জীবনের পরিণতি কি ? পরকাল বলে কিছু রয়েছে কিনা ? সেখানে ব্যক্তি সত্তার স্থান কি ? প্রভৃতি প্রশ্ন দেখা দেয়। এ সকল প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা কোন কালেই হয়নি এবং কোন কালেই হবে না। তবে সকল কালেই এগুলো উত্থাপিত হবে এবং সকল যুগেই তাদের সমাধানের জন্য মানুষ যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

মহাকাব্যের রচয়িতাগণ অথবা মহা উপন্যাসের বা মহানাটকের স্রষ্টাগণের কর্তব্য হ'চ্ছে মানবজীবন অথবা মানব-মানস সে সব প্রশ্ন বা সমস্যা দ্বারা কি ভাবে আন্দোলিত হ'চ্ছে, তা মানব সমাজে তুলে ধরা। মহাকাব্যের রচয়িতা না হলেও খণ্ড কবিতা বা দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ হাফিজ প্রমুখের মত নজরুল ইসলাম যে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন তাতে তাঁকে বিশ্ব-সাহিত্যের অপর এক স্রষ্টা বলে শ্রদ্ধার্পণ করা যায়।

৩

মহাকবিগণের কাব্যে জীবনের সব দিকের আলোকপাত হয় বলে তার আলোচনা নানাদিক থেকে হ'তে পারে। যে-কোন দৃষ্টিকোণ থেকে, বা যে-কোন বৃত্তির আলোকে তাঁদের কাব্যের স্তরবিন্যাস হ'তে পারে। আবার কবি-মানসের অন্তর্গূঢ় সত্তার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ না করে, শুধু শুধু কালের ধারার অনুসরণ করেও তাঁর কবি-কর্মের বিভিন্ন সৃষ্টির আলোচনা হ'তে পারে। তবে এতে বাইরের কারণের প্রভাবই মাত্র রেকর্ড হবে। কবির মর্মমূলে যে-সব ভাব ছিল ক্রিয়াশীল তার সন্ধান তো নয়ই, এমনকি তাদের বুঝবার সংকেতও পাওয়া যাবে না।

নজরুলের কবি জীবনের সর্বপ্রথম স্তরবিন্যাস করেছেন কাজী আব্দুল ওদুদ। তিনি তাঁর কবি জীবনকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম স্তরে তিনি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা থেকে বিদ্রোহী প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয় স্তরকে বিদ্রোহী প্রকাশের পর থেকে রাজনৈতিক জীবনের অবসান পর্যন্ত বলে নির্দেশিত করেছেন। তৃতীয় স্তরকে তিনি তাঁর সঙ্গীত রচনার বিশেষ করে গজল গানের রচনার যুগ বলে অভিহিত করেছেন। চতুর্থ স্তরকে তিনি বলেছেন তাঁর যোগী জীবনের পর্যায়। একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে এ বিন্যাসের মধ্যে একটি ত্রুটি রয়ে গেছে। কারণ কোন স্তরেই তিনি একটি বিশেষভাবে বিভোর হ'য়ে সে-ভাবের বাণী প্রকাশ করেন নি। প্রতি স্তরেই বিভিন্ন জাতীয় ভাব-ধারা তাতে প্রকাশ পেয়েছে। তবে একথা অবশ্য সত্য কোন কোন স্তরের মধ্যে হয়ত কোন কোন ভাব প্রাধান্য পেয়েছে বলে এ বিন্যাস নিছক কাল্পনিক কোন কিছুও নয়। এজন্যই এতে নজরুলের কবি-মানসের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এতে কবি-মানসের মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় না। এজন্যই কালের ধারাতে তাঁর সৃষ্টি যে-ভাবেই প্রকাশিত হউক না কেন, তার আদি উৎসের আলোকে তাঁর সৃষ্ট কাব্যের পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন।

১৯২০ সালে নজরুল ইসলামের উত্থান কাল থেকে তার স্তব্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত, তিনি যে রচনাসম্ভারে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, তার আলোচনাপ্রসঙ্গে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তিনি আমাদের বিন্যাসমত মানব-মানসের বিভিন্ন ধারা অনুসরণ করে রচনায় প্রবৃত্ত হননি। এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিতে হয়ত কোন অতিশয় তুচ্ছ ভাবের প্রকাশ অতিশয় গুরুতর ভাবের প্রকাশের পূর্বে দেখা

দিয়েছে। তবে এ কথা অত্যন্ত সত্য যে, তিনি অপর সকল ক্লাসিক স্রষ্টার মত জীবনের নানাদিকের উপর আলোকপাত করেছেন এবং তাতে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাদের সমাধানের ইঙ্গিতও করেছেন। এজন্যই বিশ্ব সাহিত্যে তাঁর রচনার স্থান লাভের যোগ্যতা রয়েছে পূর্বেই বলা হয়েছে। আত্মসংরক্ষণের উপবৃত্তি হিসাবে যুদ্ধস্পৃহা, শক্তিলাভের আকাঙ্খা, অহম-বোধ, প্রকৃতিপ্রীতি, সাগ্রহী হওয়ার বাসনা অত্যন্ত প্রবল। নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'র মধ্যে কেবল এগুলোর অস্তিত্ব বা স্বস্তিলাভ প্রকাশ পায়নি আরও নানাবিধ বৃত্তির সন্তোষ লাভের উপাদান রয়েছে :

আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম-কানুন শৃঙ্খল!

[বিদ্রোহী]

মানব-মানসের যুদ্ধ-স্পৃহার এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শক্তিলাভের জন্য তার প্রয়াস ও সফলতার উদাহরণ রয়েছে তার নিম্নোক্ত উক্তিতে :

জগদীশ্বর ঈশ্বর-আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি
এ স্বর্গ পাতাল মর্ত্য।

[বিদ্রোহী]

'বিদ্রোহী'র অনেকগুলো পংক্তিতে অহমিকা বোধের প্রকাশ বিদ্যুতের আলোর মত ঝলোমলো :

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা।

[বিদ্রোহী]

প্রকৃতি-প্রীতির চমৎকার নিদর্শন রয়েছে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে :

আজ কাশবনে কে শ্বাস ফেলে যায়
মরা নদীর কূলে
ও তার হলদে আঁচল চলতে জড়ায়
অড়হরের ফুলে।

ঐ বাবলা ফুলে নাক-ছাবি তার,
গায় শাড়ী নীল অপরাজিতার
চলেছি সেই অজানিতার
উদাস পরশ পেতে।

মানব-মানসে সাশ্রয়ী হওয়ার যে আদিম প্রবৃত্তি রয়েছে তার চমৎকার প্রকাশ, নজরুলের চেতনায়। তিনি ভগবানকে উদ্দেশ করে বলছেন :

তোমার দন্ড হস্তেরে বাঁধে কার নিপীড়ন-চেড়ী ?
আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ী ?
ক্ষুধা তৃষা আছে,আছে মোর প্রাণ,
আমিও মানুষ, আমিও মহান।
আমার অধীনে এ মোর রসনা, এই খাড়া গর্দান !
মনের শিকল ছিঁড়েছি পড়েছে হাতের শিকলে টান—
এতদিনে ভগবান !

[ফরিয়াদ]

আত্মসংরক্ষণের উপবৃত্তি হচ্ছে আত্ম-প্রতিষ্ঠা। সে আত্ম-প্রতিষ্ঠার মধ্যে কোন-বাসনা একটি অত্যন্ত জোরালো বৃত্তি। যৌন-বাসনার পরিণতি সন্তান-লাভ। সে সন্তানের মাধ্যমেই মানুষ অমরত্ব লাভ করতে চায়। এ যৌনবাসনার প্রকাশ কবির ভাষায় অনুপম রূপ পরিগ্রহ করেছে :

সখি পাতিস্‌নে শিলাতলে পদ্মপাতা,
সখি দিস্‌নে গোলাব-ছিটে খাস্‌লো মাথা !
যার অন্তরে ক্রন্দন
করে হৃদি মন্থন
তারে হরি চন্দন
কমলী মালা —
সখি দিস্‌নে লো দিস্‌নে লো, বড় সে জ্বালা !

[ফাল্গুনী]

আত্মপ্রতিষ্ঠার উপ-প্রবৃত্তির মধ্যে যূথচারী প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রকটমান। এ প্রবৃত্তিই মানুষকে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এ প্রবৃত্তিই রয়েছে মানবতাবাদের মূলে কার্যকরী। নজরুলের ভাষায় এ প্রবৃত্তিরই দান মানবতাবাদের প্রকাশ অনন্য—

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।

[সাম্যবাদী]

তেমনি পদার্থপরজ সম্বন্ধে তাঁর অভিমতে রয়েছে সম্পূর্ণ অভিনবত্ব :

সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতারসে
এই ধরণীর তরণীর হা'ল রবে তাহাদেরই বশে।
তারি পদরজ অঞ্জলি করি' মাথায় লইব তুলি,
সকলের সাথে পথে চলি যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি।

[কুলি-মজুর]

অপত্য বা রক্ত স্নেহের স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে তাঁর কাব্য-চেতনায়। রক্ত-স্নেহ থেকেই স্বদেশ প্রেমের সৃষ্টি। স্বদেশ প্রেম থেকেই স্বাদেশিকতা এবং অপর জাতি কর্তৃক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি লাভের উদগ্র বাসনা দেখা দেয়। নজরুল-কাব্যে এই চেতনা অত্যন্ত স্পষ্ট :

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর।

বাঙালীদের জাতীয়তাবাদের সূচনায় তিনি কী বলিষ্ঠ কণ্ঠে বাঙালীর খুনের উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতির বা মানব-মানসের রহস্যভেদের বাসনা মানুষের আত্ম-প্রতিষ্ঠা বা অমরত্ব লাভের জন্য উৎসুক এক সহজাত প্রবৃত্তি। নজরুলের অসংখ্য কবিতায় তার প্রকাশ রয়েছে :

হয়তো তোমার পাবো দেখা,
যেখানে ঐ নত আকাশ চুমছে বনের সবুজ রেখা ॥

ঐ সুদূরের গাঁয়ের মাঠে,
আ'লের পথে বিজন ঘাটে ;
হয়তো এসে মুচকি হেসে
ধ'রবে আমার হাতটি একা ॥

ঐ নীলের ঐ গহন-পারে ঘোমটা-হারা তোমার চাওয়া,
আনলে খবর গোপন-দূতী দিক্-পারের ঐ দখিন হাওয়া ॥

[আশা]

পরলোক সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের আগ্রহ মানব-জীবনের অপর এক সাধারণ জন্মগতপ্রবৃত্তি। নজরুলের জীবনে তাও ছিল ক্রিয়াশীল। তাঁর কাব্য-জীবনে এ প্রবৃত্তির রূপও একাধিকবার দেখা দিয়েছে :

জানি না'ক আজ তুমি কোন লোকে রহি'
শুনিছ আমার গান, হে কবি বিরহী।
কোথা কোন জিজ্ঞাসার অসীম সাহারা,
প্রতীক্ষার চির-রাত্রি চন্দ্র, সূর্য্য, তারা,
পারায়ে চলেছ একা অসীম বিরহে ?

[গোকুলনাগ]

সহজাত প্রবৃত্তির স্তর পার হয়ে মানুষ পৌঁছে বুদ্ধি, প্রক্ষোভ ও ইচ্ছাশক্তির স্তরে। বুদ্ধির স্তরেই দেখা দেয় ঐতিহ্য চেতনা বা পূর্ব পুরুষদের ব্যক্তিসত্তা বা কীর্তিকলাপের প্রতি শ্রদ্ধা। ঐতিহ্য চেতনা নানাভাবে দেখা দিতে পারে। ধর্ম-সংক্রান্ত ঐতিহ্য-চেতনা দেখা দেয় কোন বিশিষ্ট ধর্মের মহামানবদের প্রতি শ্রদ্ধায়। ধর্ম-নিরপেক্ষ ঐতিহ্য চেতনা স্বদেশের বীর পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধায় ব্যক্ত হয়, অথবা স্বদেশের গৌরব কোন কীর্তিমান পুরুষ বা নারীর প্রতি ভক্তিতেও আত্মপ্রকাশ করে। স্বদেশের কীর্তি সম্বন্ধে আত্মশ্লাঘা সে ঐতিহ্য চেতনারই এক প্রকাশ।

নজরুল ইসলামের প্রথম আবির্ভাব যেভাবেই হউক না কেন, 'শাত-ইল-আরব' কবিতায় সর্বপ্রথমে তিনি বাঙালী পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর পর 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম' প্রভৃতিতে তার ধর্মীয় ঐতিহ্য-চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রাসঙ্গিক হিসাবে এখানে উল্লেখ করা যায় :

'জুলফিকার', আর 'হায়দরী' হাঁক হেথা আজও হজরত্ আলীর—
শাতিল আরব। শাতিল আরব।। জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।

[শাত-ইল-আরব]

আবুবকর, উসমান উমর আলী হাইদর
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ি মুখে সারি গান—লা-শরিক আল্লাহ্।

[খেয়াপারের তরণী]

নজরুল ইসলামকে প্রায়ই অপবাদ দেওয়া হয় তাঁর কাব্যে বা জীবনে কোন দর্শন ফলে ওঠেনি বলে। সে অপবাদের জীবন্ত প্রতিবাদ হিসাবে নজরুল-মানসের বিশ্বদর্শনের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি তারে আমি আপনায়
আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াসী বাসনায়।

আমারই রচিত কাননে বসিয়া
পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া,
সে মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া
আপনারই গলে দোলে হায়।

[আপন পিয়াসী : ছায়ানট]

জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এরূপ মধুর সম্বন্ধের বর্ণনা বিশ্ব সাহিত্যে বিরল।

এ পরমাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি আরও স্পষ্ট করে বলছেন :

আমি ওই ক্ষ্যাপা বাউল, আমার দেউল
আমারি এ আপন দেহ—
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর
অন্তরে মন্দির গেহ।

[বন-গীতি]

এ দেহেরই মধ্যে যে সে প্রাণের ঠাকুর নিত্য তার লীলায় মত্ত রয়েছেন,—এ সম্বন্ধে কবি নিঃসন্দেহ :

এ দেহেরই রঙ মহলায়
খেলিছে লীলাবিহারী
মিথ্যা মায়া নয় এ কায়া
কায়ায় হেরি ছায়া তারি।

[গুলবাগিচা]

সে পরমাত্মার রূপ ক্রমে কবির নিকট স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিয়েছে—

যদি ফুল হয়ে ফুটি তরু শাখে
সে যে পল্লব হয়ে ঘিরে রাখে
যদি একাকিনী চলি বনতলে
সে যে ছায়া হয়ে পিছে পিছে চলে।

সে সত্তার পরম পরিচয় কবি পেয়েছেন। তাই নিঃসন্দেহে বলছেন :

দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে, গড়িছে যে এইরূপ?
রূপে রূপে হয় রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ।
কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কায়া
লুকাতে আপন মাধুরী যে জন কেবলি রচিছে মায়া।

[অভেদম : নতুন চাঁদ]

বুদ্ধি ব্যতীত প্রক্ষোভ ও ইচ্ছাশক্তিও আমাদের জীবনে নানাভাবে দেখা দেয়। প্রক্ষোভ প্রকাশ পায় আসক্তি, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতির মাধ্যমে। নজরুল তার ক্রোধ প্রকাশ করেছেন— ইংরেজদের ছা'পোষা গ্রীকদের বিরুদ্ধে। প্রথম মহাসমরের শেষে তুর্কি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলে প্রতিবেশী গ্রীকগণ স্মার্ণা

প্রভৃতি স্থানে তুর্কিদের উপর নানাবিধ অত্যাচার করতে আরম্ভ করে। এই দারুণ অন্যায় দেখে উত্তেজিত হয়ে নজরুল ইসলাম তুর্কি বীর আনোয়ার পাশাকে সম্বোধন করে বলেছেন :

আনোয়ার! আনোয়ার!
দিলওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো, আর
নেস্ত্-ও-নাবুদ কর, মারো যত জানোয়ার!
[আনোয়ার]

ইচ্ছাশক্তির দুর্দান্ত প্রকাশ রয়েছে নজরুল ইসলামের অল্প কিছুর সব কবিতাতেই :

ওরে আয়!
ঐ মহাসিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়—
ওরে, আয়!
ঐ ইস্লাম ডুবে যায়!
যত শয়তান
সারা ময়দান
জুড়ি' খুন তার পিয়ে হুঙ্কার দিয়ে জয়-গান শোন গায়!
[রণ-ভেরী]

অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মানবজীবনের তথা মানবমানসের এমন কোন দিক নেই যাতে নজরুল ইস্লামের দৃষ্টি পতিত হয়নি, বা তার সন্তোষ বিধানের জন্য নজরুল ইস্লাম কোন আলোকপাত করেননি। এ কথা অবশ্য সত্য যে বাল্মীকি, ব্যাস বা হোমারের মত একটা বিরাট যুগের মধ্যে অবসিত মানব মানবীর চিত্র অংকন প্রসঙ্গে তাদের জীবনে কার্যকরী কোন ঐতিহ্য-চেতনা তিনি প্রকাশ করেননি। তবে তাঁর বিশ্রামহীন সুস্থ জীবনের নানা পর্যায়ে মানব-মানসের নানাবিধ খণ্ডিত অংশ নিয়ে তিনি রীতিমত ভেবেছেন এবং সে চিন্তনের ফলে অনেক খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর কবিতার মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন।
এগুলো কালের ধারা অনুসারে বিন্যাস করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে তিনি সত্যিই একজন মহাকবি; এবং বিশ্ব-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান পাওয়ার যোগ্য। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল নির্বাক ও শুষ্ক জীবন যাপন করে তাঁর অতি আদরের মাটির মায়ের কোলে আবার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর কাব্য পাঠে বাঙালী মাত্রই নব-জীবনের উদ্দীপনায় মেতে উঠেছে। তবে তাঁর কাব্যকে অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার আজ পর্যন্ত কোন চেষ্টা হয়নি। এটা আমাদের পক্ষে একটা মহাকলঙ্ক ব্যতীত আর কিছুই নয়।

নজরুল-সাহিত্য-সমালোচনার ধারা

রফিকুল ইসলাম

নজরুল সাহিত্যালোচনার সূত্রপাত 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ১৩২৭ সালের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত মোহিতলাল মজুমদারের পত্রটি থেকে। উক্ত পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত নজরুলের 'বাদল প্রাতের শরাব' এবং শ্রাবণ সংখ্যায় 'খেয়াপারের তরণী' কবিতা দুটি মোহিতলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ভাদ্র সংখ্যায় পত্রাকারে মোহিতলালের দীর্ঘ আলোচনাটি প্রকাশিত হয়। মোহিতলাল পত্রিকা-সম্পাদককে লিখেছেন :

> আপনার পত্রিকার দুই সংখ্যা সম্প্রতি পাঠ করিয়া আনন্দ ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়াছি… কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা।… আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙলার সারস্বত মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি… ……

মোহিতলালের ঐ আলোচনাকে আমরা বাংলা সাহিত্যে নজরুল সমালোচনার সূচনা বলতে পারি। ঐ সময় থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত নজরুল জীবন ও সাহিত্য সমালোচনার ধারাকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়।
নজরুল সমালোচনার প্রথম পর্ব ১৩২৭ থেকে ১৩৪০ সাল (১৯২০-৩৩ খ্রীঃ), দ্বিতীয় পর্ব ১৩৪১ থেকে ১৩৫৪ সাল (১৯৩৪-১৯৪৭ খ্রীঃ) দেশ বিভাগের সময় অবধি। তৃতীয় পর্ব ১৩৫৫ থেকে ১৩৭৭ সাল (১৯৪৮-৭০ খ্রীঃ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত। নজরুল-চর্চার প্রথম (১৩২৭-৪০ সাল) বা সূচনা পর্বের বৈশিষ্ট্য নজরুল-সাহিত্যের যথার্থ সমালোচনার অভাব, এ যুগ অতিশয়োক্তির যুগ, প্রশংসা বা নিন্দার প্রাচুর্যে এ পর্ব ভারাক্রান্ত। এ সময়ে নজরুলের জনপ্রিয়তা (সাহিত্যিক ও রাজ-নৈতিক উভয় কারণেই) এবং নজরুল-রচনায় প্রসঙ্গ কাটতি (কোন কোন রচনা বাজেয়াপ্ত হওয়া সত্ত্বেও) কেবল মাত্র কিংবদন্তিতেই পরিণত হয়নি সে-কালের বহু যশস্বী ব্যক্তিত্বের স্মৃতিকথারও উপাদান হয়েছে। আর নজরুল-বিদ্বেষ ও-বিরূপতার ইতিহাস ছড়িয়ে আছে 'শনিবারের চিঠি, 'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ' প্রভৃতি পত্র পত্রিকায়। রক্ষণশীল হিন্দু, মুসলমান এবং ব্রাহ্ম এই তিন সম্প্রদায়ের আক্রমণের লক্ষ্য পরিণত হয়েছিলেন নজরুল। তবে স্ব-সমাজের গোঁড়া ও ধর্মান্ধদের আক্রমণের তীব্রতা এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে আবুল কালাম শামসুদ্দীন মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায়

১৩৩৩ সালের পৌষ সংখ্যায় 'কাব্য সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান' প্রবন্ধে ক্ষোভের সঙ্গে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন,

> ...এই বাঙালা দেশ ব্যতীত জগতের কোথাও বোধ হয় কাব্যকে ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ইত্যাদির মাপকাঠিতে যাচাই করিবার উদ্ভট প্রয়াস হয় নাই ..... ।
>
> ...নজরুল ইসলামের কাব্য সৃষ্টি সম্বন্ধে যে অনৈসলামিকতার ধুয়া উঠিয়াছে, ইহাকে আমরা প্রবৃদ্ধ কাব্য-উপভোগের ফল বলিয়া মনে করি না বরং কাব্য সম্বন্ধে উন্নত ধারণার অভাবের নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধ্য হই।...
>
> ...নজরুল ইসলাম বাঙালার জাতীয় কবি। জাতির বেদনার কথাই তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দু এবং মুসলমান লইয়া বাঙালী জাতি। সুতরাং এ জাতির বেদনার কথা প্রকাশ করিতে হইলে রচনায় ইসলামী এবং হিন্দুয়ানী উভয় জাতীয় প্রকাশ ভঙ্গীর ছাপই দিতে হইবে, নতুবা রচনা সহজ ও সুন্দর হইবে না।

নজরুল-চর্চার প্রথম পর্বে নজরুল-'সাহিত্য'-বিচার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কুৎসা ও নিন্দার নামান্তর, এ পর্বে 'কল্লোল' ও 'সওগাত' পত্রিকা নজরুল-সমর্থনে সক্রিয় ছিল। ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলদের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়েছিল।

নজরুল-সাহিত্যের যথার্থ আলোচনা শুরু হয় নজরুল-চর্চার দ্বিতীয় পর্বে (১৩৪১-৫৪ সাল)। মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় ১৩৪১-৪২ সালে চার সংখ্যায় মুজিবুর রহমান খান চারটি প্রবন্ধে নজরুল-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত করেন, এই সময় থেকে সাহিত্য সমালোচকেরা গুরুত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে নজরুল-সাহিত্যের মূল্যায়নে ব্রতী হন। কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধাবলী- 'নজরুল ইসলাম', 'প্রতীক প্রীতি', 'কাহারে করি না কুর্নিশ' এবং হুমায়ুন কবীরের 'বাঙলার কাব্য' (১৩৪৫), বুদ্ধদেব বসুর 'An Acre of Green grass' (১৩৪৫) প্রকাশিত হয় এই পর্বে। হুমায়ুন কবীর এবং বুদ্ধদেব বসুর গ্রন্থে নজরুল-সাহিত্যের তাৎপর্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৩৫১ সালে আধুনিক বাংলা কবিতার মুখপত্র 'কবিতা'র বিশেষ 'নজরুল-সংখ্যা' প্রকাশও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম সম্পাদিত 'কাব্য মালঞ্চ' (১৩৫২) সংকলনের ভূমিকাতেও নজরুল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা ছিল। নজরুলের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রথম নির্ভরযোগ্য জীবনী 'নজরুল জীবনী' রচনা করেন কবি আবদুল কাদির, যা 'সওগাত' পত্রিকার ১৩৫৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কাজী আবদুল ওদুদের পূর্বোল্লিখিত তিনটি প্রবন্ধ এবং আবদুল কাদিরের 'নজরুল-জীবনী' 'নজরুল প্রতিভা' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। আবুল ফজলের 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' (১৩৫৪) দেশ বিভাগ পূর্ব যুগে পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত নজরুল-সাহিত্য আলোচনায় একমাত্র প্রয়াস।

নজরুল-চর্চার তৃতীয় পর্ব দেশ বিভাগের সময় থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশ বিভাগের পরে বাংলা সাহিত্য চর্চা কলকাতা ও ঢাকা উভয় স্থানকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়, স্বাভাবিকভাবেই এই পর্বের নজরুল বিচারে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

নজরুল-চর্চার আলোচ্য পর্বে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দুই শ্রেণীর আলোচনার প্রাধান্য দেখা যায়, নজরুল-স্মৃতিকথন এবং নজরুল-সাহিত্যের মূল্যায়ন। এই পর্বে পূর্ব বাঙলার নজরুল-চর্চার চারটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, প্রথমতঃ বাঙলার মুসলমানের নব জাগরণে নজরুলের অবদান, দ্বিতীয়তঃ উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনে নজরুলের ভূমিকা, তৃতীয়তঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে ইসলামী ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করার নজরুলের সার্থকতা চতুর্থতঃ আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় নজরুলের বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ।

তৃতীয় পর্বে পশ্চিম বঙ্গ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থে নজরুল-জীবনের বহু মূল্যবান তথ্য ও উপাদান সন্নিবেশিত হয়, ১৩৫৭ সালে প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ' নজরুল সম্পর্কিত স্মৃতিচারণের সূত্রটি ধরিয়ে দেয়, পরবর্তীকালে প্রকাশিত স্মৃতিকথাসমূহে নজরুলজীবনের বিচিত্র সব উপাদান ধরা পড়ে। সৌমেন ঠাকুরের-'যাত্রী' (১৩৫৭), হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যাঁদের দেখেছি' (১৩৫৯), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের —'চলমান জীবন' (১৩৬১), সজনীকান্ত দাসের —'আত্ম-স্মৃতি' (১৩৬১), নলিনীকান্ত সরকারের—'শ্রদ্ধাস্পদেষু' (১৩৬৪), প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের —'কাজী নজরুল' (১৩৬২), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের —'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে', পবিত্র গোস্বামীর —'স্মৃতি চিত্রণ' (১৩৬৫) এবং নজরুল-স্মৃতির সবচেয়ে মূল্যবান দলিল মুজফ্ফর আহমদের— 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে' (স্মৃতিকথা)' (১৩৬৬)।

মুজফ্ফর আহমদের—'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে (স্মৃতিকথা) প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৬ সালে (১৯৫৯ খ্রীঃ)। গ্রন্থটির কলেবর ছিল মাত্র ১৬৬ পৃষ্ঠা। ভূমিকায় মুজফ্ফর আহমদ লিখেছিলেন:

> জনাব আজহারউদ্দীন খানের লেখা "বাংলা সাহিত্যে নজরুল" প্রকাশিত হওয়ার পরেও আমার মতে কবি নজরুল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত এখনও রচিত হয়নি। সেই চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।
>
> আজকাল নজরুল ইসলাম সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেনও। বড় দুঃখ যে এইসব লেখার ভিতরে কিছু কিছু লেখা নিছক কল্পনাপ্রসূত: এই জাতীয় কল্পনা-বিলাস বন্ধ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।
>
> ভবিষ্যতে যাঁরা নজরুল ইসলামের জীবনী লেখায় প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের কিঞ্চিত সাহায্য হতে পারে এই ভেবে আমি তার সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করছি।

এই স্মৃতিকথা মুজফ্ফর আহ্‌মদ নতুন করে লেখেন এবং তা 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা' নামে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আর তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় নজরুল-স্মৃতিকথা লেখেন প্রথম 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' নামে পরে এই স্মৃতিকথা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়ে হয়েছে 'আমার বন্ধু নজরুল' (১৩৭৫)। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নজরুল-স্মৃতিচর্চার সূত্রপাত 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে আর তার পূর্ণাঙ্গ নজরুল-স্মৃতি চারণ 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' (১৩৭৬)। পশ্চিম বঙ্গে নজরুল-চর্চায় উৎসর্গীকৃত বাবলুল আবিদ খান আমাদের নজরুল সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থ 'নজরুল-পরিক্রমা' (প্রকাশ তারিখহীন)। নজরুল-চর্চার তৃতীয় পর্বে (১৯৪৮—৭০ খ্রীঃ) পশ্চিম বঙ্গ থেকে প্রকাশিত নিম্নোক্ত গ্রন্থ সমূহে বা তাদের অংশ বিশেষে নজরুল-সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কিত আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য-চর্চা (১৩৬১), হুমায়ুন কবীরের 'বাঙলার কাব্য' (১৩৪৯), আফহারউদ্দিন খানের 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' (১৩৬১), রবীন্দ্রনাথ রায়ের 'সাহিত্য বিচিত্রা' (১৩৬১), জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' (১৩৬২), নারায়ণ চৌধুরীর 'সঙ্গীত পরিক্রমা' (১৩৬২), রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'বাংলার গীতিকার (১৩৬৩), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' (১৩৬৩), শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'আধুনিক বাংলা কবিতার গতি প্রকৃতি (১৩৬৪), সংস্কৃতি পরিষদ প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন 'কবি নজরুল' (১৩৬৪), দীপ্তি ত্রিপাঠীর 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৩৬৫), সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (৪র্থ খণ্ড ১৩৬৫), সৈয়দ মুজতবা আলী লিখিত নজরুলের 'রুবাইয়াত-ই-উমর-খৈয়াম'-এর ভূমিকা (১৩৬৬), অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ' (১৩৬৬), ক্ষেত্র গুপ্তের 'কুসুমরঞ্জনের কাব্য বিচার' (১৩৬৬), সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'শতাব্দীর কবি' (প্রকাশ তারিখ নেই), সুনীলকুমার গুপ্তের 'নজরুল চরিত মানস' (১৩৬৭), রথীন্দ্রনাথ রায়ের 'দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার' (১৩৬৭)।

আলোচ্য পর্বে পূর্ব পাকিস্তানে নজরুল-চর্চা প্রধানতঃ পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ, তবে কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে নজরুল-স্মৃতিচারণ হয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থ সমূহে: জসীম উদ্দীন-এর 'যাঁদের দেখেছি' (১৩৫৯), খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীনের 'যুগ-স্রষ্টা নজরুল' (১ ৩৬৪)' বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের 'নজরুলকে যখন দেখেছি' (১৩৬৬), আব্বাসউদ্দীন আহমদের 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' (১৩৬৮), সুফী জুলফিকার হায়দারের 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়', (১৩৭১) এবং সৈয়দ আলী আশরাফের 'নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়' (১৯৬৭)। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত নজরুল সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ (পূর্ণাঙ্গ বা অংশতঃ), কাজী আবদুল ওদুদের 'নজরুল প্রতিভা' (১৩৫৫) শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর 'নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা' (১৩৬০), সৈয়দ আলী আহসানের 'নজরুল ইসলাম' (১৩৬১), মুহম্মদ এনামুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (১৩৬৪), মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১৩৬৫), কাজী মোতাহার হোসেনের 'নজরুল কাব্য পরিচিতি' মোতাহার হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা', (১৩৬৫), পাকিস্তান পাবলিকেশনস প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন 'নজরুল পরিচিতি' (১৩৬৬), আহমদ রফিক 'শিল্প ও সংস্কৃতি জীবন' (১৩৬৬), মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন 'নজরুল সাহিত্য' (১৩৬৭) কাজী আকবারউদ্দিন আহমদের 'সাহিত্যের পরিধি' (১৩৬৭), ডঃ মযহারুল ইসলামের 'সাহিত্যের পথে' (১৩৬৭) আবুল ফজলের 'শিল্প ও সাহিত্য সাধনা' (১৩৬৮), আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার' (১৩৬৮), মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহর 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৩৭০), হাসান হাফিজুর রহমানের 'আধুনিক কবি ও কবিতা (১৩৭২), আতাউর রহমানের 'কবি নজরুল' (১৩৭৫), মোবাশ্বের আলীর 'নজরুল প্রতিভা' (১৩৭৬) এবং শাহাবুদ্দীন আহমদের 'শব্দ-থানুকী নজরুল ইসলাম' (১৩৭৭)। আলোচ্য পর্বে নজরুল সম্পর্কে প্রকাশিত দুটি ইংরেজী গ্রন্থ মিজানুর রহমানের Nazrul Islam (১৯৬০ খ্রীঃ) এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'Introducing Nazrul Islam (১৯৬৫)। নজরুল ইসলামের রচনাপঞ্জী সম্পর্কিত দুটি গ্রন্থও এ পর্বে প্রকাশিত হয়, রফিকুল ইসলামের, 'নজরুল নির্দেশিকা, (১৩৭৬) এবং সাজিদা নুরুন্নাহার, 'নজরুল অন্বেষা (১৩৭৬)।

১৯২০ থেকে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ, এই পঞ্চাশ বৎসরে নজরুল জীবনী ও সাহিত্য-চর্চার যে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নির্দেশ হল তার সূচনা পর্বে (১৯২০—৩০ খ্রীঃ) নজরুলের সাহিত্য অতি প্রশংসিত বা নিন্দিত হয়েছিল, দ্বিতীয় পর্বে (১৯৩৪—৪৭ খ্রীঃ) নজরুলের জীবনী রচনা ও সাহিত্য সমালোচনার গঠনমূলক

প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এ পর্বে জীবনী রচনায় আবদুল কাদির এবং বাংলা সাহিত্যে নজরুলের স্থান নির্দেশে কাজী আবদুল ওদুদ, হুমায়ুন কবীর, বুদ্ধদেব বসুর আলোচনার ঐতিহাসিক মূল্য বর্তমান, পরবর্তী কালের গবেষণা ও আলোচনার মৌলিক সূত্রসমূহ ঐ সব আলোচনার মধ্যেই নিহিত ছিল। নজরুল আলোচনার তৃতীয় বা দেশ বিভাগোত্তর পর্বে (১৯৪৭-৭০ খ্রী:) একদিকে যেমন স্মৃতিকথার ভীড় অপর দিকে তেমনি নজরুল ইসলামকে সামগ্রিক বা খণ্ডিতভাবে মূল্যায়নের প্রয়াস পরিলক্ষিত। এ পর্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান কমরেড মুজফফর আহমদের নজরুল-স্মৃতিকথার বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ। বলা বাহুল্য মুজফফর আহমদের নজরুল-স্মৃতিকথা ছাড়া সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ নজরুলজীবনী রচনা, নজরুল-সাহিত্যের যথার্থ সমালোচনা কিংবা নজরুলের প্রকৃত মূল্যায়ন উত্তরসূরীদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। আলোচ্য নজরুল ইসলামের কবিতার রস বা শিল্প বিচারের কিছু আন্তরিক প্রয়াস হয়েছে কিন্তু সৈয়দ আলী আহসানের 'নজরুল ইসলাম' গ্রন্থ ছাড়া আর কোন গ্রন্থে নজরুলের কবিতার মাহাত্ম্য ধরা পড়েছে বলে মনে হয় না। মূল্যায়ন বিভিন্ন গ্রন্থে নজরুলকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা হয়েছে কিন্তু নজরুলের সৃষ্টিকে সমকালীন দেশ, কাল, পৃথিবী ও বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের ধারায় স্থাপন করে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। নজরুলের মৃত্যুর পরে নজরুল জীবন ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক মূল্যায়নের সময় উপস্থিত হয়েছে।

স্মৃতিকথা

নজরুলের 'জুলফিকার' ও 'বনগীতি'

মাহফুজুর রহমান খান

বাঙলা ১৩৩৯ সালের প্রথম দিককার কথা। তখন বাঙলা ও আসাম প্রদেশের মুসলমানদের এক মাত্র বাঙলা দৈনিক সংবাদপত্র 'দৈনিক ছোলতান'' বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা তিন জন একই পথের সহযাত্রী, মরহুম কবি আশরাফ আলী খান, মরহুম মোহাম্মদ কাসেম ও আমি, কলিকাতার ৩৬নং আপার সার্কুলার রোডস্থ তৎকালীন সুফিয়া হোটেলের উপর তলার, একই ঘরের বাসিন্দা ও বেকার। আমাদের পাশের ঘরে থাকিতেন তৎকালীন সাপ্তাহিক 'হানাফী' পত্রের সম্পাদক মরহুম চৌধুরী শামসুর রহমান।

সেই সময় আমাদের পরিচিত কতক সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি আমাদের দ্বারা—অবশ্য আমাদের আয়ত্তাধীন—, তাহাদের ছোট খাট সাময়িক সমস্যার সমাধান করাইয়া নিতেন। কেহ [illegible] সভাসমিতির মানপত্র লিখাইয়া নিতেন, কেহ তাহাদের বইয়ের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করাইয়া নিতেন, কেহ কোন বইয়ের প্রুফ্ সংশোধন করাইয়া নিতেন; আবার কেহ বা কবি আশরাফ আলীকে দিয়া কবিতা লিখাইয়া, তাহার মেয়ের নামে মাসিক পত্রিকায় ছাপিতেন—, মেয়ের বিবাহের সুবিধার জন্য।

আমরাও কিছু মনে করিতাম না। বিনা কাজের হট্টগোলে সময় যদি কাটিয়া যায়, ক্ষতি কি? এই কাজের পারিশ্রমিকের জন্য আমাদের তরফ হইতে কোন চাহিদা ছিল না। কোন দিন অযাচিত ভাবে বড় জোর চা আর কিছু নাশতা। আর্থিক অসুবিধায় থাকিয়াও টাকা পয়সার ব্যাপারে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র বিপন্ন করিয়া কিছু করি নাই আমরা।

এই সময় আমার পরিচিত এক বন্ধু—মাহবুব-উল-আলম,—ছোলতান অফিসেই তাহার সহিত প্রথম পরিচয়—, এক দিন আমাদের আস্তানায় আসিয়া, পরের দিন আমাকে তাহাদের বেনীয়াপুকুর অঞ্চলের গোলাম ছোবহান লেইনস্থ বাড়ীতে দুপুর বেলায় খাবার দাওয়াত করিলেন। যথা সময়ে তিনিই আমাকে নিয়া যাইবেন, তাহাও বলিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদানুবাদের পর, বন্ধুর একান্ত আবেদন উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

ব্রিটিশ আমলের অবিভক্ত বাঙলার প্রাদেশিক ইনস্পেক্টর অব রেজিস্ট্রেশন, জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহবুব। চট্টগ্রামে তাহাদের বাড়ী। তখনকার সময় আমাদের মত বেখেয়ালী মাহবুব।

তারিখ মত যথা সময়ে মাহবুবের সাথে তাহাদের বাসায় হাজির হইলাম। মাহবুব পরিচয় করাইয়া দিল, তাহার সহপাঠি বন্ধু বদরুদ্দোজা সাহেবের সহিত। তখন আমরা তিন জনই সমবয়স্ক, নওজোয়ান ও বকৃতদার। বদরুদ্দোজা সাহেব মরহুম খানবাহাদুর আহছানউল্লা এ-ডি-পি-আই,

সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র। বেগম ফজিলাতুন্নেসার স্বামী, কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী জনাব শামসুজ্জোহা খান বাহাদুর সাহেবের প্রথম পুত্র। পার্ক সার্কাসে তাহাদের বাড়ী। পরে অবশ্য অনেকবারই আমাকে সেই বাড়ীতে যাতায়াত করিতে হইয়াছে বিশেষ বিশেষ কারণে।

সেদিন ছিল রবিবার। খাবার টেবিলে নানা প্রকার আলাপ আলোচনার পর, আহার অন্তে মাহবুব আমাকে বলিল,—"শামসুজ্জোহা আমার খুব বন্ধু ব্যক্তি ও সহপাঠি। আমাদেরই মত কলেজের পড়া ছাড়িয়া, ১৫নং কলেজ স্কোয়ারে, আলবার্ট হলের নীচের তলায়, "এম্পায়ার বুক হাউস্" নামে একটি বইয়ের দোকান খুলিয়াছে। তাহার একান্ত ইচ্ছা, খ্যাতনামা তরুণ মুসলমান সাহিত্যিক ও কবিদের কিছু কিছু বই সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও উন্নত রুচি সহকারে প্রকাশ করা। বই বিক্রয়ের পরিকল্পনাতো আছেই। তুমি ও-কে কিছু সাহায্য কর।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তুমি আমার সবই জান, তোমার বন্ধুকে সাহায্য করার মত আমার কি যোগ্যতা আছে, বই ছাপান বিষয়ে। দৈনিক ছোলতানের শেষ পর্যায়ে আমরা তিনজন উক্ত পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগ পরিচালনা করিয়াছি মাত্র, এখন উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্য কোথাও চাকরীর জন্য উমেদার হই নাই। পাবলিকেশন ব্যাপারে আমার কি অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে? আর ক্রয়-বিক্রয়ের জ্ঞানও আমার নাই। আমার পুঁজি কতটুকু—তাহা তুমি জান।"

এমন সময় শামসুজ্জোহা সাহেব বলিলেন,—"আমি মাহবুবের নিকট আপনার বিষয় সব শুনিয়াছি। আপনার নিজস্ব পুঁজি যেটুকু আছে, তাহাই আমার যথেষ্ট। আমিও পুঁজিপতি নই।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মাহবুব বলিয়া উঠিল,—"এখন আর কি? আগামীকাল হইতেই যোগ দাও। আমি তোমাকে তোমার বাসা হইতে সঙ্গে করিয়া কলেজ স্কোয়ারে নিয়া যাইব। আর কোন আপত্তি করিও না। প্রকাশনা ব্যাপারে কি করিতে পার আর না পার, পরে দেখা যাইবে। আমি চাই তুমি ওর সাথে থাক।"

প্রীতির বাঁধন যেখানে, সেখানে আর কথা চলে না। তথায় আমাকে কি কি করিতে হইবে তাহার কোন ফিরিস্তি নাই। তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন ছাড়া আর কোন উপায় রহিল না।

ইহার পর মাহবুব বলিল,—"আমাদের নীচের তলায় তোমার জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু আছে। নীচে থাকেন পারস্য সম্রাট কর্তৃক নির্বাসিত পারস্য দেশের অন্যতম প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক নেতা আগা মইদুল ইসলাম। বর্তমানে তিনি বৃদ্ধ। তাঁহার সম্পাদনায় ও কর্তৃত্বে এখান হইতে "হাবলুল মতিন" সাপ্তাহিক পত্রিকা ফারসী ভাষায় ছাপা হয়। এই পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে ডাকযোগে পারস্যের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে সরবরাহ হয়। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান নাই। দুইটি মেয়ে। বড়টির নাম বেগম মইদজাদা। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফারসীতে এম-এ গোল্ড মেডালিষ্ট। তিনি পিতার পত্রিকা সম্পাদনায় সর্বপ্রকারে সহায়তা করেন। প্রেস্, অফিস এবং পরিবারবর্গের বাসস্থান একই জায়গায় কেন্দ্রীভূত, আমাদের নীচের তলায়।"

মাহবুবের কথা অনুযায়ী আমরা নীচে নামিয়া গেলাম, আগা সাহেবকে দেখিলাম। পারস্য দেশের শাহের শাসন পদ্ধতিতে বিদ্রোহের অপরাধে, রাজ-রোষে নির্বাসিত স্বদেশ ভক্ত জনাব আগা সাহেবকে আমরা অভিবাদন জ্ঞাপন করিলাম। অভিবাদন অন্তে তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহারই পাশে আসন গ্রহণ করিলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হইল পারস্যের রাজনৈতিক বিষয়ে। ক্ষীণ ও দীর্ঘ দেহী শ্বেত শ্মশ্রু বৃদ্ধ নির্বাসিত আয়াত কর্মী আগা মইদুল ইসলাম। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর মঙ্গলপ্রয়াসী

উন্নতি কামনার অপরাধে সম্রাট কর্তৃক বিদেশে নির্বাসিত হইয়াও দৃঢ়চিত্তিসহিত অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁহার নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করিতেছেন, কলিকাতা হইতে নিজস্ব কাগজ 'হাবলুল মতিন'-এর মাধ্যমে পারস্যের জনগণের মধ্যে। Plain living and high thinking এর বাস্তব প্রতীক প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসিল।

[পরবর্তীকালে, কলিকাতায় আগা মইদুল ইসলাম সাহেবের মৃত্যু হয় এবং গোবরার গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। বর্তমান ইরানের শাহান শাহের পিতা রেজা শাহ্ পাহলভী ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করার পর, আগা সাহেবের কবর, উক্ত গোরস্তান হইতে উঠাইয়া, স্পেশাল ট্রেন যোগে ইরানে নিয়া একত্রিশ বার তোপধ্বনি সহকারে রাজোচিত সম্মানের সহিত পুনরায় সমাধিস্থ করা হয়। বেগম মইনুজ্জামা ল' পাস করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে বুদ্ধিজীবী রূপে ওকালতি করার সময় তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান পদেও নিযুক্ত হন। রংপুর জেলার অন্তর্গত গাইবান্ধার অধিবাসী আই-সি-এস নূরুন্নবী সাহেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আগা সাহেবের কনিষ্ঠ মেয়েও ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসী ভাষায় এম-এ গোল্ড মেডালিষ্ট। তিনি বিবাহের পূর্বেই কলিকাতায় মারা যান।]

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া কবি আশরাফ আলী খান ও কাসেম সাহেবকে সব বলিলাম। কলিকাতায় তখন সামান্য কয়েকটি ব্যতীত অন্য কোন উন্নত রুচির মুসলিম প্রকাশনালয় ছিল না। মার্জিত রুচিসম্পন্ন শিক্ষিত একজন মুসলমান যুবক উন্নত শ্রেণীর বই প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইয়াছেন ইহাই ছিল সেই রাত্রে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

পরের দিন দুপুর বেলায় মাহবুব আসিয়া হাজির। তাহার সহিত কলেজ স্কোয়ারে চলিলাম নূতন কর্মস্থলে। বেশ ভাল দোকান। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উন্নত রুচির পরিচায়ক। ছয় সাতজন কর্মচারী, একজন বিহারী দারোয়ান। আমার জন্য এক ভিন্ন টেবিল ও চেয়ার—স্বত্বাধিকারীর আসনের পাশে নির্ধারিত রহিয়াছে। কতক্ষণ আলাপ আলোচনার পর মাহবুব চলিয়া গেল। কি কি কাজ করিতে হইবে আমাকে তাহাও ভাবিয়া পাই না। কৌতূহলী মনে দোকানে যাহা যাহা দেখিবার দেখিয়া নিলাম। সন্ধ্যার পর দারোয়ান ব্যতীত আর সব কর্মচারী চলিয়া গেলে, বলরুদ্দোজা সাহেব নিরিবিলিতে পুস্তক ব্যবসায় সংক্রান্ত আলোচনার পর বলিলেন, "কবি নজরুল ইসলাম সাহেবকে পাঁচ শত টাকা দিয়া-ছিলাম—"জুলফিকার" নামে তাঁহার একখানা বই প্রথম সংস্করণ দুই হাজার কপি ছাপার জন্য—প্রায় দুই তিন মাস পূর্বের কথা। অদ্যাবধি তাঁহার নিকট হইতে উক্ত বইয়ের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই আমার পক্ষে। কবি সাহেব খেয়ালী মানুষ; সব সময়ই গ্রামোফোন কোম্পানীতে গান দিয়া ব্যস্ত থাকেন। প্রাতঃকালে বাসা হইতে চলিয়া যান, রাত্রি নয় দশটায় ফিরেন। অনেক রাত্রে রেকর্ড কোম্পানীর অফিসের কাজ শেষ হয়। আমি নিজেও দুই তিনবার চেষ্টা করিয়াছি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে কিন্তু পারি নাই। অন্য কর্মচারী দ্বারাও কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

"মাহবুবের নিকট শুনিয়াছি আপনার সহিত কবি নজরুল ইসলাম সাহেবের অনেকদিন পূর্ব হইতেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া উক্ত বইয়ের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করুন। এখন কয়েকমাস পুস্তক প্রকাশকদের অবসর সময়। এখন এই বই বাহির করিতে না পারিলে, টেক্সট বই মৌসুমের সময় আর সময় হইয়া উঠিবে না।

ইহা ব্যতীত অন্যান্য উদীয়মান সাহিত্যিকদের নূতন বই প্রকাশ করার ইচ্ছাও আমার আছে। তাঁহাদের বইও ছাপার ব্যবস্থা করুন। আমার প্রতিষ্ঠান নূতন, ইহাকে সজীব করিয়া তুলুন। উপযুক্ত লোক অভাবে আমার ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বর্তমানে সবেমাত্র কাজকুল করিম সাহেবের 'মারণী মজনু' ছাপিয়াছি। ইহা অতি পুরাতন বই। আমি চাই প্রতিষ্ঠানে নূতন লেখকের বইয়ের আত্মপ্রকাশ। আমাদের সমাজে খুব ভাল ভাবে ইহার প্রয়োজন অনভূত হইতেছে।"

আমি প্রতি-উত্তরে বলিলাম,- "বই প্রকাশের ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই। নজরুল ইসলাম সাহেবের বাসায় অনেক দিন হয় যাই নাই, বিশেষ করিয়া দৈনিক ছোলতান বন্ধ হইবার পরে। তবে লোক মারফত ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁহার খোঁজখবর রাখি মাত্র। এখন তিনি হিজ মাস্টার ভয়েস ও মেগাফোন কোম্পানীতে গান রেকর্ড করার ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন জানি।"

তিনি বলিলেন, "আমার লোক দিনের বেলায় তাঁহাকে বাসায় পায় না। রেকর্ড কোম্পানীতে গেলেও তাঁহার সহিত কথা বলার সুযোগ হয় না। আমার নতুন দোকান, শীঘ্র তাহার একখানা বই প্রকাশ করা আমার একান্ত প্রয়োজন। আপনি একটু পরিশ্রম করিয়া বইখানা শীঘ্র বাহির করুন। এই জন্যই আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

উত্তরে শুধু বলিলাম, "খোদা হাফেজ, দেখা যাউক কি করা যায়।" ইহার পর আরও অনেক কথা-বার্তার পর অনুমান রাত্রি দশটার পর দোকান বন্ধ করিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম।

বাসায় আসিয়া সমস্ত কথা আশরাফ সাহেব ও কাসেম সাহেবকে বলিলাম। বহু বিষয়ের আলোচনা অন্তে স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, শীঘ্রই "জুলফিকার" বই বাহির করিতে হইবে।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের শ্যাম বাজার অঞ্চলের সীতানাথ লেইনের বাসায় উপস্থিত হইলাম। কবির বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য রামা আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "বাবু, এত দিন পরে দেখা দিলেন।" তাহাকে যাহা বলার বলিয়া, কবি সাহেবকে আমার সালাম দিবার জন্য নির্দেশ দিলে, রামা আমাকে বসিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। এই বসার ঘর আমার অপরিচিত নয়। প্রায় ত্রিশ মিনিট পরে কবি সাহেব নীচে নামিয়া আসিলেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"আরে, মাহফুজ এত দিন পরে। কত দিন তোমার কথা মনে করেছি কিন্তু তোমার সাক্ষাই নেই। এখন কি কর? কোথায় থাক? দেখা কর না কেন? জানি, দৈনিক ছোলতানে আছ।"

বহু জিজ্ঞাসার একত্র সমাবেশ। আমি কবি সাহেবকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন পূর্বক বলিলাম,—"দৈনিক ছোলতানেই ছিলাম। কয়েক মাস হয় ছোলতান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সার্কুলার রোডের আগের বাড়ীতেই আছি। আপনি বর্তমানে গান রেকডিংয়ে ব্যস্ত আছেন বলে আপনার সময় নষ্ট করতে আসি নি। আপনার সব খবরই রাখি। জনৈক বন্ধুর অনুরোধে বর্তমানে কলেজ স্কোয়ারে "এম্পায়ার বুক হাউসে" যোগ দিয়েছি।"

বলিলেন,—"সেখানে তুমি কি কাজ করবে?"

বলিলাম,—"এই লাইনের কাজতো তেমন কিছু জানি না। তবে প্রতিষ্ঠানের মালিক বদরুদ্দোজা সাহেব একজন মার্জিত রুচিসম্পন্ন তরুণ যুবক। বইয়ের দোকান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম, এজন্য মনে কোন আপত্তি করি নি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ভাল বই প্রকাশ করা।" তিনি আমার কথা শুনিয়া খুবখুশী হইলেন। বলিলেন, "বেশ করেছ। বর্তমানে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের খুব অভাব রয়েছে কলকাতায়। অনেক সাহিত্যিক ভাল প্রকাশকের অভাবে তাঁদের বই ছাপতে পারছেন না।"

এমন সময় রামা নাশতা ও চা নিয়া হাজির। উভয়ে নাশতা পর্ব শেষ করিলাম। কতদিন পর কবি সাহেবের সহিত একত্রে নাশতা খাইলাম। কিছুই ভুলি নাই। এরপর আমি বলিলাম,—"আপনার নাকি এম্পায়ার বুক হাউসকে "জুলফিকার" নামে একখানা ইসলামী গানের বই দেবার কথা ছিল ছাপার জন্য, কিন্তু এখনও সেই ফার্ম পাণ্ডুলিপি পায় নি। কর্তৃপক্ষ আপনার কাছ থেকে সেই বইয়ের কপি নেবার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন।"

উত্তরে বলিলেন,—"মনে রয়েছে। সে অনেক দিনের কথা। তাঁরা আমাকে টাকাও দিয়েছেন। তারপর এপর্যন্ত কেউ কপি নিতে এলেন না। আমিও কাজের ভিড়ে এ বিষয় ভুলেই গেছি। বর্তমানে আমার একটুও ফুরসত নেই। কেবল রবিবার দুপুরের পর বাসা হতে একটু বেরোই। সেদিন আমার ওদের দোকান বন্ধ থাকে। এখনই গাড়ী আসবে আমাকে নিতে আর রাত প্রায় দশটা এগারটায় সময় বাসায় পৌঁছে দেবে। তোমরা জান, আমি একা। অভাবের পাহাড় আমার চারদিকে মাথা উঁচু করে রয়েছে। এখানেই আমি দুর্বল।

"যে দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছি, সর্বাঙ্গীন সফলতার সাথে তার পরিসমাপ্তি প্রয়োজন। হিংসুটে সমালোচকের তো অভাব নেই। সব সময় আমাকে রেকর্ড তৈরীর গানের মহড়া-মজলিসে থাকতে হয়। ওখানে বসেই গানও রচনা করতে হয়। আরও অনেক কিছু। তা'ছাড়া বিভিন্ন মহলের মানুষের ভিড়তো লেগেই আছে। অনাগত ভবিষ্যতে সমাজ এর মর্যাদা বুঝবে।"

আমি বলিলাম, "তাদের লোক এসে আপনার বাসায় কোন দিনই আপনাকে পায় নি। হিজ মাস্টার্স ভয়েস অফিসে গিয়েও আপনাকে পায় নি। অবশ্য দশটা এগারটার আগে কোন দিনই আসে নি তারা।"

আমার কথা শুনিয়া কবি সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওরা বোধ হয়—কোম্পানীর অফিসেই গিয়ে থাকবে। যেখানে আমাদের গানের মহলা-মজলিস সেখানে পৌঁছতে পারেনি। বাইরের লোক অনেকেই সে যায়গায় ঠিকানা জানেনা। শিল্পীদের নিয়ে যখন রেকর্ডিং-এর বিভিন্ন স্তরের মহলা চলে, তখন বাইরের কোন লোককে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তুমি যখন ওখানে যোগ দিয়েছ, বই শীঘ্রই বের হবে। আমার পেছনে লেগে না থাকলে, তা'ও সম্ভব হবেনা। দু' তিন দিন পর পর আমার থেকে, কিছু কিছু লেখা নিয়ে যাবে। একত্রে বইয়ের সব কপি দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না বর্তমানে। মহলা-অফিসে যেয়ো। আজ আর কিছু হবে না। আগামী রোববার বেলা নটা দশটার সময় আমার এখানে আসবে, কিছু কপি নিয়ে যাবে।"

এই সময় গ্রামোফোন কোম্পানীর গাড়ী আসিয়া হাজির হইল। ড্রাইভারের সাথে আছে কোম্পানীর দারোয়ান, বিরাট দেহধারী জোয়ান হিন্দুস্থানী দশরথ। অবশ্য কবিই তাহার পরিচয় দিলেন। ইহার পর কবি সাহেবের নিকট হইতে বিদায় নিয়া রাস্তায় নামিয়া আসিলাম।

পূর্ব নির্ধারিত তারিখমত, রবিবার বেলা নয়টার সময় কবি সাহেবের বাসায় পৌঁছিলে, রামা আমাকে বলিল—"আজ উপরের ঘরে বসতে হবে।" এই বলিয়া আমাকে ভিতরের ঘরে নিয়া গেল এবং তথায় আমাকে বসিতে নির্দেশ দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরের মেঝেতে আমার সমবয়স্ক একজন তরুণ যুবক একাকী বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে আর কোন দিন দেখি নাই। হিন্দু না মুসলমান তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। পোশাক তো তখনকার দিনে সকলেরই এক প্রকার। তাঁহাকে নমস্কারও করিলাম না, সালামও

চিনাম না। উভয়ে আমরা পরস্পরের নিকট অজানা। অনেকক্ষণ আমরা চুপচাপ বসিয়া আছি। কেহ কাহারও সহিত কথা বলি না।

উপর তলার ঘর হইলেও সেখানে কোন আসবাবপত্রের আড়ম্বর নাই। মেঝেতে মাদুরের ঢালা বিছানা। টেবিল, চেয়ার, চৌকি ইত্যাদির কোন বালাই নাই। এককোণে কিছু বিছানা ও বালিশ জড় করিয়া রাখা হইয়াছে। আর আছে একটি হারমোনিয়াম। কিন্তু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

প্রায় ত্রিশ চল্লিশ মিনিট পর কবি সাহেব ঘরে প্রবেশ করিলে আমরা উভয়ে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। মনে হইল স্নান করিয়াছেন। ঝাঁকড়া চুল, গায়ে সাদা ফতুয়া, পরনে খদ্দরের ধুতিকাপড়। আমাদিগকে বসিতে বলিয়া তিনি নিজেও বসিলেন।

আমাকে বলিলেন,—"তুমি ওকে চেন? ওর নাম আব্বাসউদ্দীন। গ্রামোফোন রেকর্ডে যে আব্বাস-উদ্দীনের গান শুনেছ,—ইনিই সেই উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীন। এখানে আমার যে চার-খানা ইসলামি গান রেকর্ড হবে তাও ও গাইবে।

আব্বাস উদ্দীনকে বলিলেন, "তুমি তো ওকে চেন না। ওর নাম মাহফুজুর রহমান। আমার অনুরক্ত ভক্ত, সোদর প্রতিম। দৈনিক ছোলতানের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে এম্পায়ার বুক হাউসের অন্যতম কর্মকর্তা। 'জুলফিকার' নামে আমার যে নূতন বই বে'র হচ্ছে, তা' ওরাই ছাপবেন।"

তখন আমরা হাসিমুখে দুইজনই দুইজনের হাত চাপিয়া ধরিয়া, উভয়ে উভয়কে অভিবাদন করিলাম। এই দিনই আব্বাস সাহেবের সহিত আমার প্রথম পরিচয়। তাহার পর আমাদের মধ্যে অনেকবার অনেক কথাই হইয়াছে।

পরে কবি সাহেব বলিলেন,—"আব্বাস, তুমি আমার যে-চারখানা ইসলামী গান, এখানে রেকর্ড হবে, সে চারখানা গান গেয়ে ওকে শুনিয়ে দাও।"

প্রতি-উত্তরে, আব্বাস সাহেব বলিলেন,—'আজ আমার গলাটা ভাল নাই, ঠাণ্ডা লাগিয়াছে।"

তৎক্ষণাৎ খাবার ডাক পড়িল। খানা হাজির হইলে, কবি সাহেব লবঙ্গ সহযোগে গরম হালুয়া তৈরী করার নির্দেশ দিলেন।

যখন প্লেট বোঝাই উত্তপ্ত হালুয়া হাজির হইল, তখন আব্বাস সাহেবের অসুস্থ গলা, সুস্থ না হইয়া আর যায় কোথায়! গরম হালুয়া গলাধঃকরণ হইবার পর, একে একে চারিখানা গান আব্বাস সাহেব তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়া শুনাইলেন। গান চারিটির প্রথম লাইন—যথাক্রমে: সাহারাতে ফুটলোরে যে রঙিন গুল লালা, খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে, ইসলামের ঐ সওদা লয়ে, ওমন রমজানের ঐ রোজার শেষে।

অতঃপর অনেকক্ষণ নানা প্রকার আলাপ আলোচনার পর কবি সাহেব আমার হাতে দিলেন দুইখানা স্বহস্ত লিখিত খাতা, 'জুলফিকার' বইয়ের পাণ্ডুলিপি, একখানা ইসলামী গানের আর একখানা বিভিন্ন প্রকার গানের একত্র সমাবেশ।

কবির স্বহস্ত লিখিত এই দুইখানা খাতা বাঙলা একাডেমীতে সংরক্ষিত আছে। দুই খানাই একশাব-সাইজ বুক।

তিনি আরও বলিলেন,—"তিন দিন পর বেলা বারটার সময় হ্যারিসন রোডস্থ সেনোফোন কোম্পানীর অফিসে যাবে। তথায় আমার খোঁজ করলে আমাকে পাবে। আরও কপি দেবো। এভাবেই

বইয়ের অবশিষ্ট কপি নিতে হবে।" আব্বাস সাহেব রহিয়া গেলেন। আমি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় নিয়া বাসায় ফিরিলাম।

পরের দিন দোকানে বলকন্দোজা সাহেব বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া খুশীতে ভরপুর। নূতন আঙ্গিকে ও ভাবধারায় ইসলামী গানের অদ্ভুত অপরূপ সমাবেশ। পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের বিভিন্ন রচনা রীতি ও বহুমুখী কাব্যপ্রতিভার বিষয় আলোচনা করিতে আমাদের অনেক সময় কাটিয়া গেল।

পূর্ব নির্দেশ মত, যথা সময়ে মেগাফোন অফিসে যাইয়া, রাস্তার অপর পারে, যে বাড়ীতে গানের মহলা হয়, সেই বাড়ীর দরওয়াজায় দারোয়ানের হাতে কবি সাহেবকে দিবার জন্য আমার নাম লেখা একটু কাগজ দিলাম। দারোয়ান অন্য একটি লোককে ভিতর হইতে ডাকাইয়া আনাইয়া কাগজখানা কবি সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিল। আমি দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পর, কাগজখানা হাতে করিয়া কবি সাহেব স্বয়ং দরওয়াজায় হাজির। গায়ে সাদা ফতুয়া, পরনে ধুতি, খালিপায়ে দণ্ডায়মান। কবি সাহেবকে দেখামাত্র দারওয়ান খাড়া হইয়া সালাম দিল। আমাকে দেখাইয়া দারোয়ানকে বলিলেন,—"ইনি যখন এখানে আসবেন, তাঁহাকে বাধা দিও না। ইনি আমার কাছেই আসবেন।" 'জ্বি, হুজুর' বলিয়া দারোয়ান পুনরায় তাঁহাকে সালাম দিল। আমাকে নিয়া তিনি—নীচের তলার ঘর পার হইয়া, উপরের তলায় কয়েকটি ঘর অতিক্রম করিয়া—গানের আসর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিছনে আমাকে দেখিয়া উপস্থিত শিল্পীবৃন্দ, নারী ও পুরুষ, আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমাকে বিছানায় কবি সাহেবের পাশে বসিতে নির্দেশ দিয়া, সকলের নিকট আমাকে পরিচয় করাইয়া দিলেন। উপস্থিত সকলের উদ্দেশে আমি ছালাম জানাইলাম। আমার বিষয় তাঁহাদের নিকট যাহা যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমি লজ্জায় মাথা নত করিয়া রহিলাম। সর্বগুণ বিবর্জিত আমি—ইংরাজী—১৯২৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার সহিত পরিচয় হইবার পর হইতেই তিনি কেন যে আমাকে অতটা স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, তাহা ভাবিয়া পাইনা। হাজার শুকুর আল্লার দরগায়। অবশ্য আফসোস তিনি আমাকে যে চক্ষে দেখিতেন, সেই অনুপাতে আমি তাঁহার জন্য কিছুই করিতে পারি নাই।

বিশিষ্ট নর-নারীর একত্র সমাবেশ এই গানের মহলা। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে সেইদিনকার জন্য একমাত্র আব্বাসউদ্দীন সাহেবই আমার কয়েকদিন আগের পরিচিত ব্যক্তি। মহলা-কক্ষ মধ্যে ঢালাই বিছানা—বসিবার অন্য কোন ব্যবস্থা নাই। একটু পরে হাস্যোদ্দীপক ও বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতার পরিবেশে গানের মহলা আরম্ভ হইল। বিভিন্ন শিল্পীদের গানের সুর ঠিক মত হইতেছে কিনা, বাদ্যযন্ত্র ঠিক মত গানের সহিত সংযোজনা রক্ষা করিতেছে কিনা, সেই সব দিকে কবি সাহেব সজাগ। ইহা ব্যতীত শিল্পীদের সাথে রসালাপ করাও অন্যতম কাজ। যাহার মহলা শেষ হইয়া যাইতেছে, তিনি চলিয়া যাইতেছেন, আবার আর একজনের মহলা আরম্ভ হইতেছে। এইভাবে প্রায় তিন চার ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে চা-পান পর্বও কয়েকবার হইয়া গেল। আমি, হংসমধ্যে বক যথা চুপ-চাপ বসিয়া রহিয়াছি। হঠাৎ কবি সাহেব আমার দিকে তাকাইয়া, যেন এতক্ষণ আমার বিষয় তাঁহার খেয়ালই ছিল না, বলিলেন, "তুমি অনেকক্ষণ ব'সে আছ।" এই বলিয়া কাগজ কলম লইয়া, বুকের নীচে একটি বালিশ লইয়া বিছানায় শয়ন করিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকটি গান লিখিয়া আমার হাতে দিলেন। আবার তিন দিন পরে আসিতে নির্দেশ দিলে আমি তাঁহাকে সালাম দিয়া

চলিয়া আসিলাম।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে তথায় অত হৈ-হল্লা ও গান বাজনার বিভিন্ন প্রকার হট্টগোলে তিনি কি করিয়া এগুগুলি ইসলামী গান রচনা করিলেন, ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়।

তিন দিন পর যথাসময়ে গানের মজলিসে উপস্থিত হইয়া দেখি—তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলাবিদ ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খান সাহেব আসিয়াছেন। বীণা, সারেঙ্গী, এসরাজ, তবলা ইত্যাদি বাদ্যের মহড়া চলিতেছে। তিনি নজরুল ইসলামের গানের ওস্তাদ। অবশ্য কবি সাহেবই আমাকে সুরশিল্পী জমীরউদ্দিন সাহেবের বিষয় আদ্যোপান্ত বলিয়াছেন। কিছুক্ষণ গানের মহড়া চলার পর মেগাফোন কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী জে, এন, ঘোষ মহাশয় আসরে উপস্থিত হইলেন। জলসা বন্ধ করিয়া উপস্থিত সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। কবি সাহেব, খান সাহেব ও অন্যান্য শিল্পীদের সহিত রেকর্ডিং-এর কাজের অগ্রগতির বিষয় আলোচনা অন্তে প্রায় এক ঘণ্টা পর তিনি চলিয়া গেলেন। আমি তথায় আরও অনেকক্ষণ অবস্থান করার পর, কবি সাহেবের পক্ষে সেই দিনকার মত আমাকে কোন কপি দেওয়া সম্ভব হইল না বিধায়, তাঁহার নির্দেশ মত চলিয়া আসিলাম।

তাহার কথা মত তথায় যাইতাম ঠিক মতই। কোন দিন কিছু লেখা দিতেন, আবার কোন দিন, সারাদিন তথায় আনন্দ কোলাহলে কাটাইয়া দিয়া শূন্যহাতে ফিরিয়া আসিতাম। অবশ্য কলেজ স্কোয়ারস্থ আলবার্ট হল হইতে হ্যারিসন রোডস্থ মেগাফোন কোম্পানীর অফিস সন্নিকটেই ছিল।

এইভাবে প্রায় মাস দুয়েক রেকর্ডিং-এর জলসায় যাতায়াতের ফলে, জুলফিকারের পাণ্ডুলিপি হস্তগত হইল।

বই প্রেসে দিবার সময়, ইসলামী গানগুলি প্রথম দিকে দেওয়া হইল। প্রায় তিন ফর্মা কম্পোজ হইয়া যখন গ্যালি প্রুফ আসিল, তখন মাথায় এক খেয়াল চাপিল। আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে নজরুলের ইসলামী গান তখন বাজার গরম করিয়া রাখিয়াছে। এইসব ইসলামী গানগুলি দিয়া একটি ভিন্ন বই করা যায় কিনা। কিন্তু এই জাতীয় গানের সংখ্যা কম। ইহা ব্যতীত বইও দুইটা হইয়া যায়। এই বিষয়ে মখদুমী সাহেবের সহিত বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধার বিষয় আলোচনা করিলাম। সিদ্ধান্ত হইল, কবি সাহেবের সম্মতি লইতে হইবে। এই কাজের ভারও আমার উপর বর্তিল।

কিছুদিন কবি সাহেবের ঘন সংসর্গে থাকার ফলে আমার নিজের চিন্তাধারারও কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। আমার প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে এই পাণ্ডুলিপি দিয়া দুইটি বই করিলে কবি সাহেবের সম্মতি পাইতে আমার খুব অসুবিধা হইবে না। বইয়ের প্রুফ আমাকেই দেখিতে হইবে—তাঁহার নির্দেশ, তিনি শুধু প্রিন্ট অর্ডার দেখিয়া দিবেন।

শ্রীমায় প্রেসের স্বত্বাধিকারী দেবেন্দ্রনাথ বাচস্পতি মহাশয় ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। আমার পরিচিত জন। তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিয়া কম্পোজ ভাঙিয়া এক পৃষ্ঠাকে দুই পৃষ্ঠা, এক লাইনকে দুই লাইনে ভাগ করিয়া, প্রত্যেক লাইনের পর বেশী করিয়া স্পেস্ দিয়া, ইসলামী গানের চারি ফর্মার একখানা বই বাহির করিবার ব্যবস্থা করিলাম। বইয়ের মূল্য এক টাকা। কিন্তু ইসলামী গানে শেষ পর্যন্ত চারি ফর্মাও পুরা হয় না বলিয়া অন্য তিনটি গান শেষ পৃষ্ঠায় সংযোগ করিয়া টাইটেল পেজ সহ মেক আপ শেষ করা হইল।

বইয়ের মেক্‌আপ করা প্রুফ নিয়া কবি সাহেবের বাসায় তাঁহাকে দেখাইলাম। তিনি আদ্যোপান্ত দেখিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একি করেছ? অবশিষ্ট লেখাগুলো কোথায়?" আমি প্রতি-উত্তরে

সঙ্কোচের সহিত বলিলাম, "আপনার ইসলামী গানের কোন ভিন্ন বই নাই। আমার খুব ইচ্ছা ইসলামী গানের একখানা বই হউক। বর্তমানে এই গানগুলি জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করেছে। আপনি সম্মত হলে, অবশিষ্ট গানগুলি দিয়ে আর একখানা গানের বই বের করব। এ পরিকল্পনার জন্য আমিই দায়ী। বদরুদ্দোজা সাহেব বলেছেন, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করা হবেনা।" কবি আমার বক্তব্য শুনিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমি ভয়ে অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া রহিলাম। একটু পরেই তিনি হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"তোমার পরিকল্পনা ও সাহসকে ধন্যবাদ। তুমি যে আমার ইসলামী গানের বিষয় এতটা চিন্তা করেছ, আমি কিন্তু অতটা ভাবিনি। আমাকে আগে বললে শেষের তিনটি নতুন গান লিখে দিতুম।"

আমি তাঁহার কথায় সাহস পাইয়া মাথা তুলিয়া বলিলাম,—"আপনার সময়ের খুব অভাব। এ ছাড়া বই ছেপে বের করতে অনেক দেরী হয়ে গেল। এই প্রুফ আমি তিনবার দেখেছি। প্রেসের টাইপও আটক হয়ে রয়েছে। ফর্মা সব প্রস্তুত। আপনি মেহেরবানী করে একবার দেখে দিলেই, আগামীকাল ছাপা আরম্ভ হবে। তারপর বই বাঁধাই হতে দোকানে উঠতে যে ক' দিন দেরী।"

হাসিতে হাসিতে প্রুফের পাতা উলটাইয়া তিনি শুধু বইয়ের বেক-আপই দেখিলেন এবং বলিলেন, "বইয়ের নাম যে জন্য "জুলফিকার" রেখেছিলাম তা' তুমি ওলটপালট ক'রে দিয়েছ। দু'ধরনের গানের একত্র সমাবেশ। তোমার দেখা আমার বইয়ের প্রুফে ভুল থাকবে না, তা' জানি; কিন্তু রেশিম প্রুফ দেখে দিও।"

এই সুযোগে আমি বলিলাম,—"জুলফিকার' ছাপা হইলেই অবশিষ্ট গানগুলি প্রেসে দিয়া দিব, আপনি এই বইয়ের নামকরণ করিয়া দিন। যাহাতে দুইটি বইই শীঘ্র আত্মপ্রকাশ করে।"

একটু চিন্তা করিয়া এই বইয়ের নাম রাখা হইল "বনগীতি।" আমি প্রফুল্ল চিত্তে রাস্তায় নামিয়া আসিলাম, তাঁহার বাসা হইতে। দোকানে আসিয়া বদরুদ্দোজা সাহেবকে সব কথা বলিলে তিনি আমার হাতে হাত মিলাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "সত্যিকার কাজ করিয়াছেন। এক বইয়ের পরিবর্তে দুই বই হইয়া গেল। আপনি না হইলে এই কাজ অন্যের দ্বারা সম্ভব হইত না। আমার তাহাতো নয়ই। আমিতো ভয় করিয়াছিলাম কবি সাহেব না অস্বীকার করিয়া বসেন।"

কয়েক দিনের মধ্যেই জুলফিকার বাঁধাই হইয়া ঘরে আসিল। দশখানা বই নিয়া কবি সাহেবকে দিলাম। বইয়ের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া আত্ম-ভোলা কবি খুশীতে ভরপুর। তারপর 'বনগীতি'র চারি ফর্মার প্রুফ দেখিয়া যেন খুব আশ্চর্য হইয়া গেলেন। বলিলেন,—"এত তাড়াতাড়ি চার ফর্মা শেষ করে ফেললে?" আমি বলিলাম,—"এই বইয়ে আপনার বর্তমান সময়ের একটি ফটো দিতে হবে। এখন থেকে ফটো ব্লক করে না রাখলে বই বের হতে দেরী হবে। সাত ফর্মায় বই শেষ করব।"

বলিলেন, "তুমি দেখছি নাছোড়বান্দা। তোমার আবার এখেয়াল মাথায় চাপলো কেন? বর্তমানে আমার কোন বইয়েতো আমার ছবি থাকে না। বইয়ের ব্যাপারে তুমি যা' ক'রছ, তা' তোমার মালিকের নির্দেশ মত, না তোমার খেয়াল মাফিক?"

আমি বলিলাম,—"বই প্রকাশনা বিষয়ে আমি যা করি, তাহাতে তিনি কোন আপত্তি করেন না।"

হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, ফটো তুলে রাখবো। পাঁচ ছয় দিন পরে এসো।"

'বনগীতি' চার ফর্মা ছাপার পর দেখি, আরও পাঁচ ছয়টি নূতন গান না হইলে, টাইটেল সমেত সাত ফর্মা পুরা হয় না। কবি সাহেবকে বাসায় যাইয়া আরও পাঁচ ছয়টি গানের দরকার জানাইলাম।
তিনি বলিলেন,—"বর্তমানে মেগাফোন কোম্পানীর রেকর্ডিং বন্ধ আছে। এই মাসে হিজ মাষ্টার ভয়েস কোম্পানীর রেকর্ড হচ্ছে। তুমি চিৎপুরে ঐ কোম্পানীর গানের মহলা অফিসে তিন দিন পর যাবে।" তাঁহার নির্দেশ মত, চিৎপুর অফিসের ঠিকানায় গেলে, দেখি, দরওয়াজায় কোম্পানীর দারোয়ান দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি তাহাকে কবি সাহেবের কথা বলিলে সে আমাকে তিন তলায় নিয়া গেল। তখন বেলা দুই ঘটিকা। দেখি একটি ছোট ঘরে কবি সাহেব অন্য একজন লোক সহ বসিয়া আছেন। তথায় অন্য কোন লোক নাই। আমাকে দেখিয়া ভিতরে আসিতে বলিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সালাম দিলাম এবং ঘরে প্রবেশ করিলে তাঁহার পার্শ্বে বসিতে বলিলেন। আমি তথায় বসিলে কবি সাহেব আমাকে বলিলেন,—"মাহফুজ, তুমি একে চেন? ইনি শ্যামা-সঙ্গীত বিশারদ, কে, মল্লিক। তবে কে, মল্লিক আর নাই। এখন হইতে ইনি কাসেম মল্লিক।" তাঁহার নিকট আমার পরিচয় হইল আমি কবির গোলাম প্রভৃতি। আমি আবার মল্লিক সাহেবকে সালাম দিলাম। কবি আরও অনেক কিছু বলিলেন আমার বিষয়, যদিও আমি ঐসব কথার উপযুক্ত নই। অযাচিত স্নেহের এক অপূর্ব পরাকাষ্ঠা।
মল্লিক সাহেবকে দেখিলাম। দীপ্তিমান মুখমণ্ডল। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। তেজোদীপ্ত চাহনি। উন্নত নাসিকা। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ। পরিধানে ধুতি, গায়ে সাদা টুইলের সার্ট।
জুলফিকার ও বনগীতির ছাপান ব্যাপারে তাঁহাদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনার পর কবি সাহেব কয়েকটি গান, তাঁহার নিজের একখানা ছোট ফটো, যাহা বনগীতিতে ছাপান হইয়াছে, তাঁহার গানের ওস্তাদ সুর সম্রাট জমির উদ্দিন খান সাহেবের নামে "বনগীতি"র উৎসর্গ পত্র, আমার হাতে দিলেন। এই বইয়ে আর কোন গানের দরকার হইবে না, তাহাও জানাইয়া দিলেন। এমন সময় চা ও নাশ্তা হাজির হইল। আহার অন্তে তাঁহাদিগকে সালাম জানাইয়া চলিয়া আসিলাম।
'জুলফিকার' বাহির হইবার প্রায় এক মাস পরে, নজরুল ইসলামের নূতন ছবি সম্বলিত "বনগীতি" প্রথম সংস্করণ, লোকসমাজে আত্মপ্রকাশ করিল।
'জুলফিকার' ও 'বনগীতি' প্রকাশ করা উপলক্ষে, উক্ত পুস্তকদ্বয়ের পাণ্ডুলিপি কবির নিকট হইতে সংগ্রহের সময় মধ্যে, তাঁহার নিকট ঘন ঘন যাতায়াতের উপলক্ষে, তৎকালীন যুক্ত বাঙলার প্রথিতযশা সাহিত্যিক, সঙ্গীত কলা-বিদ, বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ও সাংবাদিকদের সহিত আমার পরিচয় হইবার সুযোগ ঘটে। ইহা ব্যতীত নজরুলের "কাব্য আমপারা" ছাপার সময়, প্রতিদিন তাঁহার সঙ্গে উক্ত বইয়ের পাণ্ডুলিপি সংশোধনী মজলিসে যোগ দেওয়ায় অনেক শিক্ষাবিদ জ্ঞানীগুণী ও সত্যিকারের আলেম সাহেবদের সহিত পরিচিত হইবার সংযোগ ঘটে। এই দিক দিয়া নগণ্য আমি—নিশ্চয় ভাগ্যবান।
ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত, স্মৃতি-বিস্মৃতি-জড়িত জীবনের অন্তবেলায় পৌঁছিয়া ভুলি নাই তাঁহাদের কথা।

"জুলফিকার" ও "বনগীতি" ছাপা হইয়া বাজারে বাহির হইবার কয়েকদিন পর, বদরোদ্দোজা সাহেব এক দিন আমাকে ছয় ইঞ্চি লম্বা ও পাঁচ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ একখানা গানের খাতা আমার হাতে দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ইহা আপনার কাজে লাগিবে। সাবধানে মত রাখিয়া দিবেন।" তিনি ও আমি তখন উভয়েই সমবয়স্ক অবিবাহিত যুবক। পাতার পৃষ্ঠা উল্টাইয়া হস্তাক্ষর দেখিয়া

বিশেষ করিয়া দুইটি লেখার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চমকিয়া উঠিলাম। খাতার প্রথম পৃষ্ঠা হইতে কবি নজরুল ইসলাম সাহেবের স্বহস্ত লিখিত কবির 'বুলবুল' বইয়ের নয়টি গান। তার পরের পৃষ্ঠা দুইটিই আমার ভাবান্তরের প্রধান উৎস। কবির হস্তাক্ষরের পরে অবশ্য অন্য লোকের হস্ত লিখিত আরও কিছু গান ও কবিতা আছে।
প্রথম পৃষ্ঠা হইতে যে কয়টি 'বুলবুলের' গানের সমাবেশ তাহা হইল :

১। বসিয়া নদীকূলে ; ২। নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া ; ৩। কেন উচাটন মন-পরাণ ; ৪। পরদেশী বঁধুয়া ; ৫। এ বাসি বাসরে ; ৬। কে বিদেশী বন-উদাসী ; ৭। কেন কাঁদে পরাণ ; ৮। এত জল ও কাজল চোখে ; ৯। করুণ কেন অরুণ আঁখি।

এই কয়টি গানের পরের পৃষ্ঠায়, কবির নাম ও তারিখ সম্বলিত আর দুইটি কবির স্বহস্ত লিখিত চারি লাইনের কবিতা,—যাহা আমার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার অনুলিপিও দেওয়া হইল :

সুন্দর বেশে মৃত্যু আমার আসিলে কি এত দিনে?
বাজালে নূপুরে বিদায় পূ'রবী আমার জীবন বীণে।
ভয় নাই রাণী রেখে গেনু শুধু চোখের জলের লেখা।
রাতের এ-লেখা শুকাবে প্রভাতে—চলে যাই আমি একা।
২৩—২—২৮ কবি
রাত্রি ১টা ২৫ মিনিট।

দিনের আলোকে ভুলিও তোমার রাতের দুঃস্বপন,
ঊর্দ্ধে তোমার প্রহরী দেবতা,
মধ্যে দাঁড়ায়ে তুমি ব্যথাহতা,
পায়ের তলার দৈত্যের কথা ভুলিতে কতক্ষণ?
২৪-২-২৮
প্রভাত।

সেই খাতায় এই দুইটি কবিতার পরের পৃষ্ঠায়, অন্য লোকের হস্ত লিখিত যে দুইটি কবিতা ; তাহার অনুলিপিও নিম্নে দেওয়া হইল।

তোমারে যা দিয়েছিনু, তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।

সেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করেছ পান
হৃদয়-অঞ্জলি হ'তে মম।
ওগো তুমি নিরুপম
হে ঐশ্বর্য্যবান।
তোমারে যা দিয়েছিনু, সে তোমারি দান
গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত
করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়!
হে বন্ধু, বিদায়।

এই কবিতার পরের পৃষ্ঠা

তোমায় কিছু দেব বলে
চায় যে আমার মন
নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন।

গানের খাতায় কাহারও নাম নাই। কে যে-এই খাতার মালিক তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। দুই জনের লিখিত অতি সাধারণ একখানা ছোট্ট গানের খাতা কিন্তু তাহা আমার মনে এক মহাজিজ্ঞাসা। কবির নিজ হাতের লেখা কবিতার নীচে নাম ও তারিখ সম্বলিত দেখিয়া আমার অনুসন্ধিৎসু মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। নিশ্চয়ই এইসব কোন ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দেশ করিয়া লেখা। সেই ব্যক্তিকে জানাই আমার উদ্দেশ্য।

আমি মদকদ্দোজা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "—আপনি এই খাতা কোথায় পাইলেন? ইহার মালিক কে?" তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"পরে বলিব। বর্তমানে উহা যত্নে রাখিয়া দিন।"

আমি বলিলাম,—"এখাতা আর আপনি ফেরৎ পাইবেন না।" তিনি বলিলেন,—"আপনাকেইতো ইহা দিলাম। আমার প্রয়োজন না হইলেও আপনার প্রয়োজন হইবে।" এই কথার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাই নাই সেই দিন।

পরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে উক্ত গানের খাতা, তাঁহার ভ্রাতৃজায়া, সলিসিটর শামসুজ্জোহা সাহেবের স্ত্রী,—ফজিলাতুন্নেসা সাহেবার। তিনি বেশ কিছু দিন কলিকাতার ক্যাম্পবেল হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে তাঁহার বিছানা হইতে তিনি উহা সংগ্রহ করিয়াছেন। অবশ্য পরে ঐ খাতার আর খোঁজ হয় নাই।

শামসুজ্জোহা সাহেব ও ফজিলাতুন্নেসা লণ্ডনে থাকাকালীন সময়ে উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতার পরিবেশ সৃষ্টি হইবার সুযোগ ঘটে। দেশে ফিরিয়া বিবাহিত জীবনে জোহা সাহেব কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন, আইনজ্ঞ হিসাবে।

স্বামীস্ত্রী তাঁহারা মাঝে মাঝে কোন দিন বিকাল বেলা আবার কোন দিন সন্ধ্যার পর এস্পারার বুক হাউসে আসিতেন। কোন সময় আবার মিসেস্ জোহা একাই আসিতেন। তাঁহার জন্য ভাল বই নির্বাচন করিয়া দিতে হইত আমাকে। ভাল বই সংগ্রহের দায়িত্বও ছিল আমার উপর,—তাঁহার পড়ার জন্য।

আমি এম্পায়ার বুক হাউসে পুস্তক প্রকাশন বিভাগের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার কিছু কাল পূর্বে, ফজিলাতুন্নেসার মারফতই, কবি কাজী নজরুল ইসলাম উক্ত প্রতিষ্ঠানকে "জুলফিকার" নামক একখানা গানের বই প্রকাশ করার সম্মতি দিয়াছিলেন। পূর্বে ইহা আমার জানা ছিল না।

ফজিলাতুন্নেসা সাহেবার প্রথম সন্তান প্রসবের সময় ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহাকে কলিকাতার ক্যাম্পবেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তথায় সিজারিয়ান অপারেশন যোগে তাঁহাকে প্রসব করান হয়। তাঁহাকে কিছু দিন উক্ত হাসপাতালে থাকিতে হয়। ডাক্তার তখনই জানাইয়া দেন যে ভবিষ্যতে তাঁহার আর সন্তান হইবার সম্ভাবনা রহিল না।

এইভাবে যে কন্যা ভুমিষ্ঠ হয়, তাহার নাম রাখা হয়, জুলিয়াস সিজারের নামের সহিত সংযোগ রাখিয়া,—"জুলিয়াস জোহা।"

তখন আমার স্মৃতি-বিস্মৃতির আর এক দিগন্ত খুলিয়া গেল। ইংরাজী ১৯২৭ সালে আমি করটিয়া কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। জনাব ইব্রাহীম খাঁ সাহেব তখন কলেজের অধ্যক্ষ।

বিভিন্ন জেলার সহপাঠিদের একত্র সমাবেশে কলেজ সংলগ্ন হোস্টেলে থাকি। সেই সময় জানিতে পারিলাম, করটিয়ার সন্নিকটবর্তী কুমুল্লী গ্রামের জনাব ওয়াহেদ আলী খানের ফজিলাতুন্নেসা নামক মেয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অঙ্ক শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তখন আরও মনে হইল মাসিক "সওগাতে" উক্ত মহিলার ছবি দেখিয়াছি।

আরও জানিতে পারিয়াছিলাম, ফজিলাতুন্নেসা আরও উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য ষ্টেট্ স্কলারশিপ লইয়া লণ্ডনে যাইবার প্রস্তুতি নিতেছেন। তৎকালে, ব্রিটিশ আমলে, বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত গ্রাম্য মুসলমান মেয়ের পক্ষে, অঙ্ক শাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব-উচ্চস্থান অধিকার করা, বাস্তবিকই সমাজের পক্ষে গৌরবের বিষয়। তাঁহার প্রতিভা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।

উক্ত খান সাহেব তখন মরহুম ওয়াজেদ আলী খান পন্নী সাহেবের ওয়াকফ্ এষ্টেটের জনৈক কর্মচারী। একদিন আমরা কয়েকজন সহপাঠী করটিয়া এষ্টেট অফিসে গিয়াছিলাম, কৃতী সন্তানের পিতা ওয়াহেদ আলী খান সাহেবকে নিজ চক্ষে দেখিবার জন্য। তাঁহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার সহিত কোন কথা বলি নাই।

দোজা সাহেব এই গানের খাতাখানা আমাকে কেন দিলেন এবং ইহা আমার কি কাজে লাগিতে পারে? এমন সময় মনে হইল 'বনগীতি'র কোন্ পৃষ্ঠায় যেন এই ধরনের একটি কবিতা আছে। এই বই আমার হাতেরই ছাপা। তখনই একখানা বই লইয়া বইয়ের শেষ দিকে একানব্বই পৃষ্ঠায় হদিস মিলিল।

পূর্ব উল্লিখিত চারি লাইনের দুইটি কবিতার প্রথমটিকে আট লাইনে পরিবর্তিত করিয়া এবং দ্বিতীয়টিকে যথাযথ চারি লাইনে রাখিয়া, মোট বার লাইনের একটি কবিতা। উহার শিরোনাম দিয়াছেন,—গান। এই বইয়ের প্রত্যেক গান, গজল ও ভজন ইত্যাদি কবিতারও বিভিন্ন সুর উল্লেখ করা আছে। অথচ এই গানের কোন সুর দেওয়া হয় নাই।

প্রথম আট লাইনের পর চারিটি বিরাম চিহ্ন, অর্থাৎ ছোট তারকা দিয়া কবিতাটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

আমাদের আলোচ্য, দুইটি ভিন্ন তারিখের কবির চারি লাইনের দুইটি কবিতার একত্র সমাবেশ—এই গানের নব রূপায়ণ।

বনগীতির প্রথম সংস্করণ কাহারও নিকট থাকিলে এবং উক্ত গানের খাতাখানা মিলাইয়া দেখিলে আমার লেখার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রকাশ থাকে যে নজরুল ইসলামের হস্তাক্ষর সম্বলিত উক্ত গানের খাতাখানা নজরুল একাডেমীতে সংরক্ষিত আছে।

এক দিন বরকতোল্লা সাহেবকে বলিলাম,—"এখন বুঝিয়াছি, কেন আপনার গানের খাতাখানা আমাকে দিয়াছেন।"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বনগীতির শেষের গানটি দেখিয়া খাতাটি আপনার হাতে দেওয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। আপনি যে আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহাই আমার আত্মতৃপ্তি।"

প্রতি-উত্তরে আমি বলিলাম, "কবি সাহেবের হস্তাক্ষর ব্যতীত অন্য লেখাগুলি যে কাহার হাতের লেখা, তাহা অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। আর না হয় নাই জানিলাম।"

অনুবাদক নজরুল

আবদুল কাদির

কাজী নজরুল ইসলামের লেখক-জীবনের পরিধি ১৩২৬ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯১৯ খৃস্টাব্দ থেকে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত—প্রায় ২৪ বছর। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা : 'মুক্তি' (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৬)। দ্বিতীয় কবিতা : 'কবিতা-সমাধি' (সওগাত, আশ্বিন ১৩২৬), তৃতীয় কবিতা : 'আশায়' (প্রবাসী, পৌষ ১৩২৬), চতুর্থ কবিতা (গাথা) : 'চিঠি' (বঙ্গনূর, বৈশাখ ১৩২৭) এবং পঞ্চম কবিতা : 'কালোর উকিল' (নূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭), অথবা 'বোধন' (মোসলেম ভারত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭)। 'আশায়' হাফিজের একটি গজলের অংশবিশেষের অনুবাদ এবং 'বোধন' হাফিজের 'য়ুসোফে গুম্ গশ্তা বাজ্ আয়েদ্ ব-কিনান গম্ মখোর'[১] নামক গজলের ভাবানুবাদ।' ১৩২৭ কার্তিকের 'বঙ্গনূরে' তিনি 'রুমী' অবলম্বনে লেখেন 'বাঁশীর ব্যথা'। নজরুলের কবি-জীবনের সেই সূচনাতেই দেখা গেছে : মৌলিক কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে ফারসী থেকে অনুবাদের দিকেও তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ।

সেই প্রথম জীবনে ইংরেজি থেকে বাংলা গদ্যে কিছু অনুবাদও তিনি করেছিলেন। ১৩২৭ বৈশাখের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যপত্রিকার সংকলন' বিভাগে 'জননীদের প্রতি', 'শিশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব' ও 'জীবন-বিজ্ঞান (দুঃখ-কষ্টের মহত্ব)' শিরোনামে তাঁর তিনটি ছোট লেখা ছাপা হয়; তার শেষে বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত আছে : "Englishman-এর Magazine Section" হইতে। এ লেখাগুলির ভাষাসৌকর্য দেখে মনে হয়, ইংরেজী মালমশলা অবলম্বনে লেখা হলেও এগুলি হুবহু অনুবাদ নয়। তবু নজরুলের অনুবাদ-কার্যের খতিয়ান লিখতে গেলে এগুলিরও উল্লেখ আবশ্যক।

> ১৩৬৯ জ্যৈষ্ঠের 'পূবালী'তে জনাব আতোয়ার রহমান 'অনুবাদক নজরুল' প্রবন্ধে বলেছেন : "হাফিজ এবং ওমর খৈয়ামের রুবাইগুলির অনুবাদ এখানে প্রকাশিত হয় মাসিক 'মোহাম্মদী'তে —নজরুলের সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বে। তিনি হুইটম্যান এবং হাফিজের কবিতার অনুবাদও করেন এই সময়েই।..তিনি কোরান শরীফ এবং 'দেওয়ান-ই-হাফিজ'-এর অনুবাদ শুরু করেন প্রায় একই সময়ে।

১. নজরুলের "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' গ্রন্থের ভূমিকায় সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন : "কাজী সাহেবের প্রথম জীবনের রচনা এই ফার্সী কবিতাটির বাঙলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। 'বেদার শাহাড় বেদার পাহাড়ে'র অনুকরণে 'শাত্তিল আরব শাত্তিল আরব' ঐ যুগেরই অনুবাদ।"—১৩২৭ জ্যৈষ্ঠের 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয় নজরুলের 'শাত-ইল্-আরব',—তা 'অনুবাদ' নয়, মৌলিক কবিতা—একটি ছবি দেখে রচিত, সে ছবি মুদ্রিত আছে পত্রিকার frontis-piece-রূপে এবং ছবির পরিচয় আছে পত্রিকার শেষের দিকে ১৩৯ পৃষ্ঠায়।—লেখক।

কিন্তু আমরা বড়দের শুনেছি, নজরুল করাচীর সেনানিবাসে থাকতেই 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' থেকে কয়েকটি গজলের অনুবাদ দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি এ-প্রসঙ্গে তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' পুস্তকের 'মুখবন্ধে' বলেছেন :

> আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরিজি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলভী সাহেব থাকতেন। তাঁর কাছে ক্রমে আমি ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই প'ড়ে ফেলি। ...এর কয়েক বৎসর পরে হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদ করতে আরম্ভ করি।

তাঁর 'কাব্যে আমপারা' (১৩৩৮) প্রকাশের প্রায় ১১ বৎসর পূর্বে, ১৩২৭ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে', সেই 'অনুবাদ' থেকে ছয়টি 'গজল' প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে তাঁর 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' : 'গজল—৭' প্রকাশিত হয়; তাতে শিরোনামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা আছে : "প্রথম ছয়টি গজলের কবিতায়-অনুবাদ 'মোসলেম ভারতে' বেরিয়েছিল। এগুলি হুবহু অনুবাদ নয়। ভাব-অনুবাদ বলা যেতে পারে।" ১৩৩০ বৈশাখের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায় 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' থেকে অনূদিত তাঁর আর একটি 'গজল' প্রকাশিত হয়। এ-সকল অনুবাদে নজরুল মূলের ভাব ও ছন্দঃধ্বনি যথাসম্ভব বজায় রেখেছেন। 'গজল'—২' থেকে দু'ছত্র উদ্ধৃত করছি :

১ | ২ | ৩ | ৪
v— — — | v— — — | v— — — | — v —

হে মোর সুন্দর! চাঁদের চাঁদ মুখ তোমার যৌবন রূপ দেখেই,
রূপের জৌলুস তোমার টোল্‌দার চিবুক গণ্ডের কূপ থেকেই॥

এখানে প্রতি চরণে চারিটি পর্ব (measure) এবং শেষ পর্বটি অপূর্ণ; পূর্ণপর্বে চারিটি স্বর (Syllable), তন্মধ্যে প্রথমটি মুক্তস্বর এবং অবশিষ্ট তিনটি বদ্ধস্বর; চরণ-প্রান্তের অপূর্ণ পর্বটিতে তিনটি স্বর, তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি বদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি মুক্ত। উপর্যুক্ত চরণদ্বয়ে প্রস্বরের (accent-এর) এরূপ পর্যায়বিন্যাসের লক্ষণ তাঁর ছন্দে ফারসীর লঘু-গুরু-ধ্বনির ভাবজ স্ফূর্তি সম্ভব হয়েছে। নজরুলের সূক্ষ্ম ছন্দঃশ্রুতি তাঁর অনূদিত গজলেও এনে দিয়েছে মধুর গীতিঝঙ্কার। নজরুল যেখানে ছন্দকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন ভাবের কল্পলোকে, সেখানে বাণীর আবেদনে হয়েছে অধিকতর তীক্ষ্ণ ও প্রাণময়। উপরোক্ত 'গজল—৭' থেকে দৃষ্টান্ত তুলছি :

মন- মধুপীর লাগি' 'বিরহ'-ভুজঙ্গী কেঁদেছিল কালো কেশ-জালে,
কেন খুলে' দিয়ে বেণী 'বিচ্ছেদ'-ফণী ছেড়ে দিলে প্রিয়া শেষকালে।
তব এলোচুলে বায়ু খুলে' গেল মম আলো নিভে গেল আঁধিয়ারে,
ঐ কালো কেশে আমি ভালোবেসে দেশে দেশে দেশে ফিরি কাঁদিয়া রে।

উপরোদ্ধৃত গজলটি মাত্রাবৃত্ত (MORAIC) ছন্দে বিরচিত; তার প্রতি চরণের গোড়ায় একটি দ্বিমাত্রিক অতিপর্ব (hyper-measure), অতঃপর চারিটি পর্ব, তন্মধ্যে প্রথম তিনটি পর্ব ষন্মাত্রিক এবং চতুর্থ পর্বটি চতুর্মাত্রিক। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত হাফেজ' অবলম্বনে 'প্রিয়া যবে পাশে' লেখেন; তার থেকেও চার ছত্র তুলছি :

আমাদের এই প্রেমিক সমাজে আজর ব্যাভার নাই,
প্রিয়ার কেশের সুরভিতে মোরা মগন সর্বদাই।
শরের মুরলী শুনি আমি ওগো সমস্ত কান ভরি'
'আঁখি ভরি' দেখি সুরার পেয়ালা—তব রূপ সুন্দরী।

—[তীর্থ সলিল]

সত্যেন দত্ত (১৮৮২—১৯২২) এ অনুবাদ করেছেন প্রচলিত লঘু-ত্রিপদী ভঙ্গীর মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। কিন্তু এ অনুবাদে ফারসীর ধ্বনিবৈচিত্র্য ও ভাবব্যঞ্জনা কতখানি প্রকাশ পেয়েছে? আতোয়ার রহমান কি বলতে চান যে, এ অনুবাদ 'মৌলিক কবিতার মতো', আর নজরুলের অনুবাদ তার অপেক্ষা 'নীরস'?

হাফিজের সুপ্রসিদ্ধ 'আগর আঁ তুর্কে শিরাজী' গজলটির অনুবাদ মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮–১৯৫২) করেছেন এভাবে :

শীরাজের সেই তুরাণী রূপসী
বেদরদী
যদি কোনদিন দরদ বোঝে এ
মুখ-হারার,
লাল সে গজলের কালো তিলটির
বদলে গো
দিয়ে দিতে পারি সমরকন্দ
বোখারা আর।
যেটুকু শরাব পড়ে আছে শেষ—
ঢালো সাকী।
বেহেশ্‌তেও সে জায়গা এমন
আছে না কি?
রোক্‌নাবাদের নীল নহরের
কিনারাটি
গুল-গলাগলি গলিটি এমন
মুসল্লার?
—(স্বপন-পসারী, 'হাফিজের অনুসরণে')

এ অনুবাদে চরণের পর্বসংখ্যা মূল থেকে বেশি হলেও পর্বগুলির ধ্বনিপরিমাণ ও বিন্যাস বিচিত্র ব'লে কাব্যের আবেদন হয়েছে হৃদয়গ্রাহী। ফারসী আবহও অনেকখানি সৃষ্টি হয়েছে। এর ছন্দও কলামাত্রিক; কিন্তু প্রস্বরের (Stress-এর) সুদক্ষ প্রয়োগে এর ছন্দ হয়েছে চটুল ও গতিময় —গজলে যা পরম কাম্য।

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের 'আবেহায়াত' (১৯১৪) গ্রন্থে হাফিজের ছুরটি গজলের পদ্যানুবাদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাতে হাফিজের সুবিখ্যাত "মোত্‌রেবে খোশ্ নওয়া বোগো তাজা বতাজা নও বনও" গজলটির অনুবাদ :

> গাও হে গায়ক, গাও হে মধুর
> নূতন নূতন ধরনে,
> তুলিয়া ললিত সুমধুর সুর
> নূতন নূতন ধরনে।

এ আক্ষরিক অনুবাদ (literal translation) হলেও কাব্যসৌন্দর্যে হৃদয়স্পর্শী হয়েছে কি না বিচার্য। ১৩৩১ শ্রাবণের 'জয়তী'তে নজরুল হাফিজের উপরোক্ত গজলটির ভাবানুবাদ করেন এভাবে :

> আরো নূতন নূতনতর শোনাও গীতি গানেওয়ালা।
> আরো তাজা শারাব ঢালো, করো করো হৃদয় আলা॥

হাফিজের 'দীওয়ান' থেকে নজরুল মোট কতগুলি গজলের অনুবাদ করেন, তার সঠিক তালিকা তৈয়ার করা যেতে পারে।

আতোয়ার রহমান "হাফিজের রচনার অনুবাদ" প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতক' (১৮৬৪) কাব্যখানির নাম উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের "প্রকৃত বন্ধু ঈশ্বর," "দুঃখ বিনা সুখ হয় না" প্রভৃতি পয়ার ছন্দের পদ্যগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তকে আজও সংকলিত হয়ে থাকে। প্রথমোক্ত ১৪-পংক্তির পদ্যটির শেষ শ্লোক—

> হাফেজের প্রিয় সেই অভিন্ন-হৃদয়,
> যে করে সমান প্রেম সকল সময়।
> —(সদ্ভাবশতক, ১৫ পৃঃ)

দ্বিতীয়োক্ত ৮ পংক্তির পদ্যটির শেষ শ্লোক—

> মনে ভেবে বিষম বিরহ-রিপু-ভয়,
> হাফেজ। বিমুখ কেন করিতে প্রণয় ?
> —[সদ্ভাবশতক, ৮১ পৃঃ]

বলাবাহুল্য যে, হাফিজ থেকে ভাব নিয়েই কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এ-সকল কবিতা রচনা করেন। কিন্তু তাঁর বড় গৌরব এখানে যে, আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ১২৭১ সালের ১লা আশ্বিন তাঁর 'সদ্ভাব-শতক' প্রকাশের ফলে ইরাণী-কবি হাফিজ বাঙালী পাঠক-সাধারণের ঘরে ঘরে পরিচিত হয়েছিলেন।

তার প্রায় ১৩ বছর পরে (১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে), ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের 'হাফিজ' (দিওয়ান-ই-হাফিজের অনুবাদ, প্রথম খণ্ড,) আত্মপ্রকাশ করে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে এবং অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেনের ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে, —নজরুলের অনুবাদের অনেক পরে। গিরিশচন্দ্র সেনের মতো এঁরাও হাফিজের "অনুবাদ করেছেন ইংরেজী থেকে" নয়—মূল ফারসী থেকে।

২

গিরিশচন্দ্র সেনের 'কোরান শরীফের তর্জমা' প্রসঙ্গে আতোয়ার রহমান বলেছেন: "তাঁর (গিরিশচন্দ্র সেনের) প্রায় সমসাময়িককালেই আব্বাস আলী নামে একজন মুসলিম সুধীও কোরান শরীফের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫—১৯১০) তিন খণ্ডে 'কোরান শরীফ' অনুবাদ ও প্রকাশ করেন ১৮৮১—১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে; আর মওলানা মোহাম্মদ আব্বাস আলীর 'কোরান শরীফ' বাহির হয় তার প্রায় সিকি শতাব্দী পরে—১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে কুরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক মওলানা মোহাম্মদ নইমুদ্দীন (১৮৩২—১৯০৮); তাঁর 'বঙ্গানুবাদিত কোরান শরীফ প্রথম খণ্ড' প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে; তিনি দশ পারা অনুবাদ করেন; দশম পারা ছাপা শেষ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হন।

নজরুলের 'কাব্যে আমপারা' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৪০ বঙ্গাব্দে—"দীওয়ান-ই-হাফিজের অনুবাদ শুরু" করার প্রায় ১৩ বছর পরে।[২] দুটি নমুনা তুলছি—

বল, হে বিধর্মিগণ, তোমরা যাহার
পূজা কর, আমি পূজা করি না তাহার।

—[সূরা কাফেরূন]

তুমি কি দেখেছ, বলে ধর্ম মিথ্যা যেই?
পিতৃহীনে তাড়াইয়া দেয়, ব্যক্তি এই।

—[সূরা মাউন]

এ কাব্যানুবাদ অত্যন্ত দুর্বল। মূলের ভাবের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সংরক্ষণ করতে হয়েছে ব'লেই এর ভাষায় এবং ছন্দে শৈথিল্য হয়েছে মাঝে মাঝে মারাত্মক।

২. নজরুলের 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' গ্রন্থের ভূমিকায় সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন: "তিনি (নজরুল ইসলাম) কুরানের শেষ অনুচ্ছেদ 'আমপারা' বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেন—বাদে সেটি প্রকাশিত হয়েছে।"—কিন্তু 'বাদে' অর্থাৎ ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে 'কাব্যে আমপারা'র দ্বিতীয় সংস্করণ।—লেখক।

৩

১৩৩৭ বৈশাখে নজরুল 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' অনুবাদ শুরু করেন। তাঁর অনূদিত ১০টি রুবাই ১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠের 'জয়তী'তে প্রকাশিত হয়। উক্ত রুবাইদশকের কবির স্বহস্ত লিখিত প্রতিলিপি 'নজরুল-রচনা-সম্ভার' পুস্তকে শোভা লাভ করেছে। এ-গুচ্ছের শেষ রুবাইটি:

বল্‌-বোতীরে মৌলভী কয়্‌—
"পান করে এ শারাব যারা,
যেমন মরে তেমনি ক'রে
গোরের পারে উঠবে তা'রা।"
তাই ত আমি সর্বদা রই
শারাব এবং প্রিয়ার নিয়ে,
কবর থেকে উঠবে সাথে
এই শারাব এই দিল্‌-পিয়ারা ॥

১৩৩৭ সালে কলকাতার 'শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড সন্স' নজরুলের 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এ-পুস্তকের রুবাইগুলি "এখানে প্রকাশিত হয় মাসিক 'মোহাম্মদী'তে—নজরুলের সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বে"—জনাব আতোয়ার রহমানের এ-ধারণা ভিত্তিহীন।

৪

১৩৪০ কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষের মাসিক 'মোহাম্মদী'তে নজরুলের অনূদিত ওমর খৈয়ামের ৫৯টি রুবাই ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় ২৬-বছর পরে—১৩৬৬ পৌষে, তাতে স্থান লাভ করেছে ১৯৭টি রুবাই। প্রথম রুবাইটি এই:

রাতের আঁচল দীর্ণ ক'রে আসল শুভ ঐ প্রভাত,
জাগো সাকী! সকাল বেলার খোঁয়ারি ভাঙো আমার সাথ।
ভোলো ভোলো বিষাদ-স্মৃতি! এমনি প্রভাত আসবে ঢের,
খুঁজতে মোদের এইখানে ফের, করবে করুণ নয়নপাত।

কিন্তু মাসিক 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত ১ নং রুবাইটির রূপ ছিল এই:

পূর্বাশার ঐ মিহির হানে তিমির-বিদার কিরণ-তীর,
কায়খসরুর লাল পিরালায় ঝরছে যেন মদ জ্যোতির।
ভোরের শুভ্র খেলাঘরে ডাক দিয়ে কয় মুয়াজ্জিন্‌—
জাগো জাগো, প্রসাদ পেতে উষার ঘটের লাল পানির।

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে, পরবর্তীকালে নজরুল তাঁর অনুবাদ প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করেন। রুবাইগুলি সজ্জিত করেন নূতনভাবে। যেমন, মাসিক 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত ২ নং রুবাইটি গ্রন্থে হয়েছে ১২৮ নং রুবাই। মাসিক 'মোহাম্মদী'র ১৬ নং ও ১৭ নং রুবাই দু'টি হয়েছে গ্রন্থের সর্বশেষ

১৭—

১৯৬ নং ও ১৯৭ নং রুবাই। গ্রন্থে কোনো কোনো রুবাইয়ের চরণ-বিন্যাসেও বদল হয়েছে। যেমন, মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত ৪ নং রুবাই গ্রন্থে হয়েছে ১৬২ নং রুবাই এবং এতে আগেকার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ যথাক্রমে হয়েছে দ্বিতীয়, চতুর্থ, তৃতীয় ও প্রথম চরণ।

রুবাই ছন্দ:স্তবক (metrical stanza) বা পদবন্ধ বিশেষ, তাতে চারিটি পদ বা চরণ থাকে; তার প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল হয়, তৃতীয় চরণ সাধারণত: অমিল (blank) থাকে। আইরিশ কবি এডোয়ার্ড ফিট্‌জেরাল্‌ড (Edward Fitzgerald : ১৮০৯—১৮৮৩) ফারসী রুবাইয়ের এ গঠন-পদ্ধতি বজায় রেখেই ইংরেজিতে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের এক স্বচ্ছন্দ অনুবাদ (free translation) বেনামীতে প্রকাশ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর Rubaiyat of Omar Khayyam প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাতে ৭৫টি রুবাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং ছাপা হয়েছিল মাত্র ২৫০ কপি। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে তার সঙ্গে ৩৫টি রুবাই যোগ ক'রে দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশিত হয়; কিন্তু পরবর্তীকালে সে-সংস্করণের ১৪, ২৮, ৪৪, ৭৭, ৮৬, ৯০, ৯৯ ও ১০৭ সংখ্যক রুবাই ৯টি পরিত্যক্ত হয়। প্রত্যেক সংস্করণেই অনুবাদে'র ভাষায় কিছু কিছু প্রক্ষমার্জনা করা হয়। আমরা আগে দেখিয়েছি যে, নজরুল ওমরের ১ নং রুবাইটির যে অনুবাদ প্রথমে প্রকাশ করেন, পরে তার পরিবর্তন করেন। ফিট্‌জেরাল্‌ডের প্রথম সংস্করণে এ রুবাইটির অনুবাদ :

Awake ! for Morning in the Bowl of Night
Has flung the Stone that puts the Stars to Flight :
And Lo ! the Hunter of the East has caught
The Sultan's Turret in a Noose of Light.

চতুর্থ সংস্করণে (১৮৭৯) এর অনুবাদ—

Wake ! For the Sun, who scatter'd into flight
The Stars before him fromthe Field of Night,
Drives Night along with them from Heav'n, and strikes
The Sultan's Turret with a shaft ofLight.

ফিট্‌জেরাল্‌ডের মতে, ওমর-খৈয়াম ছিলেন বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদী (the material Epicurian)। অন্যপক্ষে মসিয়েঁ নিকোলাসের মতে, ওমর খৈয়াম ছিলেন হাফিজের মতো মরমী সূফী(mystical Sufi)। এই দুই মতের সমর্থকদের বিতর্ক অদ্যাবধি নিরসিত হয়নি এবং কোনোদিন হবেও না। ওমর খৈয়াম নিজে বলেছেন :

খাইয়াম কে খিমাহায়ে হিকমৎ মিদোখ্‌ত্‌
দার কোরায়ে নার ফেতাদ ও নাগাহ্‌ বসোখ্‌ত
মেকরাজে আজল্‌ তানাব ওমরাশ্‌ চুব্‌রাদ্‌
দাল্লাল কাজা বরায়েগান্‌ বফরোখ্‌ত্‌

নজরুলের অনুবাদ—

খৈয়াম যে জ্ঞানের তাঁবু করল সেলাই আজীবন,
অগ্নিকুণ্ডে প'ড়ে সে আজ সইছে দহন অসহন।
তাঁর জীবনের সূত্রগুলি মৃত্যু কাঁচি কাটিলো হায়,
ঘৃণার সাথে বিকায় তারে তাই নিয়তির দালালগণ।

মূলের প্রতি সাধ্যানুসারে অনুগত থেকে নজরুল এ অনুবাদ করেছেন। ভাব ও ছন্দ মূলানুগত ব'লে তাঁর অনুবাদ কোথাও কোথাও হয়ত কিছু আড়ষ্ট লাগে; কিন্তু বিদেশী কবিতার ভাষান্তর কুত্রাপি মৌলিক সৃষ্টির মতো অনবদ্য হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "কবিতা লাজুক বধূর মতো এক ভাষার অন্তঃপুর থেকে অন্য ভাষার অন্তঃপুরে আসতে গেলে আড়ষ্ট হয়ে যায়। যাঁরা নজরুলের "মৌলিক রচনার তুলনায় অনুবাদের অনুৎকর্ষ" লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের এ-কথাটি ভেবে দেখতে পারেন।

১৩৬৯ পৌষের 'পূবালী'তে ডক্টর গোলাম সাকলায়েন রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের "অনুবাদক হিসেবে কান্তি ঘোষ, নরেন দেব, সত্যেন দত্ত প্রমুখ কবির উল্লেখ করে জনাব আতোয়ার রহমানের মতে সায় দিয়ে বলেছেন যে, "তাঁরা মূল কবিতার আঙ্গিকের অনুসরণ করেন নি।" আতোয়ার রহমান স্পষ্টতঃই বলেছেন: নজরুল 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের' অনুবাদে "আশ্রয় নিয়েছেন সরাসরি ফারসী আঙ্গিকের" এবং "এর আগে ফারসীর আর কোনো অনুবাদে রুবাইয়ের আঙ্গিক পুরোপুরি অনুসৃত হয়নি।"

নজরুলের অনুবাদের প্রায় ৩০ বছর আগে, অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০—১৯১৮) "ওমরের অনুবাদ ও অনুসরণ" ক'রে বাঙলা ভাষায় প্রথম রুবাই পরিবেশন করেন। তাঁর অনুদিত ৮০টি রুবাই তিন কিস্তিতে, প্রথম ২৯টি রুবাই ১৩১১ বৈশাখে, ৩০ থেকে ৫৩ সংখ্যক রুবাই ১৩১৮ বৈশাখে এবং ৫৪ থেকে ৮০ সংখ্যক রুবাই ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ, 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি ১নং রুবাইয়ের অনুবাদ করেন এভাবে—

আর ঘুমায়ো না, পান্থ, মেলহ নয়ন।
প্রাচী-প্রান্তে ফুটে, ফুটে প্রভাত-কিরণ।
এলোকেশী নিশীথিনী পলায় সভয়ে
অম্বরে কুড়ায়ে তার চূড়ার রতন॥

অক্ষয় বড়াল তাঁর অনুবাদে ফারসী রুবাইর মিলবিন্যাস (rhyme structure) বজায় রাখেন। তিনি এক্ষেত্রেও তাঁর প্রিয় অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেন। এই পয়ারাত্মক ছন্দ সুগম্ভীর ভাব বুঝনোর জন্য সবিশেষ উপযোগী; কিন্তু ফারসী রুবাইর 'লিরিক' ভাব, লঘু 'হিউমার' ও অগ্নিগর্ভ 'প্যাশন' প্রকাশের পক্ষে এ ছন্দ কতখানি অনুকূল সে পরীক্ষা অতঃপর আর কেউ করেন নি।
১৩১৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তীর্থসলিল' প্রকাশিত হয়; তাতে 'রুবাইয়াৎ' শিরোনামে 'ওমর

খৈয়াম' থেকে ১৩টি রুবাইর অনুবাদ পরিবেশিত হয়েছে। তার প্রথমটি হচ্ছে ফিটজেরাল্ডের প্রথম সংস্করণের ১১নং ও চতুর্থ সংস্করণের ১২নং রুবাই—

বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই যদি একখানি,
পাই যদি এক পাত্র মদিরা, আর যদি তুমি, রাণী।
সে-বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া গাহ গো মধুর গান,
বিজন হইবে স্বর্গ আমার, তৃপ্তি লভিবে প্রাণ।

সত্যেন দত্ত এখানে রুবাইর মিল-পদ্ধতি রক্ষা করেন নাই, তাঁর "প্রিয়া যবে পাশে" কবিতার ছন্দ—যন্মাত্রাপর্বিক মাত্রাবৃত্ত—ব্যবহার করেছেন, ফলে এর অঙ্গে লেগেছে মধুর গীতিকবিতার আমেজ। বাঙলার লোকছন্দ (folk metre) স্বরবৃত্তে ওমরের ৭৫টি রুবাই অনুবাদ ক'রে কান্তিচন্দ্র ঘোষ ১৩২৬ সালে তাঁর 'রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' প্রকাশ করেন। তার ১নং রুবাইটি এই :

রাত পোহালো—শুনছ সখি, দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক?
লাজুক তারা তাই শুনে কি পালিয়ে গেছে দিগ্বিদিক।
পূব-গগনের দেবৃ-শিকারীর স্বর্ণ উজল কিরণ-তীর
পড়ল এসে রাজপ্রাসাদের মিনার যেথা উচ্চশির॥

কান্তি ঘোষের অনুবাদে স্তবক হচ্ছে দু'টি সমিল শ্লোকের (rhyming Couplet-এর) সমষ্টি,—তার গঠনেও রুবাইর ছাঁদ অনুসৃত হয়নি। কিন্তু সুপ্রচলিত স্বরবৃত্ত (Syllabic) ছন্দের চটুলতা ও লাস্যগতি তাঁর অনুবাদকে করেছে লোকপ্রিয়।[৩]
অতঃপর প্রকাশিত হয় বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ সাহিত্যরত্ন কর্তৃক অনূদিত 'রোবাইয়াৎ।' ১৩২৯ কার্তিকের 'সহচর'-এ এই অনুবাদখানির পরিচয়-দান প্রসঙ্গে এক প্রবন্ধে প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন :

> বাংলা সাহিত্যে ওমরের কাব্যসুধা সিঞ্চনের তৃতীয় প্রয়াস বিজয় বাবুর 'রোবাইয়াৎ।'---তাঁর অনুবাদের একটা বিশেষত্ব দেখি এই যে, তিনি ওমরের মূল কবিতাগুলি ও তার অনুবাদ পাশাপাশি সাজিয়ে তাঁর অনুবাদের সৌন্দর্য বিচারের ভার পাঠকের হাতে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছেন। ---বিজয় বাবুর অনুবাদ অনেকাংশে প্রকৃত ওমরকে বজায় রাখতে পেরেছে। তাঁর সহজ প্রভা তরল ছন্দের লঘুগতি সকলকেই মোহিত করে।---

বিজয় বাবুর বইটি আমি দেখিনি। তিনি ১৩২৯ শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনের 'সহচর'-এ শেখ সাদীর 'গুলিস্তাঁ' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে রুবাই ছন্দে 'সপ্ততি-সংখ্যক চতুষ্পদী' (tetrastics) লেখেন; তার ৬৯নং চতুষ্পদীটি এই :

৩. আবদুল কাদির বলেছেন : কান্তি ঘোষের রুবাইগুলি "মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অনূদিত।" দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬২ – ১৯১৩) তাঁর 'ত্রিবেণী' (১৯১২) কাব্যের 'ভূমিকা'য় 'মাত্রা' অর্থে 'Syllable' ধরেছেন এবং 'মাত্রিক' বলতে Syllabic বুঝিয়েছেন। কিন্তু সাধারণতঃ মাত্রাবৃত্ত বলতে কলাবৃত্ত বা কলামাত্রিক (moraic) ছন্দ এবং স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত বলতে ঝোঁকপ্রধান Syllabic (স্বারিক) ছন্দ বুঝানো হয়ে থাকে।—লেখক।

হে পাঠক! যদি পাঠ কর তুমি এই গুলিস্তাখানি,
স্মরি' পরবেশে প্রার্থনা করো হইয়া যুক্তপাণি :
কবি ও তাঁহার শিষ্যেরা যেন লভে গো করুণা তাঁর,
মর্যাদা যদি স্রষ্টারে তাঁর দিয়ে থাকে এর বাণী।

উক্ত চতুষ্পদীগুলি প'ড়ে আমার ধারণা হয় যে, বিজয় ঘোষ তাঁর "Fitzgerald হইতে অনূদিত" 'রোবাইয়াৎ' এই আঙ্গিকেই নির্মাণ করেছিলেন।

১৩৩৩ সালে (মে ১৯২৬) নরেন্দ্র দেবের 'রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তিনি স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের নানা ছন্দোবন্ধে ৩১০টি স্তবক রচনা করেন। কিন্তু একটি স্তবকেও রুবাইর ছন্দ-ছাঁচ অনুসরণ করেননি। তাঁর অনূদিত প্রথম রুবাই :

জাগো জাগো, রাত ফুরালো,
তরুণ প্রাতের আঁখির আলো
তীর হেনেছে নিশীথিনীর বুকে।
চাও গো সখি, চাঁদ-বধূয়া লজ্জানত মুখে
ত্রস্তপদে পলায় যেন ত্রাসে।

পূব-আকাশের শিকারী ওই
জ্যোতির জালে জড়িয়ে লো সই
রং-মহলের মিনার-ধারে
জয়োল্লাসে হাসে।

ওমর খৈয়ামের রুবাইর সংখ্যা অদ্যাবধি সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে অক্সফোর্ডের Bodleian Library তে সংরক্ষিত ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের যে প্রতিলিপি দেখে ফিটজেরাল্ড তাঁর অনুবাদ তৈরী করেন, তাতে ১৫৮টি রুবাই আছে—সেগুলি ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দে শিরাজে অনুলিখিত হয়েছিল। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় মুদ্রিত একটি দুষ্প্রাপ্য সংস্করণে আছে ৪৩৮টি রুবাই; আর পরিশিষ্টে আছে আরও ৫৪টি রুবাই। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরীর একটি কপিতে আছে ৫১৬টি রুবাই। মসিয়েঁ নিকোলাস্ তেহরানের একটি লিথোগ্রাফ কপি থেকে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে যে পাঠ প্রস্তুত করেন, তাতে ৪৬৪টি রুবাই রয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এসব প্রতিলিপিতে অনেক প্রক্ষিপ্ত রচনা সংযোজিত হয়েছে। সে যা হোক, নরেন্দ্র দেব ৩১০টি রুবাইর ভাববস্তু সমন্বয় ক'রে বাঙালী পাঠকের চিত্ত মুগ্ধ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ওমর খৈয়ামের কবিতার "প্রধান জিনিসটা বস্তু নয়, গতি।" নরেন্দ্র দেবের রচনায় সেই 'গতি' আশানুরূপ রয়েছে কিনা, তা রসজ্ঞের বিচার্য। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, নজরুলের অনুবাদ ছন্দ:প্রসাদে অধিকতর গতিশীল এবং মূলের দিক থেকেও অনেক বেশী নির্ভরশীল।

৫

নজরুল আনপারা, হাফিজ এবং ওমর খৈয়াম ছাড়াও কিছু বিদেশী কবিতার ভাবানুবাদ করেছেন। ১৩২৭ মাঘের 'মোসলেম ভারতে' তাঁর 'বিরহ-বিধুরা' প্রকাশিত হয়; তার প্রথম দু'চরণ :

কার তরে? ছাই এ পোড়ামুখ
আয়নাতে আর দেখবো না।
সুর্মা রেখার কাজল হরফ
নয়নাতে আর লেখবো না॥

কবিতাটির নীচে পাদটীকায় লেখা আছে : "পুশতো ভাষার খ্যাতনামা কবি খুশখাল খান খটকের হিন্দুস্থানে নির্বাসনকালে তাঁর সহধর্মিণীর লিখিত একটি কবিতার ভাব অবলম্বনে।"
৮-বৈশাখ ১৩৩৪-এর 'গণবাণী'তে নজরুলের সুবিখ্যাত 'অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত' ছাপা হয়; তার ধুয়া :

জাগো—
জাগো অনশন-বন্দী, ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত॥

২২-বৈশাখ ১৩৩৪-এর 'গণবাণীতে' প্রকাশিত হয় তাঁর 'জাগর-তূর্য'—'শেলীর ভাব অবলম্বনে" লেখা। এ দু'টি লেখার নীচেই রচনার স্থান ও তারিখ মুদ্রিত আছে : "কলিকাতা ১লা বৈশাখ, ১৩৩৪।"
১৩৩৪ অগ্রহায়ণের 'সওগাতে' নজরুলের সুদীর্ঘ কবিতা : 'অগ্রপথিক' প্রকাশিত হয়। কবিতাটির শিরোনামের পাশে তারকা-চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় ছাপা হয় : "হুইটম্যানের অনুরণনে।" (সওগাত, ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৪৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই কবিতাটির বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান তাঁর 'নজরুল ইসলাম' পুস্তকে মন্তব্য করেছেন : "দীর্ঘ ইংরেজী কবিতার প্রত্যেক স্তবক, প্রতি চরণ, কখনো বা শব্দ পর্যন্ত ভাষান্তরিত হয়েছে" (২৩ পৃ:) "অথচ তার স্বীকৃতি কোথাও নেই" (১৯ পৃ:)। এই মন্তব্যে মনে হয়, উপরোক্ত পাদটীকাটুকু জনাব আলী আহসানের দৃষ্টিতে পড়েনি। বলা বাহুল্য যে, সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য এ-ধরনের খুঁটিনাটি বিষয়ও লক্ষ্য করা দরকার; অন্যথা অনেক সময় গলদ্ঘর্ম পরিশ্রমও প্রমাণিত হয় অসার। তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, নজরুল সাহিত্যের মূল্য-নিরূপণে আলী আহসান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন প্রচুর, যদিও তাঁর উপকরণের পরিমাণ স্বল্প। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, নজরুলের জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য যত বেশী সংগৃহীত হবে, তাঁর রচনার বিচার ও বিশ্লেষণ তত বেশী সুবিচিন্ত্র ও সারগর্ভ হবে।

আশার কবি

ডক্টর মাহমুদ হাসান

১৯২৬-২৭ সালের দিকে নজরুলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তখন পুরনো মুসলিম হলের প্রোভোস্ট। মুসলিম হলে একটি সাহিত্যসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় এত লোক হয়েছিল যে সমস্ত এ্যাসেম্বলি হলের কোথাও বিন্দুমাত্র ফাঁক ছিল না। সভা কেবল শুরু হয়েছে এমন সময় একজন মাঝারী আকারের কুর্তা ও পায়জামা পরা যুবক হাঁটতে হাঁটতে ভিতরে ঢুকলেন। কারও সঙ্গে একটি কথা কিংবা শুভেচ্ছা বিনিময় না ক'রে তিনি একটি খোলা হারমোনিয়ামের সামনে বসলেন এবং গান গাইতে শুরু করলেন।
তখনও পর্যন্ত আমি নজরুলের নাম শুনিনি কিন্তু তাঁর গান গাওয়ার সুন্দর ভঙ্গি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল। সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন হ'য়ে তিনি গান করছিলেন---আশপাশের লোকজন সম্বন্ধে যেন তাঁর কোন খেয়ালই নেই।

পরদিন আমি তাঁর নৈশভোজে আমার বাসায় নিমন্ত্রণ করলাম। আমি লক্ষ্য করলাম তিনি অতিশয় লাজুক—কেবল গান গাওয়ার সময়টুকু ছাড়া। আর যখন তিনি গান করেন তখন তিনি ভুলগাহীন।
নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে 'বিদ্রোহী কবি' ব'লে পরিচিত। অসংখ্য কবি এবং তথাকথিত 'বিদ্রোহী' বাংলায় যথেষ্ট খ্যাতিমান: সুতরাং নজরুল ইসলামেক যদি শুধুমাত্র তেমন সাধারণ অর্থে একজন 'বিদ্রোহী কবি' ব'লে মনে করা হয় তবে সেটা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয় বলেই আমার ধারণা। ইকবাল তাঁর অনেক কবিতায় অভিযোগ ক'রে বলেছেন যে তিনি কবি নন— তিনি বলেছেন তিনি 'জীবনের গোপন রহস্যে'র গান করেন এবং বাণী দান করেন—জীবনের বাণী। নজরুল ইসলাম জীবনের কঠোর বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। নিজেকে তিনি সেই পাখীর সংগে তুলনা করেছেন যে কোন এক অজানা ঊর্ধ্বে উড়ে বেড়ায়: তিনি তাঁর কর্মময় সাহিত্য জীবনে 'সত্য' ও 'চির-সুন্দরে'র অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সুন্দরের ধ্যান তাঁকে কুৎসিতের ঘন সান্নিধ্যে টেনে এনেছিল---তিনি অত্যাচারীর নির্যাতন, অবিচার ও জীবনের স্বার্থপরতাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সত্যিকারভাবে তিনি জনগণের কবি, তিনি তাদের নিগ্রহ ও নির্যাতনের অংশীদার হিসাবে সে-সবকে অনুভব করেছিলেন। সত্যিকার কবি আশার বাণী বয়ে নিয়ে আসেন এবং তাঁর পাঠক ও শ্রোতার মনে সেই সাহস সঞ্চার করতে পারেন—যা দিয়ে তারা

সকল দুঃখ দুর্দশা ও আতঙ্ককে অকুতোভয়ে মোকাবেলা করতে পারে। নজরুল ইসলাম তাঁর মহৎ কবিতা সমূহে সেই বাণীর আলোক জ্বালতে পেরেছিলেন যাতে দরিদ্র ও নিপীড়িতেরা পেয়েছে বাঁচার আশ্বাস, নৈরাশ্যপীড়িত পাঠক পেয়েছে আশার সঞ্জীবনী। তাই আমি নজরুলকে "বিদ্রোহী কবি" বলি না, বলি 'আশার কবি'।

নজরুল ইসলামের কবিতার একটা দিক এখনও তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করেনি—যেটা তিনি সত্যিকারভাবে দাবী করেন। বলা হয় যে রবীন্দ্র-সূর্য যখন কাব্যগগনকে পূর্ণ করে ছিলো সে সময় তিনি 'ধূমকেতু'র মত উদিত হন। রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতি সামান্যতম অশ্রদ্ধা জানানোর ইচ্ছা আমার নেই—যাঁর সঙ্গে পরিচয়লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরই মত নজরুল ইসলাম বাঙলা কবিতায় এক নতুন সুরের স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় হিন্দী বৈষ্ণব কবিতার বেশ খানিকটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়: নজরুল ইসলাম সর্বপ্রথম অতি সার্থকতার সংগে আধুনিক বাংলা-কাব্যে ফারসী গজলের প্রাণরস প্রতিষ্ঠিত করলেন—তিনি হাফিজ কিংবা অন্যান্য মহান গজল লিখিয়ে-দের অনুকরণ করেননি: তিনি তাঁদের থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে নতুন কাব্য সৃষ্টি করলেন—যা বাংলা সাহিত্যে অভিনব এবং মৌলিক, ছন্দে, সুরে, চিত্রকল্পে এবং সৌন্দর্যে যা অনন্য। আমার বাড়ীতে তিনি যখন তাঁর এই সুন্দর গজল 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল'—গাইলেন আমি রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলাম। নজরুল ইসলাম অনুকারক নন, স্রষ্টা—সত্যিকার স্রষ্টা। আমি দেখতে চাই পূর্ব বঙ্গের তরুণ কবিরা কাজী নজরুল ইসলামের মত মহান পারসী কবিদের সুর, ছন্দ, চিত্রকল্প ও প্রাণপ্রাচুর্যে অনুপ্রাণিত হ'য়ে শৈল্পিক দক্ষতায় নতুন ধরনের কাব্য সৃষ্টি করবেন।

এই ক্ষুদ্র পরিসরে নজরুল ইসলামের সব কবিতা ও তার সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ ইকবালের সঙ্গে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গির এবং প্রকাশভঙ্গির আত্মিক মিল লক্ষ্য করা যায়। খুদী, কুফর, মৃত্যু ও জীবন সম্পর্কে এবং হজরত উমর, খালেদ ও কামাল প্রভৃতি মুসলিম বীরদের সম্পর্কে ইকবালের ধারণা ও রাজনৈতিক মানসিক ও আত্মিক ব্যাপার সংক্রান্ত ভাবনা চিন্তা নজরুলের কাব্যে রূপলাভ করতে দেখা যাচ্ছে। নজরুলের আত্মশক্তি, দারিদ্র্য, জীবনের গান এবং হজরত উমর, খালেদ এবং কামালের উপর লিখিত কবিতা ইকবালের কবিতার প্রতিরূপ বলে মনে হয়। যেমন ধরুন নজরুল তাঁর 'আত্মশক্তি' কবিতায় লিখেছেন:

> জাগাও জাগাও, ক্ষুদ্রেরও মাঝে বাজিছে রুদ্র তেজ রবির।
> উদয় তোরণে উড়ুক আত্ম-চেতন-কেতন "আমি আছি"-র,।
>
> করহ শক্তি-সুপ্ত-ত্রাস
> রুদ্র বোধনে উদ্বোধন,
> হীন রোদন—
> ক্লিন্ন-জন
>
> দেখুক আত্ম-সবিতার তেজ বক্ষে বিপুলা ক্রন্দসীর।
> বল, নাস্তিক হউক আপনা মহিমা নেহারি' তুচ্ছবীর।

কে কবে কাহারে নির্যাতন
আত্মচেতন স্থির যখন?
ঈর্ষা-রণ
ভীম-মাতন

পদাঘাত হানে পক্ষরে শুধু আত্ম-বল-অবিশ্বাসীর,
মহাপাপী সেই, সত্য যাহার পর পদানত আনত শির।

জাগাও আদিম স্বাধীন প্রাণ,
আত্মা জাগিলে বিধাতা চান।
কে ভগবান?
আত্ম-জ্ঞান!

গাহে উদগাতা ঋত্বিক্ গান অগ্নিময় শক্তি-শ্রীর।
না জাগিলে প্রাণে সত্য চেতনা, মানি না আদেশ কারো বাণীর।

ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোতে এই চিন্তাধারাই মহিমময়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ দু'জনের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কোন সাক্ষাৎ ঘটেনি কিন্তু নজরুলের করাচীতে অবস্থান ও পারসী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর এই সমসাময়িক অগ্রজ কবির প্রতিও তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে থাকবে। বলা বাহুল্য নজরুলের উদয়কালে ইকবাল জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে অবস্থান করছিলেন।

আমার সুনিশ্চিত ধারণা চেতন ও অবচেতনভাবে বৃদ্ধ ও পরিণত ইকবালের সঙ্গে সৌন্দর্য ও সত্যানুসন্ধিৎসু আবেগপ্রবণ এই যুবক বাঙালী কবির আত্মিক যোগাযোগ ঘটেছিল।

আমরা প্রায়শ: সাধারণভাবে মুখে মুখে কবিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হই—তাঁদের কাব্যের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করি না, তাঁদের কাব্যের রূপ, সৌন্দর্য ও বাণীর সত্যিকার মূল্য নিরূপণ করার ও তার মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। সেই সাধারণ প্রশংসার শিকার নজরুল হয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যের গভীরে যাওয়ার ও তাঁর সৃষ্টির মূল্য নিরূপণ করার কোন সত্যিকার প্রয়াস আজও পরিলক্ষিত হয়নি।

নজরুল ইসলাম আজও জীবিত কিন্তু সম্বিতহারা। দুনিয়ার কর্মজীবন থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন। জগৎ, জীবন ও মানুষের সম্পর্কে তিনি এমন সুতীব্রভাবে চিন্তা করেছেন যে সে আবেগের প্রচণ্ড চাপ তাঁর পক্ষে দীর্ঘদিন সহ্য করা সম্ভব হয়নি। তাঁর ধমনী দগ্ধীভূত হয়েছে, তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। নিজের এই পরিণাম সম্বন্ধে তিনি পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ধূপের মত দগ্ধ হ'য়ে পুড়ে পুড়ে তিনি নিশ্চল হ'য়ে যাবেন—কোলাহলের উচ্চনাদে মানুষকে আর জাগাবার চেষ্টা করবেন না। তিনি অবশ্য জানতেন যে তাঁর আত্মা অমর এবং তাকে হত্যা করাও সম্ভব নয়।*

অনুবাদ : শাহাবুদ্দীন আহমদ

*১৯৭২ সালের দৈনিক মর্নিং নিউজের ২৫শে মে, নজরুল জয়ন্তী সংখ্যা থেকে গৃহীত।—সম্পাদক।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' প্রসঙ্গে

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্

নজরুলের বিদ্রোহী-চেতনা ও 'বিদ্রোহী' কবিতার উৎস-সন্ধান করতে হলে তাঁর সাহিত্য-জীবনের পটভূমি এবং আদি-পর্বের দিকে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে। মনে রাখতে হবে, নজরুলের যে-রচনাটি পাঠক ও সুধী-সমালোচক মহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি কবিতা নয়, গদ্য। কিশোর-বয়সে লেটোর দলের জন্যে গান রচনা করলেও, নজরুলের সাহিত্য-সাধনা সম্ভবতঃ গদ্য রচনা দিয়েই শুরু। কবির স্কুল-জীবনের সহপাঠী-বন্ধু প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা থেকে জানা গেছে, প্রথম জীবনে নাকি নজরুল লিখতেন গল্প, আর তিনি অর্থাৎ শৈলজানন্দ নিজে লিখতেন কবিতা। যদিও পরবর্তী জীবনে নজরুল বাংলা-কাব্যে যুগান্তর আনেন এবং শ্রীশৈলজানন্দ বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেন।

নজরুল কবি হিসাবে অনন্য কীর্তির অধিকারী এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগস্রষ্টা-কবিরূপে স্বীকৃত, পরিকীর্তিত। কথা সাহিত্য রচনায়ও তিনি তাঁর প্রতিভা এবং দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম দিকপাল শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের, বলতে গেলে, কাব্যক্ষেত্রে কোনো স্বাক্ষরই নেই। তিনি যে এককালে কবিতা লিখতেন, এ তথ্যও জানা গেছে তাঁর স্মৃতিচারণায়। নজরুল যে কথা-সাহিত্য রচনায় ও গদ্যশিল্পে তাঁর সৃজনী-প্রতিভা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন সেটি কোনো কাকতালীয় কিংবা আকস্মিক ব্যাপার নয়। আলোচনার শুরুতে যে বলেছি, নজরুলের যে-রচনাটি প্রথম সাধারণ পাঠক ও সুধী-সমালোচক মহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি কবিতা নয়, গদ্য। একথাটি মনে রাখলে গদ্য রচনায় নজরুলের কৃতিত্বের উৎস ও কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

কৈশোরেই কবিতা রচনা শুরু করলেও, নজরুলের প্রকাশিত রচনা সর্বপ্রথম কবিতা নয়। ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সওগাত'-এ প্রকাশিত 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'ই নজরুলের প্রকাশিত সর্বপ্রথম রচনা। যতদূর জানা যায়, নজরুলের এই গদ্য রচনাটিই প্রথম সাধারণ পাঠক ও সুধী-সমালোচক মহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বক্তব্যের সমর্থনে শুধু এটুকুই উল্লেখ করা যথেষ্ট যে নজরুলের জীবন ও সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে যাঁরা স্মৃতিচারণমূলক রচনা লিখেছেন, তাঁদের অধিকাংশই উল্লেখ করেছেন যে, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' পড়েই তাঁরা এর লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন। এবং এই লেখকের রচনাশক্তি তাঁদের মুগ্ধ করে।

বলেছি, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'ই নজরুলের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম রচনা। এর আগেও অবশ্য তিনি অনেক কবিতা ও গদ্য রচনা প্রকাশের জন্যে পত্র-পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলো প্রকাশের জন্যে মনোনীত হয়নি। 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন:

'সওগাত' প্রকাশিত হবার প্রায় পরপরই (১৯১৮) নজরুল করাচী থেকে লেখা পাঠাতে শুরু করেন—প্রচুর লেখা। লেখার সঙ্গে থাকতো চিঠি—অনেকগুলি লেখা বাতিল হওয়ার পর 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' হাতে আসে ডাকের মারফৎ। গল্পটি 'সওগাতে' প্রকাশিত হওয়ার পর এর প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। মুসলমান সমাজের কোনো লেখক তখন ঐরূপ ভাষায় ঐ ধরনের কিছু লিখতেন না, বা লিখতে পারতেন না। লেখাটি খুব উচ্চমানের না হলেও, আঙ্গিক ও গতিশীলতার দিক দিয়ে অনেকের চোখে খুবই নতুন ঠেকলো। এর আগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নজরুল ছিলেন অজ্ঞাত - 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' প্রকাশে ঘোষিত হলো তাঁর প্রথম আবির্ভাব। সাহিত্যিক মহলে তাঁকে নিয়ে শুরু হলো জল্পনা। (সওগাত ও নজরুল ইসলাম, সওগাত, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১)।

নজরুলের গদ্য রচনা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' প্রকাশের সাথে-সাথেই পাঠক ও সুধী-সমালোচক মহলের দৃষ্টি কতটা আকর্ষণ করেছিল, প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদের স্মৃতিচারণা থেকেই সেটা বোঝা যায়। 'জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত: নজরুল ইসলাম' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> ১৯১৯ সালের এক ছুটিতে বাড়িতে শুয়ে শুয়ে একদিন শামসুদ্দীন (প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন) ও আমি মাসিক কাগজপত্র পড়ছিলাম। হঠাৎ 'মোসলেম ভারত'-এ কি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় ঠিক মনে নাই, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' নামে একটি গদ্য-রচনা পড়লাম। এক সঙ্গে দু'জনে উঠে বসলাম বিস্ময়ে। প্রশ্ন করলাম, কার লেখা এটা? তখন লেখার শেষে লেখকের নাম লেখার রেওয়াজ ছিল। লেখার শেষে দেখলাম হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম, করাচী বন্দর। কোনো মুসলমান ভালো বাংলা লিখতে পারে একথা তখন অবিশ্বাস্য ছিল। 'বিষাদ-সিন্ধু' মীর মোশাররফ হোসেন লিখেছেন, এটা সেকালে অনেকেই বিশ্বাস করতেন না। কাজেই আমরা একাধিকবার সেই লেখা পড়লাম। কে এই নজরুল ইসলাম হতে পারে? বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেরই নাম তখন আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। অবশেষে দুই বন্ধুতে একমত হলাম, যদি সত্যিই এই লেখক মুসলমানই হয়ে থাকে, তবে সে একদিন বাংলা সাহিত্যের একটা দিকপাল হবে।
>
> [নজরুল-পরিচিতি, পৃঃ ১১৩]

আবুল মনসুর আহমদের এই অতীত-দিনের স্মৃতিচারণার তথ্যগত দিক থেকে কিছুটা ভুল আছে। নজরুলের 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' প্রকাশিত হয়েছিল 'সওগাত'-এ, 'মোসলেম ভারত' কিংবা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় নয়। 'সওগাত'-এর কথা তাঁর আদৌ মনে পড়েনি, যদিও তিনি বলেছেন, হঠাৎ 'মোসলেম ভারত'-এ কি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় ঠিক মনে নাই, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' পড়লাম।" আবুল কালাম শামসুদ্দীন যখন তাঁর স্মৃতিচারণায় এ-প্রসঙ্গে কোনো পত্রিকার নামই উল্লেখ করেননি, তিনি লিখেছেন :

> তখন আমি আই-এ ক্লাশের ছাত্র—ঢাকা কলেজে পড়ি। সাহিত্যের নেশায় পাঠ্য পুস্তকের চাইতেও অপাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নেই মনোযোগটা বেশী। 'আল-এসলাম', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ও আরও দু'একটি পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ তখন আমার বেরিয়েছে। মোট কথা,

সাহিত্যিক হবার কসরত প্রাণপণেই চলেছে। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন এক পত্রিকার একটা অদ্ভুত লেখা চোখে পড়লো। লেখাটার নাম : 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' —লেখক : হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। লেখাটা এত সুন্দর লাগলো যে, এই হাবিলদার নজরুল ইসলাম কে তা জানবার জন্য অধীর হয়ে উঠলাম। এর নাম আগে কখনো শুনি নাই। প্রথম লেখাই যাঁর এত সুন্দর, পরবর্তীকালে তাঁর লেখা যে বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ বলে গণ্য হবে, এ-ধারণা আমার মনে দৃঢ়মূল হয়ে রইল।— [পরিচয়-স্মৃতি : দৃষ্টিকোণ, পৃঃ ২২৯]

আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর আত্মজীবনী ও স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'অতীত দিনের স্মৃতি'তে লিখেছেন :

আবুল মনসুর আহমদ তখন ময়মনসিংহ মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে থেকে গেলেও ঢাকায় মাঝে মাঝে আসত এবং আমার হোস্টেলেই উঠত। সে আসলেই দু'জনে মিলে সাহিত্যালোচনা শুরু হতো। সম্ভবতঃ একবার গরমের ছুটিতে দেশের বাড়ীতে একদিন মাসিক 'সওগাত'এর এক সংখ্যা আমাদের হাতে এল এবং তাতে দেখা গেল, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' শীর্ষক একটি সুন্দর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের নাম দেখলাম হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। লেখাটি আমাদের এত ভালো লাগলো যে, হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম কে তা জানতে আমাদের আগ্রহ দুর্বার হয়ে উঠল।— [পৃঃ ২০-২১]

নজরুলের প্রথম-প্রকাশিত রচনা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' পড়ে আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখের মনে যে-আশাবাদ জেগেছিল, তা সত্য হয়েছে। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গদ্যরচনা তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সেকালেই পাঠক ও সুধী-সমালোচক মহলে এমন আশাবাদ জাগিয়ে তুললেও, তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা কিন্তু সাধারণ পাঠক ও সুধী সমালোচক মহলে তেমন রেখাপাত করেনি, আশাবাদ জাগিয়ে তোলেনি। কিশোর কবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের মনে জাগেনি কোনো উচ্চাশা। নজরুলের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য়— কবিতাটির নাম 'মুক্তি'। সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা নজরুলের এই কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি :

রাণীগঞ্জের, অর্জুনপাটির বাঁকে
যেখান দিয়ে নিতুই সাঁঝে ঝাঁকে ঝাঁকে
রাজার বাঁধে জল নিতে যায় শহরে বৌ কলস কাঁখে—
সেই সে বাঁকের শেষে
তিন দিক হ'তে তিনটে রাস্তা এসে
ত্রিবেণীর ত্রিধারার মত গেছে একেই মিশে
তে-মাথার সেই 'দেখাশুনা'-স্থলে
বিরাট একটা নিম গাছের তলে
জটওয়ালা সে সন্ন্যাসীদের জটলা বাঁধত বেশী
গাঁজার ধুমায় পথের লোকের আঁতে হত ব্যথা

[মুক্তি]

নজরুলের 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সওগাত'এ, আর 'মুক্তি' ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' পত্রিকায়। 'মুক্তি'র কয়েকটি পংক্তি উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এখন পাশাপাশি উদ্ধৃত করা যাক নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'র কিছু অংশ :

> 'কি ভায়া! নিতান্তই ছাড়বে না? একদম এঁটেল মাটির মত লেগে থাকবে? আরে ছোঃ! তুমি যে দেখছি চিটে গুড়ের চেয়েও চ্যাটচিটেল! তুমি যদিও জান আমার এক গ্লাসের ইয়ার, তবুও সত্যি বলতে কি, আমার সে-সব কথাগুলো বলতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। কারণ, খোদা আমার গড়ন করবার সময় মস্ত একটা গলদ ক'রে বসেছিলেন, কেননা চামড়াটা আমার ক'রে দিলেন হাতীর চেয়েও পুরো, আর প্রাণটা করে দিলেন কাদার চেয়েও নরম। আর কাজেই দু'চারজন মজুর লাগিয়ে আমার এই চামড়ায় মুগুর বসালেও আমি গোঁফে তা দিয়ে বলব, 'কুচ পরওয়া নেই।' কিন্তু আমার এই 'নাজোক' জানটায় একটু খাঁচড় লাগলেই ছোট মেয়ের মত চেঁচিয়ে উঠবো। তোমার 'বিবাশি দশ আনা' ওজনের কিলগুলো আমার এই স্থূল চর্মে স্রেফ আরাম দেওয়া ভিন্ন আর কোনো ফলোৎপাদন করতে পারে না। কিন্তু যখনই পাকড়ে বস, 'দাদা তোমার সকল কথা খুলে বলতে হবে' তখন আমার অন্তরাত্মা ধুক ধুক করে ওঠে,— পৃথিবী ঘোরার ভৌগোলিক সত্যটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। চক্ষেও যে সর্ষপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে পারে বা জোনাকী পোকা জ্বলে উঠতে পারে, তা আমার মত এই রকম শোচনীয় অবস্থায় পড়লে তুমিও অস্বীকার করবে না।' [বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী]

পাশাপাশি দু'টি উদ্ধৃতাংশের তুলনামূলক আলোচনায় লক্ষ্য করা যাবে যে, নজরুলের কবিতার তুলনায় তাঁর গদ্য রচনা সে সময়েই ছিল অনেকখানি পরিণত। 'লেখাটি খুব উচ্চমানের না হলেও, আঙ্গিক ও গতিশীলতার দিক দিয়ে অনেকের চোখে খুবই নতুন ঠেকলো'- এর যথার্থ কারণও সবটুকু লেখা পড়লে সহজেই অনুধাবন করা যায়। শুধু 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'ই না, নজরুলের সেকালের অন্যান্য গদ্যরচনা বিশেষ করে ছোট গল্প, কবিতা ও উপন্যাস ইত্যাদি পড়লেও বোঝা যায়, তাঁর কবিতার চেয়ে গদ্যশিল্প ছিল অনেক উন্নত। নজরুলের কবি-কল্পনা ও উপমা ব্যবহারের প্রবণতা এবং শক্তির কিছু পরিচয় আছে 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'তেই উদাহরণ :

> আজকালকার ছোকরারা নিতান্ত বেহায়ার মত নিজে বৌ পছন্দ করে আসে। নিজের শরীর যে আবলুস কাঠের চেয়েও কাল বা কেঁদো কাঠের চেয়েও এবড়োখেবড়ো, সেদিকে দৃষ্টি নেই, কিন্তু বৌটির হওয়া চাই দস্তুর মত দুধে আলতার রং, হরিণের মত নয়ন, অন্তত পটল-চেরাও চাই-ই, সিংহের মত কটিদেশ, চাঁদের মত মুখ, কোকিলের মত কণ্ঠস্বর, রাজহংসীর গমন, রাতুল চরণ কমল, কারণ বাসরঘরের সময় যদি 'দেহি-পদপল্লব উদারম' বলে তাঁর চরণ ধরে ধন্না দিতে হয় আর সেই সব চরণ যদি গড় ফর বিড (খোদা না করেন) গদাধরের পিসীর ঠ্যাং-এর মতই শক্ত কাঠপারা হয়, তা'হলে বেচারারা একটা আরাম পাওয়া হতে বঞ্চিত হয়, আর বেজার রসভঙ্গ হয়।

কবি আবদুল কাদির লিখেছেন, '১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে আগস্ট তিনি (নজরুল) করাচী ক্যান্টনমেন্ট থেকে সাহিত্য পত্রিকায় (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা) একটি সুদীর্ঘ গাথা

ও একটি ছোটগল্প পাঠিয়েছিলেন এবং সম্পাদককে অনুরোধ করেছিলেন যে তাঁর এত বেশী লেখা ছাপাবার মতো জায়গা যদি পত্রিকাটিতে না থাকে তা' হলে এর যে-কোনো একটি লেখা যেন 'সওগাত' সম্পাদককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৩২৬ সালের কার্তিক সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয় তাঁর 'হেনা' গল্প। সেই গল্পটি পড়ে সমজদার পাঠকেরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারেন যে বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ শক্তিধর প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছে।'—[নজরুল-পরিচিতি]

এ থেকেও স্পষ্ট হয় যে, কবিতার মাধ্যমে নয়, গদ্য রচনার মাধ্যমেই নজরুল তাঁর সৃজনী প্রতিভার পরিচয় প্রথম স্বাক্ষরিত করেছিলেন। তবে, গদ্যরচনা হলেও, নজরুল যে মূলত: কবি এবং প্রতিভাবান কবি, তা এইসব গদ্য রচনাও চিনিয়ে দিয়েছিল সেই আদিপর্বেই। জানা যায়, নজরুলের 'ব্যথার দান', গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে সেকালেই অনেকে এই গ্রন্থটিকে গদ্য কাব্য আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। কোনো কোনো সমালোচক এর সঙ্গে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম'-এর তুলনা করেছিলেন। [দ্রষ্টব্য : কথাশিল্পী নজরুল, মাজিয়া সুলতানা, পৃ: ৭৮ - ৬৯]

নজরুলের 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' ইত্যাদি গ্রন্থের গদ্য রচনাকে গদ্যকাব্য আখ্যায়িত করলে হয় তো ভুল হবে না। কেননা, এসব গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় কাব্যধর্মিতা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। নজরুলের আদি-পর্বের কবিতায় কিছুটা 'কবিত্বের' অভাব থাকলেও, গদ্যরচনায় নেই। কারণ সম্ভবত: এই যে, নজরুলে কবি কল্পনা ও সৌন্দর্যানুভূতির প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল গদ্য রচনার মাধ্যমে। কবির নিজের ভাষায়, 'আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটগল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন।' - [আমার সুন্দর]

নজরুলের গদ্য রচনা যে সেকালেই গতিশীল, সজীব সাবলীল আর কবিত্বময় হয়েছিল, শুধু ছোটগল্পে নয়, তাঁর চিঠিপত্রের ভাষায়ও সে প্রমাণ আছে। ১৯১৯ সালে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা নজরুলের একটি চিঠির ভাষা :

> পারসীক কবি হাফিজের মধ্যে বাঙলার সবুজ দূর্বা ও জুঁই ফুলের সুবাস আর প্রিয়ার চূর্ণ কুন্তলের যে মৃদু-গন্ধের সন্ধান আমি পেয়েছি, সে সবই তো খাঁটি বাঙলার কথা, বাঙালী জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, আনন্দরসের পরিপূর্ণ সমারোহ। কত শত বছর আগের পারস্যের কবি আর কোথায় আজকের সদ্য শিশির-ভেজা সবুজ বাঙলা। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের রুক্ষ পরিবেশে মৃত্যুসমারোহের মধ্যে বসে এই যে চিরন্তন প্রেমিক মনের সদ্ভাব আমি চাক্ষুষ করলাম, আমার ভাষায়, আমার আপনজন বাঙালীকে সেই কথা জানাবার ব্যাকুল আগ্রহই এই এক টুকরো কবিতা হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। জানি না, জুঁই ফুলের মৃদু গন্ধ ও দূর্বার শ্যামলতা এর মধ্যে ফুটেছে কি না। তবু বাঙালীর সচেতন মনে মানুষের ভাব-জীবনের এই একাত্মবোধ যদি জাগাতে পারে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।'

নজরুলের অল্পবয়সে লেখা এই পত্রের ভাষায় অকারণ উচ্ছ্বাস কিংবা কাব্যিকতা নেই, আছে পরিণত মনের ছাপ, রচনার সহজ নৈপুণ্যের পরিচয়। নজরুলের গদ্য রচনা বিশেষ করে কথা-সাহিত্যের

মাধ্যমে শুধু তাঁর কবির শক্তি, কল্পনা প্রতিভা, আবেগ অনুভূতি ও রচনা নৈপুণ্যের প্রথম সার্থক প্রকাশই ঘটেনি, বিদ্রোহী চেতনারও প্রথম প্রকাশ ঘটেছে। কবি আবদুল কাদির লিখেছেন :

> ১৩২৭ সালের বৈশাখে আফজাল-উল-হকের পিতা কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় 'মোসলেম ভারত' বের হয় ; তার প্রথম সংখ্যা থেকে নজরুলের 'বাঁধনহারা' নামক পত্রোপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। 'বাঁধনহারা' বোধ হয় বাংলা ভাষার প্রথম পত্রোপন্যাস। এর অনেকখানি অংশ তিনি করাচী অবস্থানকালে রচনা করেছিলেন। 'বাঁধনহারা'র মূলে ছিল প্রেমের ব্যর্থতা, সেই ব্যর্থতা শেষে রূপান্তরিত হয়েছিল বিদ্রোহে। পরিণত বয়সেও তিনি যে বন্ধনমোচন ও আত্মিক মুক্তির কথা বলেছেন, তারও আভাস এই উপন্যাসখানিতে পাওয়া যায়। এই পত্রোপন্যাসে 'সাহসিকা'র এক সুদীর্ঘ পত্রে যে বিদ্রোহের বর্ণনা আছে তারই পূর্ব প্রকাশ পরবর্তীকালে তাঁর সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতায় দেখা যায়। [নজরুল পরিচিতি, পৃ ৬—৭]

এই বক্তব্যের সত্যতা : 'সাহসিকা'র পত্রের আংশিক উদ্ধৃতি থেকেই অনুধাবন করা যাবে বলে মনে করি। 'সাহসিকা'র পত্রে আছে :

> 'নূরুকে খুদার বিদ্রোহী বলে তোর ভয় হয়েছে বা দুঃখ হয়েছে দেখে আমি তো আর হেসে বাঁচিনে। নূরুটাও খুদার বিদ্রোহী হল, আর অমনি খুদার সৃষ্টিটাও তার হাতে এসে পড়লো আর কি! এখন ওর কাঁচা বয়েস, গায়ের আর মনের দুই-এরই শক্তিও যথেষ্ট, তার শরীরে উদ্দাম উন্মাদ যৌবনের রক্ত হিল্লোল বা খুন জোশীলা তীব্র উন্মাদনায় ছুটোছুটি করছে, তার উপর আবার এই স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল বাঁধনহারা সে, অতএব এখন রক্তের তেজে আর গরমে সে কত আরো অসম্ভব সৃষ্টি-ছাড়া কথাই বলবে! এখন সে হয়তো অনেক কথা বুঝেই বলে, আবার অনেক কথা না বুঝেই শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসেই বলে ফেলে। এটা ভুলিসনে যেন, বোন, যে এ-ছেলে বাংলাতে জন্ম নিলেও বেদুঈনদের দুরন্ত মুক্তি পাগলামি, আরবীদের মস্ত গোঁড়া, তুর্কীদের রক্ত-তৃষা তীব্র স্রোতাবেগের মত ছুটছে এর ধমনীতে ধমনীতে। অতএব এ-সব ছেলেকে বুঝতে হলে এদের আসল সত্য কোন্খানে, সেইটেই সকলের আগে খুঁজে বের করতে হবে। এই যে ধর্ম, তার ও তো সামাজিক সত্য, লৌকিক সত্য, সাময়িক সত্য ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকমের না বাইরের খোলস-মুখোশ রয়েছে, তাই বলে কি এইসব অনিত্য সত্যকে ধর্মের চিরন্তন সত্য বলে ধরতে হবে। …প্রত্যেক ধর্মই সত্য — শাশ্বত সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং কোন ধর্মকে বিচার করতে গেলে তার এই মানুষের গড়া বাইরের বিধান-শৃঙ্খলা দিয়ে কখনো বিচার করবে না…তেমনি মানুষকে তার চির অমর আত্মাকে তার সত্যকে বুঝতে হলে তার অন্তর দেউলে প্রবেশ করতে হবে ভাই। তার বাইরের মিথ্যা আচার-ব্যবহারকে সত্য বলে ধরব কেন? হয়তো আমি কথাগুলো বেশ গুছিয়ে বলতে পারছিনে, আর পারবোও না, কেননা, আমার মনের সে শান্তি ধৈর্য নেই।' এই ভণ্ডামি, এই প্রস্রবণই তো এদের সত্য। অতএব এদের মত এমনি করে আমাকে বিসর্জন না করে তাদেরই একজন যদি সত্যকে পাবার জন্য নিজের নতুন পথ কেটে নেয়, তবে এরা নাস্তি-

সোঁটা নিয়ে যে তাকে তাড়া করবেই; কিন্তু নির্বীর্যের মত একজন সত্যান্বেষী বিদ্রোহীকে তাড়া করবার মত শক্তি এ বিশ্বাক ভণ্ডদের যে বিলকুল নাস্তি।

আমরা জানি, মুক্ত কবি নজরুলেরই ডাক-নাম। কাজেই বুঝতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হয় না যে সাহসিকা তার পত্রে অর্থাৎ নজরুল তাঁর এই রচনায় নিজের বিদ্রোহী চেতনা এবং মনোভাবের কথাই লিখেছেন। এ-থেকেই বোঝা যায় যে, 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখার অনেক আগেই তাঁর মনে এই চেতনা ও মনোভাবের জন্ম। এ-থেকে আরেকটি সত্যও উদ্ভাসিত হয় যে, নজরুল কবি মোহিতলাল মজুমদারের গদ্য রচনা 'আমি' পড়ে তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখেছেন—মোহিতলালের এই দাবী কত ঠুনকো। আবদুল মান্নান সৈয়দ যে লিখেছেন, "প্রসঙ্গতঃ মোহিতলাল যে-দাবী তুলেছিলেন, 'আমি' কথিকা থেকে 'বিদ্রোহী' উদ্ভূত হয়েছে, তাতে তাঁর প্রাপ্য অনেকে উড়িয়ে দিয়েছেন একেবারেই। কিন্তু কবিমানসের যে-পর্যায়টিকে বলা যায় 'প্রেরণার উৎসভূমি' সেই প্রাথমিক দেশে মোহিতলালের কথিকাটি নজরুলের 'বিদ্রোহী' ফলাতে সহায়তা করেছিলো—এতে আমি কোনো সন্দেহ দেখি না। নিশ্চয় মোহিতলালের অভিপ্রায় থেকে নজরুলের উৎকাঙ্ক্ষা আলাদা হ'য়ে গেছে; তবু প্রাথমিকভাবে 'বিদ্রোহী'র জন্যে নজরুলের মানসজমি তৈরী করেছে ঐ রচনাটি।" [দ্রষ্টব্য : বিদ্রোহী : এক ভাষ্য, রবিবাসরীয় ইত্তেফাক, ১৮ই ভাদ্র ১৩৮৪]
এই মন্তব্য এবং বিশ্লেষণ যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য হারায় নাকি? 'সাহসিকার' সুদীর্ঘ পত্র এবং 'বিদ্রোহী' মিলিয়ে পড়লে বরং এটাই স্বাভাবিক মনে হয় যে, তাঁর এই গদ্য রচনাটিই 'বিদ্রোহী'র উৎস। নজরুলের কবিত্বশক্তি, রচনা নৈপুণ্য আর বিদ্রোহী মানসচেতনার আদি উৎস সন্ধান করতে হলে তাঁর গদ্য রচনা অবশ্যই পড়তে হবে, জানতে হবে কবির জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু সত্য এই যে, নজরুলের কবিতা সম্পর্কে যত আলোচনা-সমালোচনা হয়, তাঁর গদ্য রচনা বিশেষ করে গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর শতাংশও নয়। অথচ নজরুলের কবিতায় ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা, বক্তব্য-প্রকাশের ভাষা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প তাঁর গদ্য-রচনা থেকে প্রচুর এসেছে। গদ্য রচনার মর্মকথাকেই তিনি বহুক্ষেত্রে পরবর্তীকালে কাব্যে রূপান্তরিত করেছেন।

নজরুলের বিদ্রোহী মানস চেতনার উৎস ও আদি পটভূমি সম্পর্কে আমরা কিছুটা আলোকপাত করলাম। এবার দেখা যাক তাঁর সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার পটভূমি কি। নজরুল-সাহিত্যের সাধারণ পাঠক, এমনকি অনেক সুধী-সমালোচকেরও ধারণা 'বিদ্রোহী' কবিতা নিয়েই বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব এবং রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্যে নতুন যুগের সূচনা। 'বিদ্রোহী কবি' হিসাবে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের বিশেষ-পরিচিতি এবং সমগ্র বাংলা-সাহিত্যের পটভূমিতে এই কবিতাটির স্বাতন্ত্র্যই এ-ধারণার প্রধান কারণ। তাছাড়া দু'একজন বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচকের মন্তব্যও এমন ধারণার মূলে কার্যকর। উদাহরণ হিসাবে বুদ্ধদেব বসুর নজরুল-সম্পর্কিত একটি রচনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর একটি প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন :

> কৈশোরকালে আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরুবার ইচ্ছেটাকেও মনে হ'তো—যেন রাজদ্রোহের শামিল, আর সত্যেন্দ্রনাথের তন্ত্রাভরা নেশা, তাঁর বেলোয়ারী

আওয়াজের যাদু—তাও আমি জেনেছি। আর এই নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেল বাংলা কবিতার ; অন্য কিছু চাইলো না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব বলেও ভাবতে পারলো না—যতদিন না 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ হৈ ক'রে নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।—[রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক, সাহিত্যচর্চা, ১৪৪-৪৫]।

বুদ্ধদেব বসুর এই বহুলপঠিত ও আলোচিত প্রবন্ধটি পড়ে অনেকেরই মনে এমন ধারণা জন্ম নিয়েছে যে, 'বিদ্রোহী' কবিতার 'নিশেন উড়িয়েই' নজরুল ইসলাম প্রথম এসে পৌঁছেছিলেন অর্থাৎ বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এবং এর ফলেই 'প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভেঙেছিল।' সত্য বটে, 'বিদ্রোহী'র আত্মপ্রকাশ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ নতুনত্ব নিয়ে আসে, এবং ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই কবিতাটি পত্রিকায় (প্রথমে সাপ্তাহিকে 'বিজলী'তে এবং পরে অন্যান্য পত্রিকায়) প্রকাশের সাথে সাথেই ব্যাপকভাবে পঠিত এবং সুধী-সমালোচক মহলে আলোচিত-সমালোচিত হয়। এ-সম্পর্কে নজরুল-রচনাবলী'র সুদক্ষ সম্পাদক, নজরুল-বিশেষজ্ঞ কবি আবদুল কাদির লিখেছেন :

> 'মাত্র দু'বছর আগে যিনি লেখক মহলে দেখা দিয়েছেন, সেই বাইশ বৎসর বয়স্ক তরুণ কবির হাতে 'বিদ্রোহী'র মতো প্রাণবন্ত কবিতা বের হওয়া এক বিস্ময়কর ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' পাঠকের শ্রবণে আনে বেগবতী স্রোতস্বিনীর উপলাহত কলধ্বনি, কিন্তু নজরুলের 'বিদ্রোহী'তে রূপায়িত হয়েছে উদ্দাম প্রাণশক্তি, অকুণ্ঠিত উচ্ছ্বাস। সমিল মুক্তক মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে 'বিদ্রোহী' প্রথমে সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে, পরে ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' এবং তারও পরে অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রবাসী' মাসিক 'বসুমতী' 'সাধনা' প্রভৃতি বহু পত্রিকায় কবিতাটি সংকলিত হয়। 'উদ্বোধন' 'ইসলাম' প্রভৃতি পত্রিকায় নানা ধরনের আলোচনা হয়ে সারাদেশে ও সকল মহলে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। কবি শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক 'বিদ্রোহী'র ছন্দে ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' 'বিদ্রোহী বীর' নামে সুদীর্ঘ কবিতা লিখে নজরুলকে অভিনন্দিত করেন। পক্ষান্তরে 'বিদ্রোহী'র বিপরীত দিক থেকে ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যা 'সওগাত'এ কবি গোলাম মোস্তফা সেই ছন্দেই লেখেন 'নিয়ন্ত্রিত'। [নজরুল-পরিচিতি, পৃ: ১০-১১]

'বিদ্রোহী' ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি এবং আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তুলেছিল সত্য ; কিন্তু নজরুল তাঁর ভাষার ও ছন্দে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কবিতা নিয়ে পাঠক ও সুধী সমালোচক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং অভিনন্দন লাভ করেছিলেন 'বিদ্রোহী' রচনা ও প্রকাশের আগেই। 'বিদ্রোহী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষের 'বিজলী'তে। অন্যপক্ষে নজরুলের 'শাত-ইল-আরব' ১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' এবং 'কোরবাণী' ১৩২৭ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'মোসলেম ভারত'এ প্রকাশিত হয়। 'বিদ্রোহী'র আগে রচিত ও প্রকাশিত এসব কবিতাও পাঠক-সমালোচক-মহলে আলোড়ন জাগায় ও অভিনন্দিত হয়। নজরুলকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রখ্যাত ছান্দসিক কবি ও খ্যাতিমান সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার সেকালেই লেখেন :

> মুসলমান লেখকের সকল রচনাই চমৎকার। কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম

সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই। এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাংলা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে, তাঁহার প্রতিভা যে সুন্দরী ও শক্তিশালিনী—এক কথায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যে তাঁহার মনোগৃহে জন্মলাভ করিয়াছে তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ, তাঁহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ। আমি এই অবসরে, তাঁহাকে বাংলার সারস্বত মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং আমার বিশ্বাস, প্রকৃত সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক-সাধারণের পক্ষ হইতেই আমি এই সুখের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি। বাঙলার কবিমানসেও আজকাল দারুণ গ্রীষ্ম আসিয়াছে, মলয় সমীরণের অভাবে বাতাসী বীজন চলিয়াছে। বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর ভূষণ-শিঞ্জন, তাঁহার নটিনীলাঞ্ছন নৃত্য ও লীলা ও নূপুর নিক্কণ মনোহর হইয়া অবশেষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহীন কৃত্রিম নিয়ম শৃঙ্খলিত নীরস কঠিন ধাতুর আওয়াজ মানবকণ্ঠের অকৃত্রিম ভাবগম্ভীর জীবনোল্লাসময় স্বর-বৈচিত্র্যকে চাপিয়া রাখিয়াছে, অসংখ্য কাব্যরসমাত্র বঞ্চিত অসার অপদার্থ কবি-যশঃ প্রার্থীর ঝিল্লির ওরে বাংলা কাব্যে অকাল-সন্ধ্যার অবসাদ নির্জনতা সূচিত হইতেছে। আপনার পত্রিকাতেও ছিল কবির ঝিল্লিধ্বনি আছে। কিন্তু কাজী সাহেবের যে দুইটি কবিতা (অন্যগুলি পড়িবার সৌভাগ্য হয় নাই) পড়িলাম তাহা দ্বারা 'মোসলেম ভারত'-এর গৌরব রক্ষা পাইয়াছে। বাংলা কবিতার মান বাঁচিয়াছে।

কাজী সাহেবের কবিতার কি দেখিলাম বলিব? বাংলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ-ঝংকার ও বর্ণনা বৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় আলোড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ-ঝংকারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী কণ্ঠ ভারতীর ভূষণ না হইয়া প্রাণের আকৃতি ও হৃদস্পন্দনের সহচর না হইয়া ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণ-প্রীতিকর প্রাণহীন চারু-চাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার হৃদয়-নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া মানবকণ্ঠের স্বর-সপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমন-ভঙ্গী। 'খেয়াপারের তরণী' শীর্ষক কবিতার ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্যে প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে, ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি তাহাকে কোথাও হারাইয়া বসেন নাই। ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে, কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লংঘন করে নাই। এই কবিত্বশক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে শব্দে ও অর্থগত ভাবের সুর কোন-খানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর শব্দ-বিন্যাস ও ছন্দ ঝংকারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব :

আবুবকর উসমান উমর আলী হাইদর
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ-তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ীমুখে সারিগান 'লা-শরীক আল্লাহ্'।

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ধমায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডমরু-ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে, বিশেষ এর শেষ ছত্রের শেষ বাক্য 'লা-শরীক আল্লাহ্'- যেমন মিল তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্যযোজনা বাংলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।— ['মোসলেম ভারত' সম্পাদককে লেখা মোহিতলাল মজুমদারের পত্র থেকে।]

উপরোক্ত পত্রই প্রমাণ করে 'বিদ্রোহী' রচনা ও প্রকাশের আগেই নজরুল তাঁর 'খেয়াপারের তরণী', 'শাত-ইল-আরব', 'কোরবানী', 'মোহররম', 'বাদলপ্রাতের শরাব' ইত্যাদি কবিতার জন্যে কিভাবে সুধী-সমালোচক মহলে সমাদৃত হয়েছিলেন। নজরুলের কবিতার ভাবে ভাষায় ছন্দে ও প্রকাশরীতিতে নতুনত্ব সূচিত হয়ে গিয়েছিল 'বিদ্রোহী' রচনার আগেই। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কালের পুতুল' গ্রন্থের একটি স্মৃতিচারণমূলক রচনা 'নজরুল ইসলাম'-এ লিখেছেন :

'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে —মনে হ'লো এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মনপ্রাণ যা কামনা করছিলো, এ-যেন তা-ই ; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী। একজন মুসলমান যুবকের সঙ্গে পরিচয় হলো, তিনি সম্প্রতি কলকাতা থেকে এসেছেন, এবং তাঁর কাছে কী ভাগ্য! কী বিস্ময়! এক-খানা বাঁধানো খাতায় লেখা বিদ্রোহী কবির আরো অনেকগুলো কবিতা। নোয়াখালির রাক্ষসী নদীর আগাছা কণ্টকিত কর্দমাক্ত নদীতীরে বসে সেই খাতাখানা আদ্যন্ত পড়ে ফেললুম। তার মধ্যে ছিল 'ওরে, হত্যা নয় আজ সত্য-গ্রহ, সত্যের উদ্বোধন', ছিলো 'কামাল পাশা', আর কী ছিলো মনে পড়ছে না। সে সব কবিতা অচিরেই ছাপার অক্ষরে দেখা যেতে লাগলো, আর তাদের প্রবলতা আমাদের প্রশংসা করবার ভাষাটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিল।" (পৃ: ২০)

বুদ্ধদেব বসুর এই স্মৃতিচারণ পড়ে স্বভাবতই ধারণা হয় যে, নজরুলের 'কোরবানী' কবিতাটি (যার শুরু 'ওরে হত্যা নয়, আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন') বুঝি 'বিদ্রোহী'র পরে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অথচ প্রকৃত ঘটনা এই যে, 'কোরবানী' কবিতাটি প্রকাশের ('কোরবানী' ছাপা হয়েছিল ১৩২৭ সালের 'মোসলেম ভারতে') পরে অর্থাৎ ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষের 'বিজলী'তে বিদ্রোহী, প্রথম প্রকাশিত হয়। এবং সম্ভবত: পত্রিকা থেকে বুদ্ধদেব বসু যে মুসলমান যুবকের কথা বলেছেন তিনি এসব কবিতা তাঁর বাঁধানো-খাতায় তুলেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে বহু প্রতিভাবান কবিই অনেক উন্নত মানের এবং জনপ্রিয় কবিতা লিখেছেন। সেসব কবিতা পাঠক এবং সুধী সমালোচক মহলে আদৃত, আলোচিত-সমালোচিতও হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার মতো এমন ব্যাপক আলোড়ন সম্ভবত: আর কোনো কবিতাই সৃষ্টি করেনি। প্রকাশের সাথে সাথে এমন আলোচিত সমালোচিতও বোধ হয় হয়নি। একটি কবিতার প্রায় একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ এবং বহু পত্র-পত্রিকায় পুনর্মুদ্রণের ঘটনাও 'বিদ্রোহী' ছাড়া অন্য কোন কবিতার ক্ষেত্রে ঘটেছে কিনা বলা কঠিন। কবি আবদুল কাদিরের ভাষায় '১৩২৯ সালের কার্তিক মাসে নজরুলের 'অগ্নিবীণা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'প্রলয়োল্লাস' 'বিদ্রোহী' 'ধূমকেতু' 'কামাল পাশা' 'আনোয়ার' 'রণ ভেরী' 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী' 'কোরবানী' 'মোহররম'

প্রভৃতি কবিতার জন্য তার প্রথম সংস্করণ যতি অল্প দিনেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। বাংলা ভাষায় আর কোন কাব্য বাজারে বের হতে না হতে এত সমাদর লাভ করেনি।'

'বিদ্রোহী' প্রকাশের অনেক আগেই ভাবে-ভাষায় ও ছন্দে নতুনত্বের জন্যে নজরুলকে প্রথম অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মোহিতলাল মজুমদার। আর 'অগ্নি-বীণা' প্রকাশের সাথে সাথেই এ-গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে নজরুলকে 'যুগ-প্রবর্তক কবি' অভিধায় অভিহিত করেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। এ-প্রসঙ্গে তিনি তাঁর স্মৃতিচারণ মূলক রচনা 'অতীত দিনের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন :

> এর কিছুদিন পরে নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' প্রকাশিত হয়। নজরুল 'মোসলেম জগতে' সমালোচনার জন্য একটি কপি আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। 'অগ্নিবীণা'র সব কবিতা আমার আগেই পড়া ছিল। কাজেই সঙ্গে সঙ্গেই 'মোসলেম জগতে' দুই কলমব্যাপী এর সমালোচনা বেরুলো। 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের প্রথম সমালোচনা ছিল এটাই। এর পরের সপ্তাহে নলিনীকান্ত সরকার সম্পাদিত 'বিজলী'তেও এর এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'মোসলেম জগতে' এর সমালোচনায় আমি নজরুল ইসলামকে যুগপ্রবর্তক কবি বলে অভিহিত করেছিলাম। বলেছিলাম, আধুনিক বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুল ইসলামই তৃতীয় যুগ-প্রবর্তক কবি।

হারানো মানিক

লক্ষ্মী ছেলে তাই তোলে!

নজরুল ইসলাম

ঘরের আড়াল ভেঙে এবার বাহির ভুবন লুটতে চাই,
জীবন হ'ল জেল কয়েদী আড়াল টেনে সর্বদাই।
নিষেধ বাধা মেনে মেনে বুকের ভিতর ধরল ক্ষয়,
প্যাঁচার চেয়েও হলাম অধম, সন্ধ্যে রাতে চল্‌তে ভয়।
তেঁতুল গাছে জোনাক জ্বলে, মা বলে, "দেখ দেখ্ খোকন,
'সতুর-চোখীর মা' তাকায় ঐ, হালুম ক'রে ধ'রবে 'খন।
তাল-তলাতে যাস্‌নে বাবা, 'একানোড়ে' ভূত থাকে,
বেল গাছে রয় বেম্মদোত্তি—ঘাড় ভেঙে খায় পায় যাকে।"
রাত্রিবেলা ডাক্‌লে পেঁচক কুকো পাখী ভুতুম ভুতুম,
মা বলে, ঐ বাচ্চা ভূতের ভয়েই পাড়ার কাঁপায় ঘুম।
দুপুর বেলা ঝুলি-কাঁধে ছেলে-ধরার দল বেড়ায়,
ঘুরতে সে যেখান-সেখান, একলা পেলেই গিল্‌তে চায়।
জলের ভিতর? বলিস্ নে বাপ! মাল্‌সা-মাথা জল্‌-দানো,
নাম্‌লে জলে অমনি গপাস্! তারপরে ঘাড় মট্‌কানো।
গোরস্থানের পাশ দিয়ে যাস্—মামদো-ভূতের আড্ডা যে!
শ্মশান-ঘাটায় প্রেত পেত্নী মানুষ ধ'রে মাছ ভাজে!
মাঠের পথে যাস্‌নে বাবা একটু একা দেখবে যেই
শাঁওড়া গাছের শাঁক-চুন্নি ধরবে ঠেসে-বক্ষে সেই।
উপর পানে তাকাস্‌নে বাপ, উড়ছে সদাই জিন-পরী,
খাটিয়া-সমেত উড়িয়ে নেবে কন্ধ-কাটা কিন্নরী।
ভূত-পেরেত্ আর পিশাচ থাকিস্ যদি দানব দশটা দিক
থাকে তো সব থাকুক আছে, জানুক হারাও সেই মানিক।

এমনি ক'রে মোদের মহৎ জীবন শুরু; চলতে তাই—
এক পা যেতেই দু'পা পিছোই তিনবার তায় হোঁচট খাই।
সীজার খালেদ প্রতাপ কামাল নেপোলিয়ঁ ওয়াশিংটন
এই করে কি জন্ম নেবে? ক'রবে দেশে বীর সৃজন?
খোকার বুকে বাসা বাঁধে যে ভূত, তাহার সিংহাসন
অক্ষয় হয়, বাক্য চালায় খোশ্‌খানে সে ভর্‌জীবন।
খোকার গণ্ডী পেরিয়ে যখন হ'লাম বালক, আরেক ভূত
পণ্ডিত মশাই রক্তনেত্র ধরেন বেত্র—যমের দূত।
মারের চোটে জ্ঞান যা হল তার চাপে হায় সব সাহস
শরীর ছেড়ে বিদায় নিল, শুরু হ'ল প্রাণের রস।
যেমনি হ'ল কিশোর বয়েস, অমনি অভিভাবক দল
বকেন যত বাঁধেন তত নানান্ ছাঁদে দেন আগল।
ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে নয়ন-তাঁদের নিদ্রাহীন,
ছেলের শরীর চুপ্‌সে গেল। দেখই বাপু, রও দু'দিন,
দেখবে ছেলে লক্ষ্মী কেমন, হোক্ না এখন হাড্ডি সার,
আস্তে কথা, নেইক হাসি, বধূর মত লজ্জা তার!
যেই দেখে সে গুরুজনে, অমনি মাথা হয় নীচু,
মারা-মারির ধার ধারে না—গোলমালে রয় সব পিছু।
চরিত্র তার? সোনার ছেলে, পড়ার ঘরের বাইরে তায়
পুরুষই হায় পায় না দেখা, এমন ছেলে কজন পায়।
যৌবনে সে বীর হ'ল না দেশের গরব? মার কোলে
বিশ বছরে ঝুলছে পাইন? লক্ষ্মী ছেলে তাই তো।*

*আনওয়ারুল হক সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত। শিশুদের পত্রিকা 'শিশু মহলে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর সংগ্রাহক জনাব আনওয়ারুল হকের মতে কবিতাটির রচনাকাল ১৩৩৪ সাল (ইং ১৯২৭)।—সম্পাদক

নজরুল-গীতি

[নজরুলের গান ও সুর সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশ নজরুল একাডেমীর একটি প্রধান প্রকল্প হিসাবে গৃহীত। যাঁদের কাছে নজরুল-গীতির বাণী, স্বরলিপি, হস্তলিপি, পত্র-পত্র, পুরনো গ্রামোফোন রেকর্ড ইত্যাদি বা সে-সব সংক্রান্ত কোন তথ্য রয়ে গেছে, তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ নজরুল-গীতি সংরক্ষণের জাতীয় স্বার্থে তাঁরা যেন দয়া করে সে-গুলো সাধারণ সম্পাদক, নজরুল একাডেমী, ৩৫৫ আউটার সার্কুলার রোড, ঢাকা (ফোন নং ২৩৩৫৫৫ ও ৪০১৬৬৬)—এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন বা সে সম্পর্কে জানান। এ-রকম কোন জিনিস পাওয়ার পর তো নজরুল একাডেমী পত্রিকায় প্রেরকের নামোল্লেখপূর্বক প্রকাশ করা হবে।

নীচে কয়েকটি নজরুল-গীতির স্বরলিপি ছাপা হ'লো। যাঁরা এ-সব স্বরলিপি আমাদের প্রদান করেছেন, বলা বাহুল্য, এ-গুলোর বাণী। সুর ও স্বরলিপির দায়িত্ব একান্তভাবে তাঁদেরই। সম্পাদক]

উচ্চ স্বর-র্স
নিম্ন স্বর-প্

জেবুন্নিসা
[জীবন্তিকা]

তাল দাদ্‌রা

ধিন্	ধিন্	না	() না	তিন্	না
১	২	৩	৪	৫	৬

এক

লুকায়ে রহিলে চিরদিন তুমি শীর্ণ মহলের পারশীতে
তব রূপ হায় রূপায়িত হ'ল শুধু হেরেমের আরশীতে।
অবৃন্ত অশ্রু-বিন্দু
পিঞ্জরে চির-বন্দিনী
চির-যোগিনী জেবুন্নিসা।
তোমার দিওয়ানে, ওগো শাহাজাদী কবি,
আঁকিলে যে তব বিরহ-বিষাদ ছবি।
নাহি পায় হায় তাজমহল তাহার করুণ সংগীতে॥

কোন্ সে তরুণ কবি
তোমারে তোমার কবিতা রচে যে সুন্দর দেখেছিল
গোলাপ ফুলের পাঁপড়িতে তব ছবি
প্রেম-চন্দনে এঁকেছিল।

প্রিয়ার আদেশে আগুনের দাহ সহি
পুড়িল প্রেমিক একটি কথা না কহি
সেই মৌন প্রেমের মহিমা আজিও জাগে
রাঙা-গোলাপের সুরভিতে ।।

II { সা সপা পা | পা পধা পধা | মা পধপা মজ্ঞা | মপমা জ্ঞা সা I
পু ষ্পও রে | ম ছিও লেও | চি রওও দিও | ওন্ তু মি I

[পা মা -া -া]
I সা -া রমা | রমা রমা পা সা -পা মা পমা -পধা -সা I
নী ল্ মও | হও লেও র্ পা তেও ওও ও I

I { সা সপা পা | -া পধা পধা মা পধপা মজ্ঞা | মপমা জ্ঞা সা I
ত রও ম | ণ্ হাও ওর ম পাওও ইও | তওও হ ল I

[প সা
I সা সা রমা | রমা রসা পা সা -পা মা | পমা -পধা -সা } I
ত খু লেও | রেও লেও র্ আ র্ নী | তেও ওও ও } I

I মা মা পধপা | পধা -পধা মা পর্সা র্সা -া | -পধা -পমা -জ্ঞা I
অ মৃ তওও | অও ওও শ্রা দিও পাও ও | ওও ওও ও I
×

I জ্ঞা -া সপমা জ্ঞা :সা সা জ্ঞা -া মপমা জ্ঞা :সা সা I
পি ন্ কওও | রে ওচি র ব ন্ দিওও নী ওচি র I

I সা র্সা র্সা | র্রর্সা পর্সা পপা পা র্সা -া | -া -া -া II
যো গিও নী | জেও বুও ওন্ মি লা ও | ও ও ও II

দুই

তাল — ঝাঁপ

বাজে মৃদঙ্গ বীণা বাজে মুরলী
নন্দ-দুলাল নাচে ব্রজ দুলালী ॥
নাচে তাধিন্ ধিন্ অধীর আনন্দে
ছন্দে ছন্দে উথলি উথলি ॥

শিয়রে কদম্ব দোলে কাননে কুসুম দোলে
চন্দ্র অতন্দ্র নভে তারাকুল ঝলমলে।
নেহারে ভক্তকুল শ্রী অরবিন্দে
নব জলধর করে খির বিজলী ॥*

II { ণ্সা রসা I ধ্ণ্া ণ্ধ্া ণ্া I সা সা I সা সা সা I
বাo oo জেo oo মৃ I দ ঙ্ গ বী ণা I

সা । I ণ্সা রা সা I ণসা রসা I ণধা ণা পা I
বা o জেo o মু I রo oo লীo o o I

ম্া প্া I ধা দা পা I সা সা I সা রা রা I
ন ন্ দ o দু I লা ল না o চে I

রা রা I রমা পধা পা I মজ্ঞা জ্ঞমা I রা রসা । }]
ব র জoo oo দু I লাo oo লী oo o }]

বাজে মৃদঙ্গ বীণা ॥

II { মা পা I ণা ধা পা I র্সা র্সা I র্সা । র্সা I
না o চে o তা I ধি ন্ ধি o ন I

র্সা ণা I র্সা র্সা র্সা I ণর্সা র্সর্সা I ধণা ণা পা }]
অ ধী র o আ I নoo ন দেo o o }]

মা পা I র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা I র্রা র্রর্জ্ঞা I র্সা । । I
ছ ন্ দে o o I ছ o ন্ দে o o I

---

* কলকাতা বেতারে বাজানো গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে গৃহীত। গায়ক: জ্ঞান গোস্বামী। –স্বরলিপিকার

কত পয়গম্বর খোদার ভক্ত নবীজীর উম্মৎ
ঐ মসজিদে করেরে ভাই কোরান তেলাওয়াৎ।
সেই কোরান শুনে যেন আমি পরাণ জুড়াই॥

কত দরবেশ ফকিররে ভাই মস্‌জিদের আঙিনাতে
আল্লাহ্‌র নাম জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে।
আমি তাদের সাথে কেঁদে কেঁদে (আল্লাহ্‌র) নাম জপতে চাই॥*

[-া পা পা দা]

II{ -া পা -া দা I পা -দপা মা -া I -া সা ঋা জ্ঞা I ঋা -া সা -া I
০ ম স্ জি দে ০০ রি ০ ০ পা ০ শে আ ০ মা র্

[া I -া -া পা পা]
০ ০ ০ যে ন

I -া পা পা দা I প -পা মা -পধা I দা পা -া -দা I পদা পা (মা -া)} I
০ ক ব র্ দি ০ ও০ ০০ ০ ভা ০ ই ০০ ০ ০০

I{ পা পদা -পা -দপা I -দা পা মা -া I -া া পা পা I -দা পা র্সা -া I
গো রে০ ০০ ০০ ০ থে কে ও ০ ০ যো যা ন্ জি নে ০

[-দা -পা -দা -মা -া]
[০ I ০ ০ ০ ০]

I -র্সা -া পধা র্সপা I -পা পা পা দা I পা -া া -া I -া -া পা পা }II
র্ ০ আ০ জা ন্ ও ন্ তে পা ০ ০ ০ ই ০ যে ন

II -া -া জ্ঞা মা -া মা মপা -দপা -া পা র্সা র্সা র্সা -া র্সর্ঋা র্ঋর্সপা
০ ০ আ মা র্ গো রে০ ০০ র্ পা শ্ দি যে ০ ভা০ ই০

I -দা -া দা দা I -া পা র্সা -র্ঋা I পা র্সা -া -া I -া -া -া -া I
০ ০ না মা ০ জী মা ০ যা বে ০ ০ ০ ০ ০ ০

দ প
I পা মপা -র্সর্ঋা র্জ্ঞা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া র্জ্ঞর্ঋা I -র্স -া পা দা I -পা দা পা মা I
প রি০ ০০ ০ ম সে ই ০০ ০ ০ পা যে র্ দ নি এ

র্স
I পদা পা -পধা পা I -া দা -া দা I মধা -দা পা -া I -া -া পা -া I
কা০ ন্ ০০ জা ০ ড় ন্ তে পা০ ০ রে ০ ০ ০ গো র্

*"হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস" কে, ডি, বি ১৩০৪৮। কণ্ঠ : মো: কাসেম।—স্বরলিপিকার

গ্রন্থ পরিচিতি

নজরুল-জীবনী

বাংলা সাহিত্যে প্রকাশিত কবি নজরুল-সম্পর্কিত রচনার সংখ্যা গণনাতীত না হতে পারে কিন্তু অসংখ্য পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সে-সব বিক্ষিপ্ত রচনা গণনা করা অসাধ্য ব্যাপার না হলেও, সহজ ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়। এ-সম্পর্কে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যাও মোটেই অল্প নয়। মনে হয়, একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলার আর কোনো কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ বাজারে কখনো প্রচলিত ছিল না, এবং এখনো নাই। অথচ লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এক যুগ আগেও নজরুল ইসলাম এতটা আলোচিত লেখক ছিলেন না।

বলা বাহুল্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নজরুল-জীবনীগুলির অধিকাংশেই নজরুল ইসলামের খণ্ড জীবনই মাত্র পাওয়া যায়, তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে, এমন বইয়ের সংখ্যা সামান্য। নজরুল-জীবনের আলোচনা পাওয়া যায় এমন গ্রন্থগুলির মধ্যে সাতটি বইয়ের নাম উল্লেখ করা যায়। সে সাতটি হচ্ছে: ১. যুগস্রষ্টা নজরুল—খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন। ২. জ্যোতির্ময় ঝড় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ৩. নজরুল জীবনী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।* ৪. কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। ৫. কাজী নজরুল—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। ৬. নজরুল পরিক্রমা—আবদুল আজিজ আল-আমান। ৭. নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়—সুফী জুলফিকার হায়দার। প্রথমোক্ত গ্রন্থ দু'টিতে, 'যুগস্রষ্টা নজরুল' এবং 'জ্যোতির্ময় ঝড়'-এ সমগ্র নজরুল-জীবনকে মোটামুটিভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলেও এগুলি প্রধানতঃ স্মৃতিচারণ পর্যায়ের রচনা হয়ে গিয়েছে। এর সঙ্গত কারণও রয়েছে। এদের লেখকদ্বয় খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত উভয়েই কবির জীবন মধ্যাহ্নে কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে উভয়েই কবিকে বহু স্থানে ছায়ার মত অনুসরণ করেছেন। এই কারণেই কবির জীবনের সাথে এঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারটা কোনো কোনো স্থানে এত বেশী মাত্রায় জড়িয়ে গেছে যে, তার ফলে কবি-জীবনীর সরল নির্ভেজাল ধারায় কিছুটা কুয়াশার ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। সত্যকার নির্ভেজাল জীবনীকারের পক্ষে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের অন্তরায় হয়ে ওঠে। ৪নং বই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের "কাজী নজরুল ইসলাম": স্মৃতিকথা"ও নজরুল-জীবনীর পর্যায়ে না ফেলে স্মৃতিচারণ মূলক গ্রন্থের পর্যায়েই দেখা যেতে পারে, এ-কারণে যে লেখকের সাথে নজরুলের যুক্ত জীবন-কাহিনীর বিবরণীই এর প্রধান উপজীব্য। আর

*-জীবনী ॥ রফিকুল ইসলাম ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ দাম: ৩০·০০

৫নং ও ৭নং বই প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের "কাজী নজরুল" ও সুফী জুলফিকার হায়দারের "নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়" সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে। যদিও গ্রন্থ দুটি খুবই মূল্যবান। ৬নং বই আবদুল আজিজ আল-আমানের "নজরুল পরিক্রমা" সম্ভবতঃ "নজরুল জীবনী" রচনার প্রথম প্রচেষ্টা। কিন্তু বইটির ত্রুটি হ'ল গবেষণামূলক জীবনীগ্রন্থ রচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সেখানে গ্রহণ করা হয়নি।

৩নং বই অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম রচিত "নজরুল-জীবনী"কে মোটামুটিভাবে নজরুল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ বলে অভিহিত করা চলে, কারণ নজরুল-জীবনের কাহিনীর ধারাবাহিকতা এতে মোটামুটি ভাবে অক্ষুণ্ণ আছে। আর তা'ছাড়া, এতে নজরুল-সাহিত্যের উদ্ধৃতি যেটুকু আছে, ধারাবাহিক কাহিনীর সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্যই তা করা হয়েছে— সঙ্গতিহীন অনাবশ্যকভাবে সে-সব করা হয় নাই। এই দিক দিয়ে সত্যকার জীবন-কাহিনীকার হিসাবে লেখকের সংযম প্রশংসনীয়। নিশ্চয়ই লেখকের সুবিধা ছিল এইটুকু যে, তিনি কখনো সুস্থাবস্থায় নজরুলের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন নাই আসবার সুযোগও তাঁর ছিল না। যখন তিনি নজরুল সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেলেন, নজরুল তখন সম্বিতহারা, জীবন্মৃত। এ কারণে নজরুল-জীবন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করার সুযোগ তাঁর হয় নাই। স্মৃতিচারণ-কারীদের পক্ষে সত্যাসক্ত জীবন-কাহিনী রচনা যে একেবারে অসম্ভব, এ-কথা বলছি না। তবে তাঁদের পক্ষে সত্যকার জীবনী-লেখকদের অতি প্রয়োজনীয় সংযমের মাত্রায় ঘাটা খুব স্বাভাবিক। উচ্ছ্বাস বাহুল্য, অনাবশ্যক উদ্ধৃতি অনেক ক্ষেত্রে জীবন-কাহিনীর ধারাবাহিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে। স্মৃতিচারণকারী যে সত্যকার জীবনী লেখক হতে পারেন, তার একটি নিদর্শন দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত "দ্বিজেন্দ্র জীবন-স্মৃতি"। দেবকুমার রায় চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালের অনুজ প্রতিম-বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তিনি যে "দ্বিজেন্দ্র-জীবন-স্মৃতি" রচনা করেছেন তাতে সত্যাসক্ত জীবনী লেখকের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের "নজরুল জীবনী" আগেই বলেছি, মোটামুটিভাবে পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থই হ'তে পেরেছে। এতে নজরুল ইসলামের সমগ্র জীবনের ইতিহাসটি মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে স্থান লাভ করেছে, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে বলে মনে করি। লেখকও তাঁর এ-বইয়ের ভূমিকায় এ-কথা বলেছেন :

> বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রামাণ্য পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থের অভাব বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছিল। সে অভাব পূরণের জন্যই নজরুল-জীবনী রচনায় ব্রতী হয়েছিলাম।...নজরুলের সমকালীন বিশ্ব ও দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে কালানুক্রমিকভাবে নজরুল-জীবনী তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

বলতে দ্বিধা নাই আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের সে চেষ্টা কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং সেজন্য তিনি বাংলা সাহিত্য-সাধকদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদের পাত্র।

পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলতে যা বুঝায়, তার সুঠাম কাঠামো এই বইতে নিঃসন্দেহে তৈরী হয়েছে বটে কিন্তু নজরুল-জীবনের অনেক খুঁটিনাটি তথ্য এতে বাদ পড়েছে, যা সংযুক্ত হলে এই জীবনী অধিকতর তথ্য-সমৃদ্ধ হতে পারত বলে আমরা মনে করি। তা ছাড়া নজরুলের ঘটনাবহুল জীবনের অনেক ঘটনা অনেকের স্মৃতিতে আছে, তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। এবং নজরুলের জীবিত

অবস্থায়ই এই জীবনী প্রকাশিত হওয়ায়, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কিছু কিছু এমন ঘটনা বাদ পড়েছে, যে-সব সংযুক্ত হলে এটা সত্যিকারভাবে পূর্ণাঙ্গ জীবনী হতে পারত। অবশ্য এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে সে-সব এতে সংযুক্ত হবে বলে আমরা মনে করি।

নজরুলের শৈশব জীবন সম্পর্কে মোটামুটি পরিচয়ই এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে বটে, তবে লেখক আরো কিছু নজরুলের জীবন-চিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করতে পারতেন। যদি তিনি কলকাতায় প্রকাশিত নজরুল-স্মৃতিমূলক বইগুলি আলোচনা করে দেখবার সুযোগ করে উঠতে পারতেন। বিশেষ করে ইন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত নামক অনৈক লেখকের লেখাটি পড়ার সময়ে, নজরুলের বাল্যজীবন কিরূপ অসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে কেটেছিল, তার সত্য পরিচয় দেওয়া সম্ভব হতো। আট বছর বয়সে পিতৃ বিয়োগের পর নজরুলকে সমগ্র সংসারের ভার গ্রহণ ক'রে কিভাবে একদিকে মসজিদের এমামতি, দরগায় খাদেমদারি ক'রে কোনক্রমে বাড়ীর সকলের মুখে অন্ন জোটাতে হত, তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হত।

নজরুলের প্রথম বিবাহের ট্র্যাজিক পরিণতি সম্পর্কে লেখক তাঁর এ-গ্রন্থে সত্য পরিচয়টুকু তুলে ধরতে পেরেছেন। বিয়ের কাবিনে ঘরজামাই থাকার শর্ত থাকার ফলেই যে নজরুল সে অপমানকর শর্ত না মেনে বিয়ের রাতেই বিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়েছিলেন, লেখক সেই অভিমত পোষণ করেন। চরম দুঃখ জীবনেও নজরুলের আত্মসম্মান প্রদর্শনের এ-চিত্র সত্যই বড় সুন্দর।

জেলে উনচল্লিশ দিনের অনশন ধর্মঘট নজরুল ভেঙে ছিলেন বিরজাসুন্দরী দেবীর আদেশে, লেখক একথা লিখেছেন তাঁর এ জীবনী গ্রন্থে। এ সম্পর্কে মনে একটা খটকা না লেগে পারে না। রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, শরৎচন্দ্রের পত্র, চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভার প্রস্তাবও যে নজরুলকে অনশন ভাঙতে সক্ষম হল না -- এমন কি যে নজরুল সুদূর বর্ধমান থেকে ছুটে আসা আপন মায়ের সঙ্গে জেল গেটে দেখা পর্যন্ত করলেন না, অবশেষে তিনি, মা নয়, মাতৃসমা বিরজাসুন্দরীর আদেশেই অনশন ভেঙে ফেললেন, এটা কিছুটা অদ্ভুত মনে হয় না কি ? মনে হয় নাকি, শুধু নয়, এমন আরো কিছু ছিল ; যে জন্য শেষ পর্যন্ত নজরুল অনশন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেটা কি ? অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'জ্যোতির্ময় ঝড়' গ্রন্থে তার বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে আছে :

> ধীরে ধীরে বিরজাসুন্দরী নজরুলের সামনে এসে দাঁড়ালেন।
> "একি মা ! তুমি ?" যেনো কোনো অভাবনীয়কে দেখছে নজরুল। তাকালো বিস্ময়ে।
> "হাঁ, কুমিল্লা থেকে আসছি।"
> "তুমি কেন এত কষ্ট করে এলে ? কত দূরের রাস্তায়।"
> "এসেছি, তোমাকে খাওয়াব বলে।"
> "না, মা। আমি খাব না। কিছুতেই না।" নজরুল আপত্তি করতে লাগল। "যতক্ষণ না গভর্নমেন্ট আমার দাবী মানছে।"
> "দাবী মানবে। আমি বলছি তুমি খাও।"
> "না না।" নজরুল তবু আপত্তি করতে লাগল।
> "এ তোমার মায়ের দাবী। এ তোমাকে মানতে হবে।"
> "মা !" সজল চোখে তাকালো নজরুল।

"জানো তোমার জন্য আমি তেরো দিন উপবাস করে আছি। সাদা পথ কয়েক ফোঁটা নুন-জল কিছু খাইনি। তুমি যদি মরো তার আগে আমি মরব। আত্মঘাতী হবার আগে তুমি মাতৃহত্যা হবে।'

"মা, তুমি না খেয়ে আছ? তেরো দিন?" নজরুলের চোখ ফেটে অশ্রু উছলে পড়ল।

"তারপর আরো একদিন এই ট্রেনে স্টীমারে। দাঁড়াতে পারছি না। তবু তোমাকে খাওয়াব বলে দাঁড়িয়ে আছি। যদি ফিরিয়ে দাও, মনে হচ্ছে আর ফিরে যেতে পারব না। এখানেই টলে পড়ে যাব।"

"না মা। তোমাকে দুঃখে দুঃখে ফিরে যেতে দেব না। থাকতে দেব না উপবাসে।" এক মুহূর্তে নজরুল মন স্থির করে ফেলল। বললে উদ্বেল কণ্ঠে: "নিয়ে এস, কি এনেছ। আমি তোমার খেতে খাব।"

বিরজাসুন্দরী লেবুর রস করে আনলেন। তাই খেয়ে নজরুল অনশন ভাঙল।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "জ্যৈষ্ঠের ঝড়"-এ প্রকাশিত নজরুলের অনশন ভাঙার উপরোক্ত বিবরণটি অধিক সঠিক মনে হয় না কি?

অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের এই "নজরুল-জীবনী" গ্রন্থে নজরুল-জীবনের কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনাই বড় বাদ পড়ে নাই, কিন্তু নজরুলের সাংবাদিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এখানে আলোচিত হয় নাই। তা হচ্ছে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ প্রবর্তিত 'সেবক' এবং পরে 'দৈনিক মোহাম্মদী'তে সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান ও সে-কাগজে মাসাধিক কাল ধরে তার কর্মতৎপরতার ইতিবৃত্ত। দৈনিক 'সেবক' বেরিয়েছিল ১৯২১ সালের নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসে। মওলানা সাহেবের দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের এটাই ছিল প্রথম প্রয়াস। তাঁর এ প্রয়াস দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নাই। অনধিক এক বৎসরও এ প্রয়াসের স্থায়িত্ব ছিল না। তাঁর দৈনিক পত্র প্রকাশের স্থায়ী প্রয়াস 'আজাদ' বেরিয়েছিল এর প্রায় পনেরো বৎসর পরে—১৯৩৬ সালে।

যা হোক, যা বলছিলাম। এই 'সেবক'এরই প্রথম সংখ্যাতেই সম্ভবত: নজরুল ইসলামের 'সেবক' নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। যদিও মওলানা সাহেবের সাথে নজরুল ইসলামের তখন বিশেষ সদ্ভাব ছিল না, তবু ঐ পত্রিকায় নজরুলের 'সেবক' কবিতা প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল সম্ভবত: পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চেষ্টায়। কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কবিতাটি সংগৃহীত হতে পেরেছিল। সে-সময়ে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে দেশ উদ্বেলিত, উত্তাল। মওলানা সাহেবের এক উত্তপ্ত প্রবন্ধ সে-সময়ে প্রকাশিত হওয়ার ফলে 'সেবকে'র জামানত তলব হয়। ফলে 'সেবকে'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় এবং মওলানা সাহেব এক বৎসরের জন্য কারাবাস করতে বাধ্য হন। 'সেবকে'র সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ও অন্যান্য সহকারীরা মিলে পরামর্শ করে তখন 'দৈনিক মোহাম্মদী' প্রকাশ করতে উদ্যোগী হন। 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' চালু থাকায় তার একটা দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ করতে নতুন কোনো ডিক্লারেশন দরকার হবে না বলে উকিলরা পরামর্শ দিল। ফলে দৈনিক 'মোহাম্মদী' যথারীতি প্রকাশিত হল। এর কিছুদিন পরে সম্ভবত: ১৯২২ সালের মে কিংবা জুন মাসের কোন সময়ে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এক চিঠি লেখেন আমার কাছে, আমার দেশের বাড়ীর ঠিকানায় 'দৈনিক মোহাম্মদী'র সম্পাদকীয়

বিভাগে যোগদানের জন্য। আমি বাড়ীতে বেকার বসেছিলাম। আমি সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে পরদিনই কলকাতায় গিয়ে কাজে যোগ দিলাম। এর মাস খানেক পরেই সম্ভবতঃ ওয়াজেদ আলী বললেন, "নজরুল ইসলাম শুনছি কুমিল্লা থেকে কলকাতায় চলে এসেছে। তাঁকে আমাদের টাকে নিয়ে এলে কেমন হয়?" আমরা সানন্দে তাঁর প্রস্তাবে সায় দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নজরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হল। তিনি তখন ৩২নং কলেজ স্ট্রিটে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি"র অফিসে বাস করছিলেন। তিনি ওয়াজেদ আলীর প্রস্তাবে রাজী হয়ে পরদিনই এসে 'দৈনিক মোহাম্মদী'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিলেন। 'দৈনিক মোহাম্মদী'তে নজরুল ইসলাম মাস খানেক কর্মরত ছিলেন। আমার আত্মজীবনী "অতীত দিনের স্মৃতি" গ্রন্থে সে সম্পর্কে আমি বিশদ বর্ণনা দিয়েছি। সেখান থেকেই নিম্নে কিছুটা উদ্ধৃত করছি:

"যা'হোক কয়েকদিনের মধ্যেই নজরুলের আবির্ভাব হল 'দৈনিক মোহাম্মদী' অফিসে। এসেই তিনি বললেন: আমি কিন্তু ব্যঙ্গরসাত্মক কলামটি লিখব।
এই কলামটি আমি লিখতাম হরেক রকম নামে। আমি বললাম: খুব ভালো হবে। আপনিই তো এ-কলাম লিখবার সব চাইতে যোগ্য লেখক।
নজরুল এ কলামের নতুন নামকরণ করলেন 'কাতুকুতু'। প্রতিদিন কাতুকুতু বেরুতে লাগল। 'দৈনিক মোহাম্মদী'র পাঠকদের মুখে হাসির হুল্লোড় উঠল। শুধু কাতুকুতু নয় সংবাদগুলির হেডিংও তাঁর ছোঁয়ায় কবিত্বময় হয়ে উঠল। দু'একটি হেডিং-এর নমুনা দিচ্ছি:

'নেহারি নেহেরু মতিলাল
রাসভ-আঁখি অতি লাল।
'কিজির হিজিবিজি'
'জাপানের চা পান'

'দৈনিক মোহাম্মদী' নিয়ে পাঠকমহলে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কাগজের প্রচার হু হু করে বেড়ে চলল।
নজরুল রাত্রে অন্যত্র থাকতেন এবং খেতেনও বটে, কিন্তু তাঁর দুপুরের খাওয়াটা আমাদের সাথে অফিসের টেবিলেই সম্পন্ন হত। চা-পান-টিপোশত তাঁরও কম মুখ-রোচক ছিল না। খেতে খেতে তিনি নানা গল্প গুজবের অবতারণা করতেন। আমরা তাঁর অট্টহাসি ও হাসির গল্পগুলি পরম উপভোগ করতাম। * * *
একদিন খাওয়ার সময় হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন: 'আপনার বাড়ী কোথায়?'
বললাম, ময়মনসিংহে।'
"কিন্তু ময়মনসিংহে কোথায়?'
আমি বললাম, আপনার বাড়ী বর্ধমানে। আপনি ময়মনসিংহের পল্লী গ্রামের খবর তো রাখেন না। কাজেই আমার গ্রামের নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন না।

'আরে সে-নামটাই বলুন না। আমি ময়মনসিংহে অনেক দিন ছিলাম যে।'

'বেশ। ধানীখোলা — এ নাম শুনেছেন কখনো?'

কেন শুনব না? আমি ধানীখোলায় ওসমান আলী মৃধার বাড়ীতে তার পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম যে।'

'তাই না কি? সে বাড়ী তো আমাদের বাড়ী থেকে মাত্র মাইল খানেক দূরে।'

'হাঁ, আমি দরিরামপুর স্কুলে এক বৎসর পড়েছি, এবং কাজীর সিমলায় কাজী বাড়ীতে থেকেছি।'

'কাজী রফিজুল্লাহ সাহেবের বাড়ীতে থাকতেন, যিনি আসানসোলে দারোগা ছিলেন?'

'হাঁ, তিনিই তো আমাকে আসানসোল থেকে কাজীর সিমলায় নিয়ে গিয়ে দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন।'

'কি আশ্চর্য! এযে আমার কল্পনারও বাইরে ছিল?'

"আমি একবার আমার স্কুলের বন্ধুদের সাথে ধানীখোলায় গিয়েছিলাম এক স্কুলের বার্ষিক সভায়। সেখানে সে গ্রামেরই এক ছেলের লিখা একটি নাটিকা অভিনীত হয়েছিল।'

'আপনার সেই বন্ধুদের মধ্যে রুস্তম বলে কেউ ছিল কি?'

'হাঁ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সে-কথা আপনি জানলেন কি করে?'

'জানলাম এই কারণে যে, রুস্তমই সেদিন আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।'

'আরে, আপনিই সেই স্কুলে নাট্যকার না কি?'

আমি হেসে বললাম, 'আর আপনিই নজরুল ইসলাম—যে দিন-রাত গান গেয়ে আর হাসি হেসে বেড়াত এবং ক্লাশে বরাবর ফার্স্ট হতো।'

*　　　*　　　*　　　*　　　*

একদিন নজরুল ইসলাম ঝড়ের বেগে অফিসে ঢুকলেন, বললেন: 'শুনেছেন? কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গতকাল মারা গেছেন।'

বললাম: 'হাঁ, কাগজে সে-সংবাদ দেখেছি।'

নজরুল ইসলাম বললেন: 'সত্যেন দত্তের উপর একটা এডিটোরিয়েল লিখতে হবে তো? সেটা আমি লিখি - কি বলেন?'

ওয়াজেদ মিয়া বললেন: 'নিশ্চয়ই! আপনি থাকতে সেটা আর কে লিখতে যাবে?'

খুব খুশী হয়ে নজরুল প্রবন্ধ লিখতে বসে গেলেন। আমরাও নিজ নিজ কাজে মন দিলাম। দুপুরে চাপাতি গোশ্‌ত খাওয়ার সময়ে নজরুল ইসলাম প্রস্তাব করলেন, 'আজ বিকেলে রামমোহন লাইব্রেরীতে সত্যেন্দ্র স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সভাপতিত্ব করবেন রবীন্দ্রনাথ। চলুন দেখে আসি।' ওয়াজেদ মিয়া বললেন: 'বেশ, যাওয়া যাবে। কিন্তু তার তো এখনো অনেক দেরী। আগে প্রবন্ধটা শেষ করে কম্পোজ করতে দিন। তারপর পাঁচটার কিছু আগে সেখানে রওয়ানা হলেই হবে।'

তাই হল। নজরুলের প্রবন্ধ ও আমাদের লেখাগুলি কম্পোজিটারের হাতে দিয়ে আমরা পাঁচটার কিছু আগেই রওয়ানা হয়ে পড়লাম: কিন্তু রামমোহন লাইব্রেরীতে পৌঁছে দেখি, সভাস্থলে তিল ধারণের স্থান নাই। নজরুল কোনমতে জনতার ভিড়ে পথ করে আমাদের

টেনে নিয়ে চললেন এবং সভামঞ্চ থেকে একটু দূরে একটা গ্যালারীতে আমাদের বসবার স্থান করলেন এবং নিজেও আমাদের পাশে বসে পড়লেন।

যথাসময়ে সভামঞ্চে আপন আসন থেকে রবীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। দুগ্ধফেনশুভ্র ধুতি পাঞ্জাবী চাদর পরিহিত শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত রবীন্দ্রনাথকে এই প্রথম দেখে আমার মন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠল। হঠাৎ নারী-কণ্ঠ শুনে চমকিত হলাম। কোথা থেকে নারী-কণ্ঠের কবিতার আবৃত্তি ভেসে আসছে বুঝতে না পেরে চারদিকে চাইতে লাগলাম। নজরুলকে জিজ্ঞেস করলাম : 'কবিতা আবৃত্তি করছেন কে?' নজরুল হেসে বললেন : 'রবীন্দ্রনাথের মুখের দিকে চেয়ে দেখুন তো?' চেয়ে দেখলাম। তাই তো। রবীন্দ্রনাথেরই তো মুখ নড়ছে। কিন্তু এ নারী-কণ্ঠ কেন? নজরুল বললেন : 'তাঁর কণ্ঠই এরূপ।' আমি বিস্মিত হলাম। এমন নারী-কণ্ঠের স্বর যে-কোনো পুরুষের হতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না।

যা হোক, রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের উপর লেখা তাঁর দীর্ঘ কবিতা পাঠ শেষ করলেন। হল করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। নজরুল বললেন : 'বুড়ো এখনো অতুলনীয়। সত্যেন্দ্রনাথ সত্যই ভাগ্যবান।' এরপর আরো কয়েকজনের বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হল। নজরুল ইসলাম কোথায় সটকে পড়লেন। আমরা অফিসে ফিরে এলাম।

ওয়াজেদ মিয়া ফোরম্যানকে ডাকলেন এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধের প্রুফ নিয়ে আসতে বললেন তাকে। প্রুফ তার হাতে এসে পৌঁছুলে হঠাৎ আমাকে ডাকলেন। বললেন, 'দেখুন, নজরুল সম্পাদকীয়তে কি লিখেছে। এ-লেখা কি করে মওলানার কাগজে বেরুতে পারে?'

আমি দেখলাম। বললাম : 'লেখাটা কিন্তু খুবই সুন্দর।'

ওয়াজেদ মিয়া বললেন : 'সে তো ঠিকই। কিন্তু হিন্দুয়ানী ভাব-ভাষায় লেখা দেখলে মওলানা চটে আগুন হয়ে যাবেন। তার কি করি?'

আমি বললাম : 'তবে এক কাজ করুন। ভাষা কিছু কিছু বদলে দিন। আর যেখানে ভাষার দিক দিয়ে গোলমাল, সেখানে কাঁচিকাটা করুন।'

'কিন্তু তাতে নজরুল চটে যাবে না?'

'চটবে নিশ্চয়ই। হয়তো সেজন্য সে আর অফিসমুখোই হবে না।'

'ভয় তো সেখানেই। উভয় সঙ্কটেই পড়া গেছে। কি যে করি।'

আমি বললাম : 'যতটা সম্ভব রেখে এর ভাব ও ভাষার হিন্দুয়ানী চেহারাটা বদলে দিন। তাতে যা হবার হোক।'

অগত্যা তাই করা হল। কিন্তু পরদিন কাগজে তাঁর লেখার দুর্গতি দেখে নজরুল যে খুশী হতে পারেন নাই, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। নজরুল সেদিন অফিসে এলেন না। তার পরদিনও না। শুধু তাই নয়, এরপর আর তাঁকে অফিসে কোনদিনই দেখা গেল না।

[অতীত দিনের স্মৃতি, পৃষ্ঠা ৮০—৯০]

উদ্ধৃতিটা অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে পড়ল। কিন্তু কি করা যাবে। আমার মনে হয়, নজরুলের সাংবাদিক জীবনের এ-অধ্যায়টা তার পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থ থেকে বাদ পড়া উচিত নয়।

কায়কোবাদ-নজরুল সাক্ষাৎকার সম্পর্কে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তাঁর 'নজরুল-জীবনী' গ্রন্থের ৩৪০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

> ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে কোলকাতা এলবার্ট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কবি কায়কোবাদ। ২৫শে ডিসেম্বর সম্মেলনের শুরুতে অভ্যর্থনা সমিতির সহ-সভাপতি সৈয়দ এমদাদ আলী কায়কোবাদ ও নজরুলকে মাল্যভূষিত করেন। নজরুল সম্মেলনে উদ্বোধন সঙ্গীত 'এস এস এসলোকবিহারী মধুকর দল' সমাপ্ত করলে কবি কায়কোবাদ আবেগের সঙ্গে নজরুলকে মাল্যভূষিত করেন এবং নজরুল তাঁকে কদমবুসী করেন।

কিন্তু এটাই কায়কোবাদ-নজরুল প্রথম সাক্ষাৎকার নয়। প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটেছিল এরও প্রায় দশ বৎসর আগে ১৯২২ সালের সম্ভবত: ডিসেম্বর মাসে। তখন আমি সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ'-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। পত্রিকার অফিস ছিল ২৯নং আপুনী বাগান লেন, কোলকাতা। মখদুমী লাইব্রেরীর মালিক জনাব মোসাদ্দক আলী ছিলেন এই পত্রিকার প্রকাশক ও পরিচালক। ঠিক সে-সময়ে নজরুল ইসলামের 'ধূমকেতু' বেরুত ৭নং প্রতাপ চাটুজ্জে লেন থেকে। এই উভয় অফিসের দূরত্ব খুব বেশী ছিল না এক মাইলেরও সম্ভবত: কম। আমি মাঝে মাঝে নজরুলের সাথে দেখা করতে 'ধূমকেতু' অফিসে যেতাম। সে-সময়ে একদিন হঠাৎ কবি কায়কোবাদ সাহেব এসে 'মোসলেম জগৎ' অফিসে হাজির হন। নানা কথাবার্তার পর হঠাৎ তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'কবি নজরুল ইসলাম কি এখন কোলকাতায় আছেন?' কবি মঈনুদ্দীন ইতিপূর্বেই 'মোসলেম জগৎ' অফিসে এসে আমার সাথে আলাপ করছিল। সে-ই কবি সাহেবের জিজ্ঞাসার জবাবে বলল : 'হাঁ, নজরুল ইসলাম এখন কোলকাতায়ই আছেন। আপনি তাঁর সাথে দেখা করতে চাইলে আমি আপনাকে তাঁর ওখানে নিয়ে যেতে পারি।'
কায়কোবাদ-নজরুল এই প্রথম সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ আমার 'অতীত দিনের স্মৃতি' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সেখান থেকেই কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করছি :

> কায়কোবাদ সাহেব বললেন : 'তাঁকে (নজরুলকে) দেখতে খুবই ইচ্ছা করে। তাঁর ওখানে আমাকে নিয়ে গেলে খুবই খুশী হব।'
> আমি বললাম : 'তা'হলে চলুন, এখনি যাওয়া যাক। এই বিকেলের দিকে নিশ্চয় তিনি অফিসেই আছেন।'
> কায়কোবাদ সাহেবকে নিয়ে আমরা —আমি ও মঈনুদ্দীন রওয়ানা হলাম। প্রতাপ চাটুজ্জে লেনে 'ধূমকেতু' অফিসে পৌঁছে দেখি, একটি ছেলে জিজ্ঞাসাভরে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। তাকে নজরুলের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলল : 'নজরুল উপরে আছেন।'
> বললাম : 'কবি কায়কোবাদ সাহেব নজরুলের সাথে দেখা করতে এসেছেন। একবার তাঁকে একটু দেখা দরকার।' ছেলেটি তরতর করে উপরে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পরেই, নজরুলের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। তিনি বললেন : 'শান্তি, কবি সাহেবকে উপরে নিয়ে এসো।' বুঝলাম, ছেলেটির নাম শান্তি। এই শান্তিপদ সিংহ নজরুলের সঙ্গী হিসেবে বহুদিন ছিল বলেই জানি। যা' হোক, শান্তিপদ নীচে নেমে এসে আমাদের উপরে নিয়ে গেল। দেখলাম, নজরুল

কবি কায়কোবাদকে অভ্যর্থনার জন্য একেবারে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর সাথে নজরুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সঙ্গেই সঙ্গেই নজরুল নত হয়ে তাঁর কদমবুসী করলেন এবং তাঁকে সাদরে হাত ধরে তাঁর অফিস রুমে নিয়ে গেলেন। দেখলাম, সেখানে চেয়ার টেবিলের কারবার নাই। মেঝে জুড়ে এক বিরাট ফরাস পাতা। কবি এবং আমরা সকলে ফরাসের উপরে গোল হয়ে বসলাম। নজরুল শান্তিপদকে চা ও পানের ফরমাস করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিরাট এক পানদান ভর্তি পান এলো এবং আরও এলো ট্রেতে করে কয়েক কাপ চা। চা ও পানের সদ্ব্যবহার করতে করতে আলাপ চলতে লাগল। নজরুলের মুখে কবি সাহেবের প্রশংসার খই ফুটতে লাগল। বললেন, আপনি আমাদের কবিগুরু, আপনার অনুসরণেই আমরা যা কিছু করছি—আপনি আমাদের আশীর্বাদ করবেন।

কবি কায়কোবাদও নজরুলের প্রশংসায় কম গেলেন না। বললেন, যদিও আপনার ও আমাদের কবিতার ধরন আলাদা, তবু আমি আপনার কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়েছি। এরপর তিনি আরো বললেন: শুনেছি, আপনার কবিতা আবৃত্তি ও গান নাকি অপূর্ব। তা কিছু শুনতে পেলে খুবই খুশী হব।

এরপর শুরু হয় নজরুলের কবিতার আবৃত্তি। প্রথমেই নজরুল আবৃত্তি করলেন তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা। তারপর ক্রমে 'কামালপাশা' 'আনোয়ার', 'কোরবানী', 'মোহর্‌রম', 'খেয়াপারের তরণী' প্রভৃতি কবিতার আবৃত্তিও হল। কবি কায়কোবাদ মন্ত্রমুগ্ধের মতো নজরুলের আবৃত্তি শুনলেন এবং উচ্চারণ করলেন, শাবাশ! এরপর শুরু হল গান। এক গান শেষ হতেই কায়কোবাদ সাহেব আর একটা গাইতে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। নজরুলেরও ক্লান্তি নাই—তিনি গানের পরে গান গেয়েই চললেন।

এভাবে যখন রাত প্রায় দশটা—তখন মনে হল, নজরুল যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং আমাদের ঘরে ফিরবার কথা মনে পড়ল। কাজেই বিদায়ের পালা শুরু হল। কবি সাহেব নজরুলকে মোবারকবাদ জানালেন এবং নজরুলও বিনয়ে সঙ্কুচিত হয়ে কবিকে ধন্যবাদ জানালেন। নজরুল রাস্তা পর্যন্ত কবিকে এগিয়ে দিলেন।

[অতীত দিনের স্মৃতি—পৃষ্ঠা ৯৯—১০১]

এই সাক্ষাৎকারের কিছু দিন পরেই নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। নজরুল 'মোসলেম জগতে' সমালোচনার জন্য এককপি 'অগ্নি-বীণা' আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। 'অগ্নি-বীণা'র সব কবিতা আমার আগেই পড়া ছিল। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে আমি এর একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখে ফেললাম এবং পরদিন 'মোসলেম জগতে'র সম্পাদকীয় কলামে তার দু'কলম ব্যাপী সমালোচনা প্রকাশিত হল। এটাই ছিল নজরুলের 'অগ্নি বীণা'র প্রথম সমালোচনা। এর পরে নলিনীকান্ত সরকার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বিজলী'তেও এর এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'অগ্নি-বীণা'র কবিতাগুলির ভাষা, ভাব, বিষয়বস্তুর নতুনত্ব বিশ্লেষণ করে আমি নজরুল ইসলামকে যুগ-প্রবর্তক কবি-প্রতিভা বলে অভিহিত করেছিলাম। বলেছিলাম আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুল ইসলামই তৃতীয় যুগ-প্রবর্তক কবি।

নজরুল-প্রতিভা সম্পর্কে আবার এ-বক্তব্যে সে-সময়ে কেউ কেউ অখুশী হয়েছিলেন। 'শনিবারের চিঠি'তে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছিল। কিন্তু পরে বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত বলেছেন: নজরুল রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ নতুন এক কবি-প্রতিভা।
যা হোক, অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের 'নজরুল-জীবনী'কে মোটামুটিভাবে সুলিখিত পূর্ণাঙ্গ নজরুল-জীবনী বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এদিক দিয়ে তিনি পাইয়োনিয়ারের কাজ করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে এ-জীবনীগ্রন্থ অধিকতর সমৃদ্ধ চেহারা নিয়ে বেরুবে, আশা করি।

— আবুল কালাম শামসুদ্দীন

শিল্প-দর্শনের স্বচ্ছ দর্পণে*

বাঙলা ভাষার প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যকীর্তির মূল্য ও মর্যাদা নিয়ে আজও বিতর্কের অবসান নেই। তাঁরই মত অস্থিরস্বভাব ও শক্তিমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের কাব্যকৃতির মূল্যায়ন নিয়েও প্রথম থেকেই চলেছে কৌতূহলোদ্দীপক বাদানুবাদ।
১৩৩০ সালের গোড়ার দিকে নজরুল যখন হুগলী জেলে অনশন-ধর্মঘট করেন, সে-সময় অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৭ই মে ১৯২৩ তারিখে তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন:

> আমাদের কবি কাজী নজরুল: একজন সত্যকার কবি; রবিবাবু ছাড়া বোধ হয় এখন কেহ আর এত বড় কবি নাই।

সে-সময়ই ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ২৮শে বৈশাখ শুক্রবারের সাপ্তাহিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় 'অনশনব্রত' শিরোনামে লেখা হয়:

> বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক কাজী নজরুল ইসলাম: বাঙ্গালীর একজন অতুলনীয় কবি ও সাহিত্যিক।

অথচ রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের 'উচ্ছৃঙ্খল' কবিতাটির সহিত তুলনা ক'রে নজরুলের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি 'বিদ্রোহী' সম্বন্ধে ১৩৩২ অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী' পত্রিকার ২৪০ পৃষ্ঠায় কাজী আবদুল ওদুদ লেখেন:

> নবীন কবি নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী'-র আবেগ এর চাইতে অনেক বেশী, কিন্তু সে-আবেগ এমন সত্যদৃষ্টি স্রষ্টার হাতে নিয়ন্ত্রিত নয়; তাই তার অনেকখানি কাব্য হিসাবে অকিঞ্চিৎকর।

*নজরুল-সাহিত্য-বিচার ॥ শাহাবুদ্দীন আহমদ ॥ প্রকাশক: মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১। প্রচ্ছদ: কালাম মাহমুদ। ৩৮৪ পৃষ্ঠা ॥ মূল্য: পঁচিশ টাকা।

অতঃপর শ্রীঅজিতকুমার দত্ত ও শ্রীবুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত ১৩৩৬ শ্রাবণের 'প্রগতি'তে এক সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলা হয়:

> নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা 'বিদ্রোহী' উঁচু দরের কবিতা নয়। নজরুল ইসলাম খুব কিছুদিন জোর গলায় জয়ধ্বনি করলেন, তার অধিকাংশ ফাঁকা আওয়াজ।

কিন্তু নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষ রসজ্ঞেরা স্বীকার করেন যে, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবলীলাক্রমেই ঘটেছে আঙ্গিকের পরিবর্তন,—ভাব ও রূপ একাত্মবৎ হ'য়ে, সকল অসংলগ্নতা ও অবিরোধিতা সমন্বিত ও একমুখী হয়ে অনবদ্য রসমূর্তি লাভ করেছে। নূতন ভাব প্রকাশের প্রয়োজনেই নজরুল প্রয়োগ করেছেন নূতন ছন্দরীতি: 'বিদ্রোহী' সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত রীতিতে বিরচিত—এই নূতন রীতি নজরুলের নিজস্ব সৃষ্টি। কিন্তু এই সুনিরূপিত রীতির ধ্বনি-সৌষম্য অনুধাবন করতে না পেরে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র তাকে ভেবেছেন: "বিশৃঙ্খল ছন্দ" (শেষ সওগাত: ভূমিকা)। পক্ষান্তরে ছন্দ-বিশেষজ্ঞ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন: "তাঁর (নজরুলের) বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতায় নূতন ছন্দ-প্রবর্তনের যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে।"—(বাংলা ছন্দ-পরীক্ষা, ৮১ পৃষ্ঠা।)

শুধু টেকনিক নিয়ে নয়, নজরুলের কবিতার ভাব-মাহাত্ম্য নিয়েও দেখা যাচ্ছে মত-পার্থক্য। ১৩৩৬ আশ্বিনের 'উপাসনা' পত্রিকায় শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ দস্তিদার লেখেন:

> আমাদের তথাকথিত কোনও 'বিদ্রোহী' কবি বড় আশায় তাল ঠুকিয়া নকল পৌরুষের অভিনয় করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু হায়! 'বুলবুল'-এর গান তাঁহাকে লজ্জাবতী লতার পাশে আনিয়া ফেলিয়াছে।

১৩৬১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'নজরুল ইসলাম' পুস্তকে সৈয়দ আলী আহসান বলেন:

> নজরুলের খ্যাতি 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্যই। 'বিদ্রোহী' সমস্ত শোভার মধ্যে এক অনাসৃষ্টি—অকারণই যৌবনের শক্তি-চঞ্চলতা। -----'বিদ্রোহী'তে যৌবনের আবেগ রূপ পায় নি। 'বিদ্রোহী' প্রকৃত কাব্য হ'তে পারে নি।

১৩৬৫ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় শ্রীঅজিতকুমার তারণ তাঁর 'সৈনিক কবি নজরুল' প্রবন্ধে লেখেন:

> (করাচীতে) সামরিক বিভাগের কাজ করতে করতেই নজরুল 'কামাল পাশা', 'বিদ্রোহী' ও আরো নানান বিখ্যাত কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও বাঙালীকে দেশাত্মবোধে উদ্বোধিত করতে পেরেছিলেন। মিলিটারীর চাকরী ছেড়ে আসার পূর্ব থেকেই পুলিশের দারোগাগিরির কাজের বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর গায়ে স্বদেশীর গন্ধ পাওয়ায় তাঁকে সরকারী কাজ গ্রহণ করা শেষ পর্যন্ত হয়নি।

নজরুলের জীবনবৃত্ত ও কাব্য-ভাবনা নিয়ে উপরোক্ত উক্তিসমূহে এরূপ অসার তত্ত্ব ও ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশনের মূলে প্রধানতঃ ক্রিয়া করেছে নজরুল-মানসের সঙ্গে এ-সকল সমালোচকের মনের প্রবাস-

ভূমির প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'উচ্ছৃংখল' কবিতায় বলেন: "ঝড় শুধু আসে ক্ষণেকের তরে সৃজনের এক ভুল।" তিনি ঝড়কে ভেবেছেন: "কোথাকার এই শৃংখলছেঁড়া সৃষ্টিছাড়া এ বাধা।" পক্ষান্তরে নজরুল তাঁর 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় ঝড়কে বলেছেন 'নূতনের কেতন'; তাঁর কবি-কল্পনায় 'ঝড়' হচ্ছে ধ্বংসের প্রতীক এবং সেই 'ধ্বংস' হচ্ছে "নূতন সৃজন-বেদন"—তা 'সৃষ্টিছাড়া বাধা' নয় বা 'অনাসৃষ্টি' নয়। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর চিন্তার অনুসারক উপরোক্ত সমালোচকেরা প্রচলিত পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কার তথা মেরামত ক'রে তাকেই টিকিয়ে রাখতে চান; পক্ষান্তরে নজরুল মনে করেন যে তাতে গণমানুষের সমূহ কল্যাণ সাধিত হবে না, যে পুরাতন জীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মেই ধ্বংস হ'তে চলেছে তাকে সংস্কারের জোড়াতালি দিয়ে রক্ষা করার প্রয়াস কালের আঘাতে ব্যর্থ হতে বাধ্য—তাই বিপ্লব তথা আমূল পরিবর্তনই হওয়া উচিত দেশসেবকদের আশু লক্ষ্য। সমাজের কাঠামো হবে উদার সাম্যনীতির ভিত্তিতে সুগঠিত এবং আর্থনীতিক উৎপাদনের উপায়সমূহ হবে জনগণের নিয়ন্ত্রণাধীন—সর্বপ্রকার বৈষম্য ও শোষণের বিলুপ্তিকরণ হবে নব-বিধানের সুনিশ্চিত ফলশ্রুতি; এই মানবিক দাবী ও অধিকার প্রসারের কথাই নজরুলের কবিতা ও গানের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। এই মৌল বিষয়ের প্রতি মানসিক প্রতিকূলতাই নজরুল-সাহিত্যের ভাববস্তু ও প্রকাশভঙ্গী বিরোধিতায় সংস্কারবাদী তথা বিপ্লব-বিরোধী লেখকদের করেছে তৎপর ও প্ররোচিত,—নজরুল সম্বন্ধে তাঁদের বিরূপ সমালোচনায় আছে তাঁদের শ্রেণীউপচেতনারই স্বাভাবিক প্রতিফলন।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হলে পর তার প্রতিবাদ ক'রে 'ইসলাম-দর্শন' পত্রিকায় মোহাম্মদ আবদুল হাকিম "বিদ্রোহ-দমন" ও মোহাম্মদ গোলাম হোসেন "প্রলয়-ভেরী" এবং 'সওগাত' পত্রিকায় গোলাম মোস্তফা "নিয়ন্ত্রিত" লেখেন; এ-সকল বেতন্ত্র-শ্রেণীর পদ্যে বিমল কাব্যরসের প্রেরণা নেই,—আছে সংরক্ষণবাদী ধর্মবুদ্ধির অসংগত উত্তাপ। তাই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক শ্রেণীচেতনা থেকে উদ্ভূত নজরুল-বিরোধিতা যেমন একদেশদর্শিতাদোষে সাহিত্য-বিচারে উপেক্ষণীয়, তেমনই মূঢ় ধর্মান্ধতা থেকে উৎক্ষিপ্ত নজরুল-নিন্দাও সর্বভাবে অপাংক্তেয়।

নজরুল-সাহিত্যে আছে নূতন ভাব ও তার প্রকাশোপযোগী নূতন আঙ্গিক। তাঁর বিষয়-কল্পনার মাহাত্ম্য এবং উপস্থাপনার শিল্পকুশলতা অনাসক্ত মনে বিশ্লেষণ ক'রেই তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও গুণ নিরূপণ করতে হবে,—সেক্ষেত্রে সমালোচকের ব্যক্তিগত রুচি বা সংস্কারগত নীতির নিরিখে বিচার অচল ও অগ্রাহ্য। নজরুল-সাহিত্য-বিচারের প্রকৃত অধিকারী তিনিই হবেন, নজরুলের সাহিত্য-ভাবনা ও রূপায়ন-রীতির প্রতি যাঁর সহানুভূতি হবে অকৃত্রিম ও অবিকৃত। সেই সহমর্মিতা, অভিবোধ বা অনুরাগ ফুটে ওঠে নির্লিপ্ত মন নিয়ে নজরুল-সাহিত্য অধ্যয়নে নিবিড় অভিনিবেশ, ঔৎসুক্য ও নিষ্ঠা থেকে। ইদানীং তার সর্বোত্তম পরিচয় দিয়েছেন শাহাবুদ্দীন আহমদ, ফলে তাঁর নজরুল-সমালোচনা আমাদের সাহিত্যের এই বিভাগে সমুচ্চ শীর্ষে স্থান পেয়েছে। শাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর কোনো পূর্বপোষিত সংস্কার বা সংকীর্ণ আদর্শের মানদণ্ডে পরিমাপ ক'রে নজরুল-সাহিত্য পাঠ করেন নি,—তিনি অনপেক্ষ দৃষ্টিতে নজরুলের অভিনব বিষয়-ভাবনা ও রূপ-রীতির প্রদীপ্ত আলোকেই তার বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য অবলোকন করেছেন; ফলে সেই সাহিত্যের স্বরূপ ও চমৎকারিত্বের যাচাই তাঁর হাতে হয়েছে যথাযথ ও অভাবনীয় রকমের দাবীদার।

শ্রীবুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি'-তে নজরুলের 'বিদ্রোহী'-কে বলা হয় তাঁর 'প্রথম কবিতা'। এরূপ ভ্রান্ত তথ্য অন্যত্রও পরিবেশিত হতে দেখেছি। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি'। 'বিদ্রোহী'

প্রকাশের পূর্বে নজরুলের অর্ধশতেরও অধিক কবিতা ও গান পত্রস্থ হয়েছিল। তাদের একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :

১। 'মুক্তি'—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৬।
২। 'কবিতা-সমাধি'—সওগাত, আশ্বিন, ১৩২৬।
৩। 'আশায়' (হাফিজ হইতে)—প্রবাসী, পৌষ, ১৩২৬।
৪। 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব'—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২৭।
৫। 'মানিনী বধূর প্রতি'—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২৭।
৬। 'উদ্বোধন'—সওগাত, বৈশাখ, ১৩২৭।
৭। 'চিঠি'—বঙ্গনূর, বৈশাখ, ১৩২৭।
৮। 'বোধন'—মোসলেম ভারত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।
৯। 'শাত-ইল-আরব'—মোসলেম ভারত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।
১০। 'কালোর উকিল'—নূর, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।
১১। 'বাদল-প্রাতের শরাব'—মোসলেম ভারত, আষাঢ়, ১৩২৭।
১২। 'বকুল'—বকুল, আষাঢ়, ১৩২৭।
১৩। 'স্মরণে' (গান)—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৭।
১৪। 'খেয়া-পারের তরণী'—মোসলেম ভারত, শ্রাবণ, ১৩২৭।
১৫। 'সুন্দরী'—বঙ্গনূর, ভাদ্র, ১৩২৭।
১৬। 'কোরবানী'—মোসলেম ভারত, ভাদ্র, ১৩২৭।
১৭। 'গরীবের ব্যথা'—বঙ্গনূর, আশ্বিন, ১৩২৭।
১৮। 'মোহর্রম'—মোসলেম ভারত, আশ্বিন, ১৩২৭।
১৯। 'দূরের বন্ধু' (গান)—মোসলেম ভারত, কার্তিক, ১৩২৭।
২০। 'অবেলায়'—সাধনা, কার্তিক, ১৩২৭।
২১। 'বাঁশীর ব্যথা' (রুমী হইতে)—বঙ্গনূর, কার্তিক, ১৩২৭।
২২। 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' : আবির্ভাব—মোসলেম ভারত, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭।
২৩। 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' : গজল : ১-২ মোসলেম ভারত, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭।
২৪। 'মা'—নারায়ণ, ১৩২৭।
২৫। 'আশা' (গান)—মোসলেম ভারত, পৌষ, ১৩২৭।
২৬। 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' : গজল : ৩-৪—মোসলেম ভারত, পৌষ, ১৩২৭।
২৭। 'কলঙ্ক প্রিয়' (আশা')—সওগাত, পৌষ ১৩২৭।
২৮। 'বিরহ-বিধুরা'—মোসলেম ভারত, মাঘ, ১৩২৭।
২৯। 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' : ৫-৬—মোসলেম ভারত, মাঘ, ১৩২৭।
৩০। 'বেদন-হারা' ('প্রতিবেশিনী')—সওগাত, মাঘ, ১৩২৭।
৩১। 'মরমী' (গান)—মোসলেম ভারত, ফাল্গুন, ১৩২৭।
৩২। 'স্নেহ-ভীতু'—মোসলেম ভারত, ফাল্গুন, ১৩২৭।

৩৩। 'নিরুদ্দেশের যাত্রী'—নারায়ণ, চৈত্র, ১৩২৭।
৩৪। 'পলাতকা'—ভারতী, বৈশাখ, ১৩২৮।
৩৫। 'দহন-মালা'—নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২৮।
৩৬। 'আহ্বান'—সাধনা, বৈশাখ, ১৩২৮।
৩৭। 'বিজয়-গান'—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩২৮।
৩৮। 'উৎসর্গ' ('অগ্নিবীণা'র উৎসর্গ)—উপাসনা, শ্রাবণ, ১৩২৮।
৩৯। 'নূপুর-অভিসার'—ভারতী, শ্রাবণ, ১৩২৮।
৪০। 'লক্ষ্মীছাড়া'—উপাসনা, ভাদ্র, ১৩২৮।
৪১। 'অনাদৃতা'—নারায়ণ, ভাদ্র, ১৩২৮।
৪২। 'পাগল পথিক' (গান)—মোসলেম ভারত, ভাদ্র, ১৩২৮।
৪৩। 'কার বাঁশী বাজিল?'—মোসলেম ভারত, ভাদ্র, ১৩২৮।
৪৪। 'কবির চাওয়া'—সাধনা, ভাদ্র, ১৩২৮।
৪৫। 'অকরুণ প্রিয়া'—নারায়ণ, আশ্বিন, ১৩২৮।
৪৬। 'রণভেরী'—সাধনা, আশ্বিন, ১৩২৮।
৪৭। 'আগমনী'—উপাসনা, আশ্বিন, ১৩২৮।
৪৮। 'বাদল-দিনে'—মোসলেম ভারত, আশ্বিন, ১৩২৮।
৪৯। 'চিরন্তনী প্রিয়া'—বার্গা ও মর্মবাণী, কার্তিক, ১৩২৮।
৫০। 'মরণ-বরণ'—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, কার্তিক, ১৩২৮।
৫১। 'আনোয়ার'—সাধনা, কার্তিক, ১৩২৮।
৫২। 'কামাল পাশা'—মোসলেম ভারত, কার্তিক, ১৩২৮।
৫৩। 'বিদ্রোহী'—মোসলেম ভারত, কার্তিক, ১৩২৮।

['বিদ্রোহী' ২২শে পৌষ ১৩২৮ তারিখের সাপ্তাহিক 'বিজলী', ১৩২৯ সালের 'প্রবাসী' এবং ১৩২৯ বৈশাখের 'সাধনা' পত্রিকায় সংকলিত হয়েছিল।]

এগুলি ছাড়া এই সময়ে 'বিজলী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় নজরুলের আরও অনেক কবিতা ও গান মুদ্রিত হয়েছিল। তার সম্পূর্ণ তালিকা নবীন নজরুল-গবেষকেরা প্রস্তুত করবেন।

উক্ত সময়ের মধ্যে মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় নজরুলের 'কবিতা-সমাধি,' 'উদ্বোধন', 'কলকী প্রিয়' ও 'বেদন-সাথী' শিরোনামে চারটি কবিতা, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) শীর্ষক ছোট গল্প এবং "তুর্ক মহিলার ঘোমটা-খোলা" (কার্তিক ১৩২৬) নামক সমালোচনা-নিবন্ধ, এই ছয়টি রচনা মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২৮ সালের 'সওগাত'-এ নজরুলের 'আবাহন' নামে একটি সাধারণ পদ্য ছাপা হয়েছিল; সেই সংখ্যাতেই বার হয়েছিল গোলাম মোস্তফার 'নিমন্ত্রিত'; ফলে প্রথম পর্যায়ের 'সওগাত'-এ নজরুলের লেখা আর দেখা গেল না। নব-পর্যায়ে ১৩৩৩ আষাঢ়ে চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যক 'সওগাত' প্রকাশিত হয় এবং ১৩৩৩ আশ্বিনে নজরুলের 'সর্বহারা' কাব্যের উৎসর্গ-কবিতাটি 'সর্বসহা' (রচনা : কলকাতা, ১৬ই ভাদ্র, ১৩৩৩) শিরোনামে আত্মপ্রকাশ করে।

একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, নজরুলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য 'অগ্নি-বীণা'র কোনো কবিতাই 'সওগাত'-এ মুদ্রিত বা সংকলিত হয়নি। তৎসত্ত্বেও গুণগ্রাহী শাহাবুদ্দীন আবেগভরে বলেছেন :

> ধন্যবাদ 'সওগাত'-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে, তিনি নজরুলের প্রথম গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' সওগাতে প্রকাশ করেছিলেন।

শ্রীবুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' নজরুলের "তোরা সব জয়ধ্বনি কর্" শুনে' ভেবেছে তার "অধিকাংশ ফাঁকা আওয়াজ।" শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ দস্তিদার 'উপাসনা'-র আশ্বিনে নজরুলের 'বিদ্রোহী'-তে দেখেছেন "নকল পৌরুষের অভিনয়।" অতঃপর সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন যে, নজরুলের "আদর্শ-বিলাস হলো প্রথমতঃ নিপীড়িতদের প্রতি মমত্ববোধ, দ্বিতীয়তঃ দেশের স্বাধীনতার জন্য একটি উদগ্র আবেগ।"— (নজরুল ইসলাম : একটি মন্তব্য : কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা)। কিন্তু বিপ্লববাদী নজরুল তাঁর সক্রিয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতিপক্ষে এবং নির্যাতিত মেহনতী জনতার সপক্ষে অব্যর্থ ভাষায় আপোষহীন সংগ্রামের আহ্বান-বাণী উচ্চারণ ক'রে গেছেন। 'চির-বিদ্রোহী' বলেছেন :

> বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান।
> তোমার ধরার দুঃখ কেন
> আমায় নিত্য কাঁদায় হেন?
> বিশৃংখল সৃষ্টি তোমার, তাই ত কাঁদে আমার প্রাণ॥
>
> বিদ্রোহ মোর থামবে কিসে, ভুবন-ভরা দুঃখ-শোক।
> আমার কাছে শান্তি চায়
> লুটিয়ে পড়ে আমার পা'য়—
> শান্ত হ'ব আগে তা'রা সর্বদুঃখ-মুক্ত হোক্॥

সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ নজরুলের মনে হয়েছে মঙ্গলই সর্বাপেক্ষা সত্য এবং সেই সত্য সৌন্দর্যের নামান্তর। তরবারির সংঘাতে বিকীর্ণ সৌন্দর্য তন্বীদেহে ফুলে শিশিরে বিচ্ছুরিত সৌন্দর্য অপেক্ষা নজরুলের চোখে হয়েছে অনেক বেশী আকর্ষণীয়। তাই নারীপ্রেমের ললিত আহ্বান উপেক্ষা ক'রে তিনি বারবার সাড়া দিয়েছেন মঙ্গলের উদাত্ত আহ্বানে, প্রিয়ার দেওয়া ফুলমালা ধুলায় ফেলে দিয়ে সানন্দে পরেছেন বিদ্রোহীর রণবেশ। দুঃখক্লিষ্ট জগতের ব্যাপার দেখে' চমকিত হয়ে ভেবেছেন :

> প্রলয়কে কি বাঁধতে পারে বলয়-পরা নর্তকী?

নজরুলের এ-ধরনের দু'টি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শাহাবুদ্দীন অদ্ভুত মন্তব্য করেছেন :

> কোনো বিলাসী, সাহিত্য অথবা শিল্প-বিলাসী, কবি-সমালোচকের পক্ষে এর সম্পূর্ণ অনুভূতি দৈব পাওয়াও সম্ভব নয়। কবির মতো সম-পর্যায়ের বিশাল হৃদয় ভিন্ন এর গুরুত্ব অনুধাবন অসম্ভব।

আসল কথা, আজকের বিশ্ব-মানবের মহত্তর আদর্শ যে সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা (Socialist Humanism), তার বিরুদ্ধবাদী কোনো পশ্চাৎপদী লেখকের পক্ষেই নজরুলের প্রত্যয়ের ঐকান্তিকতা

ও উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। দেশের 'সুধী' শ্রেণীর তাঁবেদার সাহিত্যিকেরা মনে করেন যে, তথাকথিত 'সত্যদ্রষ্টা স্রষ্টার' কাজ হচ্ছে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার জীর্ণ ছিন্ন স্থানগুলি যথাসম্ভব তালি দিয়ে তাকেই বহাল রাখার বাণী প্রচারণা, তার আমূল সংস্কারের মন্ত্র উচ্চারণ অসত্য-দৃষ্টি অপস্রষ্টার অপকার্য। এবং বিপ্লববাদীর সৃষ্টি 'অনাসৃষ্টি'॥

শাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর 'শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে বলেছেন:

> নজরুলের কাব্যের একটি বিশেষ সৌন্দর্য: দীপ্ত বর্ণোজ্জ্বলতা।----
>
> কবিতায় একটি কারণে রঙ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, আর তা হ'ল এই যে, কবিতা চিত্র না হলেও চিত্রকল্পের সমাহার।-----
>
> সম্ভবত: জীবনানন্দ দাশ রঙের তুলীতে কবিতায় ছবি আঁকার শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং নজরুল এ-ব্যাপারে জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠতর পূর্বসূরী।

নজরুলের ব্যবহৃত উপমা (Simile) শুধু তুলনা (Comparison) নয়, তাতে উপরন্তু প্রতিভাত হয় সুন্দর চিত্র; তাই তাঁর অনেক উপমা হয়েছে চিত্রোপমা (Imagery)। একটি নমুনা তুলছি:

চাঁদ হেরিতেছে চাঁদ-মুখ তার সরসীর আরশিতে।
ছোটে তরঙ্গ বাসনা-ভঙ্গ সে-অঙ্গ পরশিতে॥
—['চাঁদ-মুকুর' : ছায়ানট]

এখানে কবির সৌন্দর্য-চেতনা ও সংবেদনশীলতা একাত্ম হয়ে অনায়াসে প্রবৃত্ত করেছে একটি অপূর্ব অনবদ্য চিত্রকল্প,—তাতে প্রকৃতি-বর্ণনা হয়েছে প্রাণবন্ত ও প্রাণস্পর্শী। বলা বাহুল্য যে, এখানে হৃদয়-সংবেদ্য রসপ্রতিমা সৃষ্টিই হয়েছে কবির লক্ষ্য। কিন্তু যেখানে নজরুল তাঁর জনজাগরণমূলক কবিতায় এরূপ উপমা প্রয়োগ করেছেন, সেখানে সৌন্দর্যকল্পনা ও কল্যাণবোধ সমন্বিত হয়ে রূপের অনিন্দ্য রসবিগ্রহ নির্মাণ করেছে। তার কিছু নজির দিচ্ছি:

সে ইস্রাফিল প্রলয়-শিঙ্গা বাজাবেন কেয়ামতে—
তারি ললাটের চাঁদ আসিয়াছে আলো দেখাইতে পথে।-----
আমার ঋণ শোধ করো, যদি বাঁচিবার থাকে সাধ;
আমাদের বাঁকা ছুরি আঁকা দেখ আকাশে ঈদের চাঁদ।
তোমারে নাশিতে চাষার কাস্তে কি রূপ ধরেছে, দেখ;
চাঁদ নয়, ও যে তোমার গলার ফাঁদ; দেখে' মনে রেখ।----
এসেছে ঈদের চাঁদ বরাভয় দিতে আমাদের তরে,
আবার খালেদ এসেছে আকাশে বাঁকা তলোয়ার করে।

*

এখানে 'ঈদের চাঁদ' উপমেয়; এবং ইস্রাফিলের 'ললাটের চাঁদ', 'বাঁকা ছুরি,' 'চাষার' কাস্তে,' 'গলার ফাঁদ' এবং 'বাঁকা তলোয়ার' প্রভৃতি উপমান ব্যবহৃত হয়েছে সংগ্রামী চেতনার প্রতীক রূপেই। এ-সব উপমান কবিতার আবেদনকে করেছে তীক্ষ্ণ ও প্রসারিত।

এ-প্রসঙ্গে 'কাস্তে' উপমেয় এবং 'চাঁদ' উপমান রূপে ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি। তুর্গেনিভের সুবিখ্যাত 'একটি জীবন্ত ধ্বংসাবশেষ' নামক ছোট-গল্পে পঙ্গু মেয়ে 'লুকেরয়া' বলছে:

> আমার হাতে রয়েছে একখানা কাস্তে। সাধারণ কাস্তে নয়। সেটাকে বোধ হতে লাগলো স্বয়ং চাঁদ- - - - - - - চাঁদটা যখন কাস্তের মতো দেখতে হয় সেই রকমের। আর এই চাঁদটা দিয়ে আমাকে গমগুলো কাটতে হয়েছিল পরিষ্কার ক'রে।

এই চিত্রকল্পটি ভেঙে শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত একালে লিখেছেন:

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
ছায়াপথে কোন্ অশরীরী উন্মাদ
লুকালো আসতে আসতে।
—['কাস্তে', সংবর্ত]

এই দৃশ্যোপমার অনুসরণে পরবর্তীকালে শ্রীদিনেশ দাস তাঁর 'কাস্তে' কবিতায় লিখেছেন:

নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ-যুগের চাঁদ হলো কাস্তে।

বিপ্লবী কৃষক শ্রমিকের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের প্রতীক 'কাস্তে ও হাতুড়ি',—কৃষাণের কাস্তে ও শ্রমিকের হাতুড়ি যুক্ত হ'য়ে তাদের আন্তর্জাতিক পতাকায় আজ শোভিত। নজরুলের কবিতাটিতে 'কাস্তে', 'ছুরি,' 'তলোয়ার' প্রভৃতি উপমান ব্যবহারের মূলে রূপসৃষ্টির অপেক্ষা প্রধানতর হয়েছে মানবিকতার প্রেরণা। তাঁর সমাজচেতনাপ্রসূত কবিতাগুলিতে ব্যবহৃত এরূপ উপমাপুঞ্জ এই প্রেরণা-সঞ্জাত হয়েই লাভ করেছে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য; তাতে কাব্যভাবের অলঙ্করণের ক্ষেত্রে উন্মোচিত হয়েছে এক নূতন দিগন্ত। বাঙলা কাব্যসাহিত্যে নজরুল যে নব্যধারার প্রবর্তন করেছেন, তার অসামান্যতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ নিপীড়িত মানবতার প্রতি সুনিবিড় সহানুভূতি এবং সেই অদম্য ভাব শিল্পসম্মত উপায়ে প্রকাশের উপযোগী অভিনব আঙ্গিক।
নজরুল-সাহিত্যের এই স্বকীয়তা ও তার নূতন রীতি-নৈপুণ্যের প্রবণতা শাহাবুদ্দীন সম্যক্ উপলব্ধি করতে পেরেছেন ব'লেই তাঁর সুদক্ষ হাতে তার বিশদ বিচার হয়েছে যথার্থ ও সার্থক।
শাহাবুদ্দীনের 'নজরুল-সাহিত্য-বিচার' পুস্তকখানিতে মোট পঁচিশটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রথম প্রবন্ধ: 'নজরুল-চর্চা: দেশে বিদেশে।' তাতে শাহাবুদ্দীন বলেছেন যে, নজরুল-বিষয়ে "বিভাগ-পূর্ব বাঙলার প্রথম গ্রন্থ অধ্যাপক আবুল ফজলের 'বিদ্রোহী কবি নজরুল'; ১৯৪৭ সালের মার্চে (চৈত্র, ১৩৫৪) এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।"—গ্রন্থখানির গোড়ায় আবুল ফজল 'লেখকের কথা' শিরোনামে যে-ভূমিকা লিখেছেন, তার শেষে রচনার স্থান ও কাল মুদ্রিত আছে: "সাহিত্য-নিকেতন, চট্টগ্রাম; চৈত্র, ১৩৫৪।" এ থেকে ধারণা হয় যে, ১৪৪ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের

চৈত্র যুগান্তর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলের দিকে প্রকাশিত হয়েছিল। এটা "বিভাগপূর্ব-কাল" নয়,—বিভাগোত্তর কাল। সৈয়দ আলী আহসান ১৩৬১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত তাঁর 'নজরুল ইসলাম' পুস্তকের শেষে "নজরুল ইসলাম সংক্রান্ত আলোচনা" শিরোনামে "কয়েকটি সংকলন ও আলোচনা-গ্রন্থের উল্লেখ" করেন এইভাবে:

নজরুল-প্রতিভা : কাজী আবদুল ওদুদ

গ্রন্থটির প্রধান অংশ হচ্ছে কবির জীবনী—লেখক আবদুল কাদির। কাব্য-সমালোচনা কাজী আবদুল ওদুদের। আলোচনা-অংশটি স্বল্প-পরিসরের, কিন্তু প্রাণ-বন্ত।

বিদ্রোহী কবি নজরুল : আবুল ফজল

নজরুল ইসলামের জীবনী—ছাত্রদের জন্য সরল ও মনোজ্ঞ ক'রে লেখা।

নজরুল-সাহিত্যের ভূমিকা (১ম খণ্ড) : শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী

দশটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নজরুল কাব্যের বিভিন্ন প্রকৃতির পরিচিতি ও আলোচনা।***

কাজী আবদুল ওদুদের 'নজরুল-প্রতিভা' ১৩৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। তার উল্লেখ শাহাবুদ্দীন করেননি। তাতে "নজরুল ইসলাম," "নজরুলের প্রতীক-প্রীতি" এবং "আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ" নামক তিনটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। (শেষোক্ত লেখাটি থেকে আবুল ফজল তাঁর বইয়ের ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন।) ১৩৪৮ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলকাতার সেন্টাল কলেজ-হলে মুসলিম সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে নজরুলের ৪৩-তম জন্ম-বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়; সেই সভায় কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'নজরুল ইসলাম' পাঠ করেন। এটি প্রথমে ১৩৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'আজকার কথা' নামক পুস্তকের শেষে সন্নিবেশিত হয়েছিল। (সেই লেখা থেকেই আবুল ফজল তাঁর পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় কিয়দংশ উৎকলন করেছেন)। তাঁর অপর দু'টি প্রবন্ধ ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সাপ্তাহিক 'বাঙ্গালী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই তিনটি লেখাই ১৩৫৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'শাশ্বত বঙ্গ' নামক প্রবন্ধ-সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আবুল ফজল তাঁর 'রেখাচিত্র' পুস্তকের ৩৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন:

১৯৪৭এ 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' নামে আমি একটি ছোট বই লিখেছিলাম—খুব গভীর আর নজরুল-সাহিত্যের বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় না গিয়ে মোটামুটি সহজপাঠ্য ক'রেই বইটি লেখা। বইটি সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট্রিকের দ্রুতপঠন হিসেবে ঢাকা সেকেণ্ডারী বোর্ডের অনুমোদনও লাভ করেছিল এবং একটানা প্রায় পাঁচ বছর পাঠ্য ছিল।

এই বইটি সম্পর্কে মরহুম অধ্যাপক আনোয়ার পাশা তাঁর 'সাহিত্য-শিল্পী আবুল ফজল' পুস্তকের ২৮৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন:

পাকিস্তানে কবি নজরুল ইসলামের উপর একখানি পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনার প্রয়াস এই প্রথম।

বস্তুতঃ, 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' বিভাগপূর্ব-কালের প্রকাশনা নয়। কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদের 'নজরুল-প্রতিভা' পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত তাঁর তিনটি প্রবন্ধই বিভাগপূর্ব-কালের রচনা এবং বিভাগপূর্ব-কালেই প্রচারিত। শাহাবুদ্দীনের তালিকায় বাংলাদেশে মুদ্রিত নজরুলের জীবন ও সাহিত্য-সম্পর্কিত ৬-সংখ্যক 'স্বরচিত একক গ্রন্থ':

৬. নজরুল-কাব্য-পরিচিতি: ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন (১৯৪৯)।

কিন্তু ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের 'নজরুল-কাব্য-পরিচিতি' প্রথম সংস্করণ প্রকাশের কাল: '১৯৫৫ সন'—'১৯৪৯' নয়।

বন্দে আলী মিয়া তাঁর 'জীবনশিল্পী নজরুল' (১৯৭১) লেখার আগে 'ছোটদের নজরুল' (২রা পৌষ ১৩৬৮) লিখেছিলেন; তার উল্লেখ অনাবশ্যক বাহুল্য নয়। শাহাবুদ্দীনের তালিকায় শ্রী-প্রবোধচন্দ্র সেনের KAZI NAZRUL ISLAM (Karachi, 24 May 1956) পুস্তিকাখানির নামও নেই। বাঙলা সঙ্গীতে ও কাব্য-সাহিত্যে নজরুলের স্থান নির্ণয় ক'রে প্রবোধচন্দ্র তাতে বলেছেন:

> As regards his musical compositions which number more than fifteen hundred, a number that rivals that of Rabindranath alone, it may perhaps be said without fear of contradiction that he ranks as the most prolific composers of all times......
> But whatever his fate as a composer, indications of history are always there for us to believe that a place of honour in the rank next to that of Madhusudan and Rabindranath is assured to him as a poet, and among Muslim poets of Bengal his place is beyond doubt second to none.

নজরুলের গান ও কবিতা সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্রের এই নির্মোহ সমীক্ষা যে শ্রীজীবনানন্দ দাশ, শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার, সৈয়দ আলী আহসান, আজহারউদ্দীন খান প্রমুখের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ক্রটিসন্ধানপর সমালোচনা অপেক্ষা অনেক বেশী জ্ঞানগর্ভ ও সারবান, এ-কথা সাহিত্য রসিকেরা স্বীকার করেন। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ-অধ্যাপক ও শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-ভবনের অধ্যক্ষ প্রবোধচন্দ্রের ধারণা যে, নজরুলের গানের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের গানের প্রায় সমান, অর্থাৎ পনের শতেরও অধিক। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলছেন যে, নজরুল তিন হাজারেরও বেশী সংখ্যক গান লিখেছিলেন এবং ইতোমধ্যেই তাঁর রচিত প্রায় দুই হাজার গান সংগৃহীত হয়েছে। সুরস্রষ্টা নজরুলের ভাগ্য ভবিষ্যতে কিরূপ নিরূপিত হবে, সে-বিষয়ে প্রবোধচন্দ্রের মনে সঙ্গত কারণেই সংশয়ের ক্ষীণ রেখা দেখা দিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে শাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন:

১. নজরুলের সুর দেওয়া গানে সুনিশ্চিতভাবে একটা নজরুলী ঢং আছে। তীক্ষ্ণবোধ-সম্পন্ন, নিখুঁত শ্রবণশক্তিসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞ একদল গুণী মানুষ যদি শান্তিনিকেতনের মতো গানের বিদ্যালয় খুলে কেবলমাত্র নজরুলের গান প্রচারের চেষ্টা করেন, তা হ'লে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মতো নজরুল-গীতি বেশ স্বতন্ত্র একটা গর্বের শির তুলে দাঁড়াতে পারবে।

—[১৫৮ পৃষ্ঠা]।

২. বাংলাদেশে এবং পশ্চিম-বঙ্গে আজকাল নজরুল-গীতির চর্চা উত্তরোত্তর বাড়ছে। কিন্তু আশানুরূপ নয়। ভারতীয় সঙ্গীত-জগতের সুর-সৌরলোকের উজ্জ্বলতমদের অন্যতম এই মহাজ্যোতিষ্কের সঙ্গীত-সাধনার পটভূমি, ব্যাপ্তি, গভীরতা, বৈচিত্র্য ও ঐন্দ্রজালিক মহিমা নিয়ে গবেষণার সামান্যতম নিদর্শন কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। না পশ্চিম বঙ্গে, না বাংলাদেশে। নজরুল-সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার মতো উপযুক্ত গুরু আজকের বাংলাদেশে এবং পশ্চিম-বঙ্গে একজনও আছেন ব'লে আমার জানা নেই। মুখের কথায় চিড়ে ভিজে না। সঙ্গীত কঠিনতম শাস্ত্র, দুরূহতম শিল্প। বাণী-প্রধান সঙ্গীত গুরুতম উচ্চারণশাস্ত্রী। সেই সঙ্গে সঙ্গীত-গুরুর এই ধারণা থাকা প্রয়োজন ; নজরুল তিন থেকে চার হাজার গান লিখেছিলেন। আর সে গানে আছে এক শ্রেষ্ঠ কবির গভীর জীবনবোধের বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক বাণী, এক নাটকীয় ভঙ্গীর বিশেষ দ্যোতনা, কাব্য ও সুরের সূক্ষ্মতম ধ্বনি ও ছন্দ-ব্যঞ্জনা।

--[৩৬ পৃষ্ঠা]।

শাহাবুদ্দীনের এ-সকল কথায় উদ্দীপিত ভাবের আবেগ, বিশ্লেষণী বুদ্ধির দীপ্তি ও সঙ্গীতের স্বরূপ উপলব্ধির সামর্থ্য সুপরিস্ফুট।

শুধু নজরুলের গানের উপকরণ ও আঙ্গিক নিয়ে নয়, তাঁর কবিতা, অনুবাদ-কাব্য, গীতিনাট্য, নাটক-নিবন্ধ, বক্তৃতা-ভাষণ, চিঠিপত্র, ছোট-গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি নিয়েও শাহাবুদ্দীন আলোচ্য পুস্তকে সরস অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। নজরুলের সাহিত্য ও সঙ্গীতের ভাববৈশিষ্ট্য ও শিল্পসৌন্দর্য সম্পর্কে শাহাবুদ্দীনের কয়েকটি মনোজ্ঞ ও সারগর্ভ মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

১. হৃদয়গ্রাহী হতে গেলে ভাষাকে হৃদয়-ছোঁয়া হ'তে হয়। কবিতার মতো গদ্যেও নজরুল ইসলাম বাঙলা সাহিত্যে এই হৃদয়-ভাষার স্রষ্টা।

—[নজরুল ইসলামের গদ্য]

২. নজরুল ইসলামের গদ্য-রচনা, নিবন্ধ, ছোট-গল্প, নাটক রসিকজনের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ। যদিও এই বিভাগগুলিতে তাঁর সাফল্য তাঁর কাব্যসৃষ্টি ও সুরসৃষ্টির তুলনায় মলিনকান্তি, তবুও সন্দেহ নেই, বাংলা গদ্যের রাজসভায় তিনি উচ্চতমস্তক রাজন্যবর্গের একজন।

—[গানের সাম্রাজ্যে নজরুল]

৩. যোগীর ধ্যানই গান ; যাতে থাকবে ধ্বনির অপূর্ব বিন্যাসের সঙ্গে সংহত আবেগ এবং ভাবনার সংমিশ্রণ। নজরুল ইসলামের গানে স্নিগ্ধ, মেলোডি আর-হারমনির সঙ্গে সংযত আবেগের প্রকাশ লক্ষণীয়। শিল্পের ঐ কঠিন অনুশাসনে তিনি অপূর্ব সৌন্দর্য নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন ব'লে আমরা তাঁকে উচ্চ্ছৃঙ্খল কবি বলি না, বলি মহত্তর কবি-শিল্পী।

—[সনেট ও নজরুলের গান]

৪. আংটির উপর নকশা আঁকা এক ধরনের আর্ট এবং পাহাড় কুঁদে মূর্তি বানানোও এক ধরনের শিল্প। কিন্তু পাহাড় কুঁদে বড় বড় মূর্তি বড় বড় শিল্পীরাই নির্মাণ করেন; ক্ষুদে শিল্পীরাই ঐ আংটির উপর চমৎকার নকশা আঁকেন।
সঙ্গীতের লেখক হিসেবে নজরুল ইসলামের অসামান্য কৃতিত্ব সত্ত্বেও সেখানে তিনি যে কাজ করেছেন তা ঐ ক্ষুদে শিল্পীর—যদিও বৈচিত্র্যের জন্যে, বিশালতার জন্যে এবং বিচিত্র ভাব ও সুরের সম্মিলনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে, মানব-জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতিকে চমৎকারভাবে রূপদানের জন্যে সেখানেও তিনি ক্ষুদ্রত্বের সীমা ডিঙিয়েছেন—চিত্রকল্প, উপমা ও রূপকের অসাধারণ উপস্থাপনার জন্যে তিনি খ্যাতিত্ব লাভ করেছেন। তবু আমার মনে হয়, 'অগ্নি-বীণা', 'সিন্ধু-হিন্দোল,' 'জিঞ্জীর' ও 'সাম্যবাদী'-র কবির চেয়ে এই সঙ্গীতস্রষ্টা বড় নয়।

—[মোসাহেব সমালোচক ও নজরুল ইসলাম]

৫. হাফিজ কেন গীতিকাব্যের রচয়িতা হয়েও মহাকবি, রবীন্দ্রনাথ কেন গীতিকাব্যের লেখক হয়েও মহাকবি, তার সূত্রানুসন্ধানেই বেরিয়ে পড়বে যে, এক মহাজাতির হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যের, আকাঙ্খার এবং চেতনার যোগ্যতম রূপকার হয়েই তবে মহাকবির গৌরব অর্জন করতে হয়। এই গৌরব নজরুল অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সন্ধ্যা', 'সর্বহারা,' 'জিঞ্জীর' এই সব কাব্যগ্রন্থ মহাজাতির মহাবেদনার মহাদুঃখের মহাসঙ্গীত।

—[নজরুল ইসলাম ও বুদ্ধদেব বসু]

৬. গজলের সংযত কাঠামোয় প্রযুক্ত প্রত্যক্ষ অসংলগ্নতার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল প্রকাণ্ড-শরীর 'বিদ্রোহী' কবিতায়। নিঃসন্দেহে ভাবোন্মাদনার অপরূপ প্রকাশ এ কবিতা। কিন্তু তার মধ্যে যে হাফিজী কৌতুক ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

—[নজরুল ইসলাম ও হাফিজ]

৭. নজরুলই বাঙলা ভাষায় প্রথম সৃষ্টি করলেন উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য। রাজনৈতিক সাহিত্য রচনা ক'রে এবং কবিতা লিখে' যে সমাজ-কাঠামো পাল্টানো যেতে পারে, এ-খবর তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন সরবে।

—[নজরুল-মানস]

৮. যাদুকরের জামেয়ারের পকেট থেকে অবিরাম বেরিয়ে আসা পাখীর মতো নজরুলের উপমা রূপক চিত্রকল্প সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যে একান্ত দুর্লভ।-------শব্দচিত্রকল্পে, বাক্যবাক্‌প্রতিমায় এবং ধ্বনিপ্রতিমায় নজরুলের কাব্যে উদগত ধ্বংস-রূপ এঁদের কাব্যে সৃষ্টি হয়নি।

—[ভায়োলেন্সের ভায়োলিন]

৯. নজরুল ইসলাম ফারসী কাব্যের সংস্পর্শে এসে' অত্যন্ত উন্নত মানের উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহার শিখেছিলেন। সে উজ্জ্বল চিত্রকল্প ও উপমা তাঁর নিজের কাব্যকে আকর্ষণীয়ভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

—[রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের অনুবাদক নজরুল]

এ সকল উক্তিতে সুস্পষ্ট যে, নজরুলের সাহিত্যকর্মের বিচার শাহাবুদ্দীন মামুলী প্রথায় করেন নি; তিনি তার উপকরণের ঐশ্বর্য ও নির্মাণকলার বৈচিত্র্য অভিজ্ঞ রূপদক্ষের কৌতূহলী দৃষ্টি ও অভিনিবিষ্ট রসবেত্তার সচেতন মন নিয়ে বাহিরে-ভিতরে সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ ক'রে তার শক্তি ও কান্তি সাচ্ছন্দে বিবৃত করেছেন। ফলে তাঁর এই সাহিত্য-বিচার অনেকাংশে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে সৃজনধর্মী সমালোচনার পর্যায়ে।

শাহাবুদ্দীন তাঁর পুস্তকটিতে প্রসঙ্গত: কাজী আবদুল ওদুদ, শ্রীজীবনানন্দ দাশ, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার, সৈয়দ আলী আহসান ও আজহারউদ্দীন খানের কতিপয় বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদে বৈদগ্ধ্যাত্মক বিতর্কের অবতারণা করেছেন। তিনি তাঁদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সে-সবের বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে যথেষ্ট দৃঢ়তা-সহকারেই বলেছেন:

১ আবদুল ওদুদ সুগভীর দৃষ্টি দিয়ে নজরুলের কাব্যকে ভোগ করতে পারেন নি।

২. নজরুল-প্রতিভার মহত্ত্বকে জীবনানন্দ স্বীকার ক'রে নিতে পারেন নি।

৩. বুদ্ধদেব বসুর সারা জীবনের সাহিত্যালোচনায় মাঝে মাঝে এই অব্যবস্থিতচিত্ততার প্রকাশ ঘটে। তাঁর অব্যবস্থিত চিত্তের আলোচনা সম্পূর্ণভাবে অনির্ভরযোগ্য।------ 'গোলাপ কেন কালো' গ্রন্থে তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন নজরুলের জনপ্রিয়তা মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে। সেই ঈর্ষা-কণ্টকিত সমালোচনা ভবিষ্যতে তাই 'কুষ্মাণ্ড' ব'লে বিবেচিত হবে।

৪. অরবিন্দ পোদ্দার নজরুলের কাব্যভাষা সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন, তা তাঁর নজরুল-সাহিত্য-পাঠের সীমানা নির্দেশ করে, শুধু তাই নয়, কাব্যবোধেরও সীমানা নির্দেশ করে।

৫. মূর্ধণ্যধ্বনির প্রতি নজরুলের• মমতাকে তিনি (সৈয়দ আলী আহসান) 'আর্দ্র-বিলাস' বলেছেন। অত্যন্ত আপত্তিজনক এই শব্দের ব্যবহার।

৬. এই আজহারউদ্দীন খান। যাঁর কণ্ঠটিকে ঠিক একটি মোসাহেবের কণ্ঠ বলা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ছাত্রকে এই মোসাহেব কণ্ঠে উচ্চারিত প্রচারপত্র পাঠ ক'রে শিখেছেন নজরুল Great Poet নন—Good Poet।

এ-যাবত বহু সাহিত্যরথী ব্যূহ রচনা ক'রে নজরুলের প্রতি নানা দিক থেকে অযথা শরসন্ধান করেছেন। শাহাবুদ্দীন সে-সকল তীক্ষ্ণ বাণ নিপুণ হাতে উৎপাটন ক'রে নজরুলের বিরাট সাহিত্য-শরীরের ক্ষতসহ অবিকৃত চিত্র পাঠক-সমক্ষে তুলে' ধরেছেন; এজন্য তিনি বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে বহুদিন স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। অতঃপর তাঁর রচিত সমালোচনা-আদর্শের

সুদৃঢ় চালে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নজরুলের অভিমুখে সকল অন্যায় অস্ত্র নিক্ষেপ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হবে,—নজরুলের দিকে কেউ অকারণ কালিমা ক্ষেপণ করতে গেলে সে-কালিমায় তিনি নিজেই হবেন কলঙ্কিত—কুখ্যাত।

শিল্প-দর্শনের যে স্বচ্ছ দর্পণে নজরুল প্রতিভার সৃষ্টিনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করতে হবে, নন্দনতাত্ত্বিক নীতির যে নির্মম নিকষে সেই সৃষ্টিমহিমার প্রকৃত মূল্য পরখ করতে হবে, শাহাবুদ্দীন প্রচুর শ্রম ও প্রজ্ঞার বিনিময়ে তার এক মানোত্তীর্ণ রেখাচিত্র উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং আমাদের সুপারিশ যে, তাঁর নজরুল-বিষয়ক নিবন্ধাবলী এদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পঠনীয় রূপে অনুমোদিত করা হোক। তা হ'লে নজরুল-সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়ন করতেই তাঁরা শুধু শিখবেন না, সেই সাহিত্যের আসল স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতেও তাঁরা পারগ হবেন। তাতে শিক্ষা ও আনন্দ, দুইই লাভ হবে।

নজরুলের দৈবী প্রতিভার বিস্ময়কর সৃষ্টি তাঁর কাব্য ও সঙ্গীত। সেই অসামান্য সৃষ্টির ভাব-প্রস্থান, রূপ-প্রেরণা ও কলা-লক্ষণের সঙ্গে পরিচয় হবে যতখানি যথার্থ, অন্তরঙ্গ ও পুংখানুপুংখ, তার অনির্বচনীয় রসের আনন্দময় আস্বাদ হবে ততখানি সার্থক ও সম্পূর্ণ। শাহাবুদ্দীনের অনন্যমনস্ক নজরুল-অনুশীলন সেই পরিচয় লাভের পথ করেছে প্রশস্ত ও উজ্জ্বল। তাই তাঁর প্রতি আমাদের প্রশংসার সীমা নেই।

--আবদুল কাদির

নজরুলের রেজারেকশান*

অবশেষে ''নজরুল-রচনাবলী'' (৪র্থ খণ্ড) প্রকাশিত হ'ল। আমার ''নজরুল-চর্চা দেশে-বিদেশে'' প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম, ''নজরুল-রচনাবলী''র (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) প্রকাশ নজরুল ইসলামের রেজারেকশান। কথাটা একটু ব্যাখ্যা করলে ভাল হয় ব'লে মনে করি।

আমরা কেউ কেউ সমালোচনা লিখি—সে সমালোচনায় প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই থাকে—কবির কাব্যের ও সাহিত্যের ব্যাখ্যাও থাকে। কিন্তু মানতেই হবে ব্যক্তির আপন দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা ঐ সব ব্যাখ্যায় কোন-না-কোনোভাবে জড়িয়ে যায়। ফলে কবির সম্পূর্ণ স্বরূপ পাঠকের চোখে ধরা পড়ে না। সে-জন্যে সমালোচনা প'ড়ে কবিকে সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না। কবিকে জানতে হ'লে তাঁর সৃষ্টিকে জানতে হবে। কবির সেই সাহিত্য যদি পাঠকের সামনে না থাকে তা'হ'লে সমালোচনার মান নির্ণয় সম্ভব হয় না। সমালোচনা কবির ব্যাখ্যায় কতটা প্রতারকের ভূমিকা পালন করল অথবা কবির সত্যকার পরিচয় তুলে ধরল কবির সাহিত্যের সংগে নিবিড় পরিচয়ে তা উপলব্ধি করা সম্ভব।

*নজরুল রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড) ॥ সম্পাদক : আবদুল কাদির ॥ প্রকাশক : বাংলা একাডেমী ॥ দাম : ৫০ টাকা।

কবির সেই সাহিত্যের সংগে পরিচয়ের জন্য তা অনায়াসলব্ধ হওয়ার প্রয়োজন। বহু বৎসর যাবৎ নজরুল ইসলামের সেই সাহিত্য অনায়াসে পাওয়া অসম্ভব ছিল। সাধারণ অসাধারণ অধিকাংশ পাঠক বাজারে প্রকাশিত নজরুলের দু'চারখানা গ্রন্থ পাঠে নজরুল-পিপাসা নিবারণ করতেন। এর মধ্যে প্রধানতম গ্রন্থটি ছিল "সঞ্চিতা"। ১৯২৯-৩০ সালের দিকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ফলে কবির পরবর্তী কালের অনেক লেখা "সঞ্চিতা"তে স্থান পায়নি। শুধু তাই নয়—বৃটিশ-সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত কবির 'বিষের-বাঁশী', 'ভাঙার-গান', 'প্রলয়-শিখা' গ্রন্থ তিনটির একটি কবিতাও "সঞ্চিতা"তে স্থান পায়নি। "অগ্নি-বীণা"-র একটি মাত্র কবিতা "সঞ্চিতা"তে স্থান পেয়েছিল—'বিদ্রোহী'। কিন্তু তাঁর 'ধূমকেতু', 'কামাল পাশা', 'মোহররম', 'প্রলয়োল্লাস,' 'কোরবানী,' 'আনোয়ার,' 'রণ-ভেরী' প্রভৃতি বীর ও রৌদ্র রসের কবিতাগুলি—যে-গুলি নজরুলের বীর চরিত্রের প্রতীক, যে যুদ্ধ-কবিতা তাঁর বৈশিষ্ট্য, সে-গুলি "সঞ্চিতা"তে অনুপস্থিত। কবির "জিঞ্জির" কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা 'সঞ্চিতা'তে গৃহীত হয়েছিল, যেমন—'অঘ্রাণের সওগাত,' 'মিসেস এম. রহমান', 'ঈদ মোবারক', 'বার নেহেশ্‌তে কে যাবি আয়', 'নওরোজ', 'অগ্রপথিক', 'চিরঞ্জীব জগলুল' এবং 'ভীরু'। কিন্তু যে প্রতীকার্থে গ্রন্থটির নামকরণ সেই "জিঞ্জীর"-এর বিপ্লবাত্মক কবিতাগুলি বাদ ছিল। "খালেদ", "আমানুল্লাহ্‌", "সুবহ-উম্মেদ", "উমর-ফারুক" প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাগুলি "সঞ্চিতা"য় স্থান পায়নি। মোট কথা "সঞ্চিতা" নজরুলের একটি সামান্য অংশের প্রকাশ। ফলে নজরুল ইসলাম বাঙালী পাঠকের কাছে এক রকম অপরিচিত হ'য়ে পড়ছিলেন। সেই জন্যে পাকিস্তান আমলে "বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড" কর্তৃক "নজরুল-রচনাবলী"র তিনটি খণ্ডের প্রকাশ বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা। সে-কারণেই এঁর উদ্যোক্তাদের যেমন তেমনি এর সম্পাদক কবি আবদুল কাদির সাহেবকে আমি ধন্যবাদ না দিয়ে পারি নি।

"নজরুল-রচনাবলী"র ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ২৫শে মে, ১৯৬৬তে এবং ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০-এ। চার বছরের সময়-সীমায় এই তিনটি খণ্ডের প্রকাশ সহজ-সাধ্য ছিল না। সম্পাদক এবং তাঁর সহযোগীদের নজরুল-ভক্তি, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এই কাজকে ত্বরান্বিত করেছিল। কিন্তু ৪র্থ খণ্ডটি আর অবিলম্বে প্রকাশিত হয়নি। সমস্যা সংকুল বাংলাদেশে অন্যান্য সমস্যার সংগে সম্ভবতঃ এর প্রকাশ-সমস্যা জড়িয়ে পড়েছিল। "বাংলা উন্নয়ন বোর্ড" দেশ স্বাধীন হ'লে তার পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি। সে সংযুক্ত হ'য়ে পড়ে বাংলা একাডেমীর সংগে। বিশালদেহী বাংলা একাডেমীর বিস্তৃত সমস্যার সংগে "নজরুল রচনাবলী" (৪র্থ খণ্ড)-এর প্রকাশ-সমস্যা প্রকট হ'য়ে দাঁড়ায়। ১৯৭০-এ এর মুদ্রণ কার্য শুরু হ'লেও ২৫শে মে, ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত একে পাঠকের মুখদর্শন করতে অপেক্ষা করতে হ'ল। ইতিমধ্যে ১৯৭৬ সালের ২৯শে অগাস্ট প্রায় চৌত্রিশ বছর নজরুল ইসলাম মূক থেকে মৃত্যুবরণ করলেন। বাংলাদেশের মাটিতে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ হ'ল। নতুন ক'রে তাঁর চর্চা শুরু করার আয়োজন চলল। সেই প্রথম ভাবাবেগের প্রচাপে বেরিয়ে এল "নজরুল-রচনাবলী"র চতুর্থ খণ্ড। বিলম্বে হ'লেও যথালাভ। কেননা "নজরুল-চর্চা" সম্প্রসারিত হওয়ার আরও একটি পথ সৃষ্টি হ'ল।

এই খণ্ডে নজরুলের যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হ'য়েছে সে-গুলি হ'ল: ১. নতুন চাঁদ; ২. মরু-ভাস্কর; ৩. বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড) ৩. জুলফিকার (দ্বিতীয় খণ্ড) ৪. শেষ সওগাত; ৫. রুবাইয়াৎ-ই-

ওমর খৈয়াম; ৬. ঝড়; ৭. রাঙাজবা; ৮. দেবী স্তুতি; ৯. হরপ্রিয়া; ১০. দশমহাবিদ্যা; ১১. সঙ্গীতাঞ্জলি; ১২. কুহেলিকা; ১৩. মধুমালা ও ১৪. প্রবন্ধ।
বলা বাহুল্য ৪র্থ খণ্ডে গ্রথিত অধিকাংশ গ্রন্থ কবির মূক হ'য়ে যাওয়ার পরবর্তী ঘটনা। সম্পাদক তাঁর নিবেদনে বলছেন:

> নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ যুগের প্রায় সমুদয় রচনা এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'কুহেলিকা' উপন্যাসখানি তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগে বিরচিত,—যে-যুগে তাঁর সচেতন মনে দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা (Socialistic Humanism) রাজনৈতিক চিন্তাদর্শ রূপে প্রবলতম প্রেরণার সঞ্চার করেছে। এই 'কুহেলিকা' ছাড়া এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত আর কোন গ্রন্থই কবির সম্বিতহারা হওয়ার আগে প্রকাশিত হয়নি।

"কুহেলিকা" ছাড়া যে গ্রন্থসমূহ কবির 'সম্বিতহারা হওয়ার' পর প্রকাশিত হয় সে-গুলোর নামকরণ কি কবির নিজের? এই খণ্ডে গ্রথিত কাব্য 'সঙ্গীতাঞ্জলি' নামটি সম্পাদকের দেওয়া। সম্পাদক বলেছেন:

> এই খণ্ডে 'কবিতা ও গান' অংশের শেষে ১১১টি গান 'সঙ্গীতাঞ্জলি' নামে সন্নিবেশিত হ'য়েছে। এই নামকরণও তিনি অনুমোদন করতেন কিনা তা কে বলতে পারেন?

যা হোক কবির অসুস্থ হওয়ার পর প্রকাশিত অনেকগুলো গ্রন্থের নামকরণ তাঁর নিজের দেওয়া নয়, যেমন 'বুলবুল' (২য় খণ্ড); 'ঝুলফিকার (২য় খণ্ড)', 'শেষ সওগাত,' 'ঝড়', 'রাঙাজবা'। "নতুন চাঁদ" গ্রন্থটির নামকরণ সম্ভবতঃ প্রকাশকের। কবির 'নতুন চাঁদ' শীর্ষক কবিতার নামকরণে গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে। 'মরুভাস্কর' কবির দেওয়া নাম। এটা নবীশ্রেষ্ঠ হজরত মুহম্মদের জীবনী অবলম্বনে রচিত একটি অসম্পূর্ণ কাব্য। সম্পাদক বলছেন:

> আধুনিক কালে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার অসামান্য জীবনবৃত্ত নিয়ে কাব্য বিরচনের চেষ্টা করেছিলেন মীর মোশাররফ হোসেন ও মোজাম্মেল হক; কিন্তু সেই প্রয়াস-সম্পূর্ণতা হ'তে পারেনি। নজরুল ইসলাম পরিণত বয়সে এই বিষয় নিয়ে 'মরু-ভাস্কর' রচনা শুরু করেন; কিন্তু মাত্র ৪২ বছর বয়সে দুরন্ত ব্যাধির কালগ্রাসে পড়ে এই প্রদীপ্ত প্রতিভা-সূর্য অকালে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হ'য়ে যাওয়ায় এই কাব্যখানিও অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

'দেবীস্তুতি' ও 'হরপ্রিয়া' নাটিকা দুটির ও 'মধুমালা' গীতি-নাট্যটির নামকরণ কবির নিজের। 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম'-এর নামকরণও কবির নিজের। সম্পাদক লিখিত 'গ্রন্থপরিচয়'-এ 'দশ-মহাবিদ্যা' গ্রন্থটির কোন পরিচয় পেলাম না।
যা হোক বোঝা যায় কবির সাহিত্য জীবনের চতুর্থ পর্বে তিনি যা লিখেছিলেন তার অধিকাংশ অগ্রথিত ছিল, গ্রন্থবদ্ধ করার আগেই তিনি ব্যাধির শিকার হ'য়ে পড়েন। সেই সব রচনার সংখ্যা কম নয় এবং সে-গুলো দিয়ে আরো কয়েক খণ্ড 'নজরুল-রচনাবলী' তৈরী হবে আশা করা যায়।

"নজরুল-রচনাবলী"তে এ পর্যন্ত যে-সব গান সংকলিত হয়েছে তাদের সংখ্যা ১৫০০তে পূর্ণ হয়নি। কবির আরও দেড় থেকে দু'হাজার গান কিংবা আরও বেশী গান সংগ্রহের অপেক্ষায় আছে। সে-সব সংগ্রহ করা সম্ভব হ'লে হয়ত ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড নজরুল রচনাবলী তৈরী হ'তে পারে। বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্পাদক নজরুলের শিশু এবং কিশোর সাহিত্যটিকে ভিন্ন খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন। এটা 'বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডে'র পরিকল্পনা ছিল। সে খণ্ডটিও অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা নজরুলের ঐ বিভাগের রচনা বিশেষ মর্যাদার দাবীদার। বাদে এই দাঁড়াচ্ছে সম্পূর্ণ নজরুল ইসলাম এখনও "নজরুল-রচনাবলী"তে আসেনি। নজরুলের মূল্যবান অভিভাষণ, তাঁর চিঠিপত্র, তাঁর কিছু প্রবন্ধ এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত "নজরুল-রচনাবলী"-র অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আর একটা দিক। যতদূর মনে হয় "নজরুল-রচনাবলী" কিছুটা তাড়াহুড়া ক'রে সম্পাদিত। এর কারণও ছিল। নজরুলের বহু গানের মত তাঁর অন্যান্য রচনারও হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রকট হ'য়ে উঠেছিল। নজরুলের অসুস্থতার পরে নজরুল যে পশ্চিম বঙ্গে থাকতেন দীর্ঘ বিশ বছরের মধ্যেও সেখানে তাঁর রচনাবলী প্রকাশের কোন প্রচেষ্টা হয়নি। ১৯৬৪ সালের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানেও সে-চেষ্টা হয়নি। ফলে প্রয়োজন ছিল যেখানে যা পাওয়া যায় তা সংগ্রহ ক'রে গ্রন্থবদ্ধ করা। সমস্ত রচনাকে সামনে রেখে সুপরিকল্পিত উপায়ে সম্পাদনার দ্বারা কবির রচনাকালের ক্রমবিন্যাস অনুসারে স্তরে স্তরে কবির ক্রমপরিণতি দেখানো প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পাদকের দ্বারা সম্ভব হয়নি। সে-জন্যে বর্তমান রচনাবলীতে কিছু কিছু রচনা খণ্ডের ক্রমিক অনুযায়ী আগে পিছে হ'য়ে গেছে। এ-খণ্ডের "কুহেলিকা" উপন্যাসটি যেমন দ্বিতীয় খণ্ডে যাওয়া উচিৎ ছিল। আরও কথা আছে, নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "অগ্নি-বীণা" হ'লেও তার কবিতাগুলি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা নয়। আবার "অগ্নি-বীণা"র প্রকাশিত প্রথম কবিতা 'প্রলয়োল্লাস'-এর প্রকাশকাল ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের মে-তে, ৯নং কবিতা 'শাত্-ইল-আরব'-এর প্রকাশকাল ১৯২০-এর মে-তে, আর ১২নং অর্থাৎ শেষ কবিতা 'মোহররম'-এর প্রকাশকাল ১৯২০-এর সেপ্টেম্বরে। বলা বাহুল্য "অগ্নি-বীণা"-র দ্বিতীয় কবিতার প্রকাশকাল ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী ১৩২৮-এর কার্তিক অর্থাৎ ১৯২১-এর অক্টোবরে। (কবিতাটি কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের মতে ডিসেম্বরে রচিত। 'মোসলেম ভারতে'র অনিয়মিত প্রকাশের জন্য প্রকাশ তারিখ পিছিয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে কবিতাটি ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষের সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে প্রকাশিত হয়। ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষ ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের কোন এক দিন।) ফলে ক্রমিক অনুসারে তাঁর লেখাকে এখানে সাজানো সম্ভব হয়নি। সে-দিক থেকে সম্পাদনায় বিশৃংখলা ঘটে গেছে। সম্পাদক অবশ্য অসামান্য পরিশ্রম ক'রে প্রতিটি খণ্ডের শেষে "গ্রন্থ-পরিচয়ে" কবির রচনাগুলির প্রকাশ কাল, দু'চারটি বাদে, এবং তা কোন পত্রিকায় কখন প্রকাশিত হ'য়েছিল তার সন তারিখ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কোন কোন খণ্ডে কোন কোন কবিতার পাদমূলেও ঐ রচনাটির প্রকাশ তারিখ দিতেও তিনি চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ বোঝা যায় কবির ক্রমিক পরিণতিটা পাঠকের বুঝতে যাতে অসুবিধা না হয় সেটা সম্পাদকের মনে গভীরভাবে জাগ্রত ছিল। এবং বলা বাহুল্য এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব সুসম্পন্ন করার, এই বর্তমানে, তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি। অর্থাৎ "নজরুল-রচনাবলী" তাঁকে দিয়েই পুনরায় সম্পাদনা করিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন। যে সম্পাদনা কেবল নজরুলের গ্রন্থ প্রকাশের কালকে সামনে রেখে সম্পন্ন হবে না, হবে তাঁর কবিতা রচনার কালকে সামনে রেখে। (কেবল প্রকাশের কালকে সামনে রেখেও,

সম্পাদনা করলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। কেননা অনেক সময় বহু আগের রচনা বহু পরে প্রকাশিত হয়েছে।) মনে রাখতে হবে গ্রন্থ-প্রকাশে গরীব নজরুল গৃহিণীপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হননি। কেননা যতবার তাঁর কামনা "শেফালীর মত শুভ্র সুরভি" বিস্তার ক'রে উঠতে চেয়েছে "নির্মম" দারিদ্র্য ততবার কাঠুরিয়ার মত তার "দলবৃন্ত শাখা"কে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করেছে।

আর একটা কথা, কিছুটা ব্যস্তভাবে প্রকাশিত হওয়াতে সংকলনে কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। বিশেষ ক'রে নজরুলের "নতুন চাঁদ" কাব্যটিতে। (অন্য গ্রন্থগুলোতে সে-তুলনায় ভুলের পরিমাণ অনেক কম।) এখানে অতি-সতর্ক-দৃষ্টির কড়া পাহারা না থাকাতে এই প্রমাদ হয়েছে ব'লে মনে হয়। এখানে কয়েকটি প্রমাদ দেখানো গেল:

"নতুন চাঁদ" কবিতার "এদেরি বক্ষে ; ভাঙিবে বাঁধ" পংক্তিটি ছাপা হয়েছে "এদের বক্ষে ভাঙিবে বাঁধ," "মুক্তপক্ষ নির্ভয় এরা উড়ন্ত" ছাপা হয়েছে "মুক্তপক্ষ নির্ভর এরা উড়ন্ত," "হাতের লাটু এদের প্রাণ" ছাপা হয়েছে "হাতের লাটু এদের প্রাণ"; "চির-জনমের প্রিয়া" কবিতার পংক্তি "চির জনমের প্রিয়া মোর! চেয়ে দেখ ঐ নীলাকাশে," ছাপা হ'য়েছে "চির-জনমের প্রিয়া মোর! চেয়ে দেখ নীলাকাশে," ('ঐ' শব্দটা বাদ প'ড়েছে), "এত জোৎস্নায় ঢাকিতে পারেনি তোমার মধুর মায়া," ছাপা হয়েছে "এত জোৎস্নায় ঢাকিতে পারিনি তোমার মধুর মায়া।" ('পারেনি' স্থানে 'পারিনি' হওয়াতে অর্থ অন্য রকম হ'য়ে গেছে), "চোরের মতন চুরি করিয়াছি তব কবরীর ফুল।" ছাপা হয়েছে "চোরের মত চুরি করিয়াছি তব কবরীর ফুল।" ('মতন'-এর স্থানে 'মত' হওয়াতে ছন্দপতন হয়েছে), "মুক্তা হয়েছে, অঞ্জলি দিতে তাই গাঁথি তারে গানে," ছাপা হয়েছে "মুক্তা হয়েছে ; অঞ্জলি দিতে তাই গাঁথি গানে," ('তারে' শব্দটি বাদ পড়াতে ছন্দপতন হয়েছে।); "আমার কবিতা তুমি" কবিতার পংক্তি-"যত রস-ধারা নেমেছে আমার কবিতায় সুরে গানে," ছাপা হয়েছে "যত রসধারা নেমেছে আমার কবিতার সুরে গানে ("কবিতায়" স্থানে "কবিতার" ছাপা হওয়াতে পংক্তিটির অর্থ বিকৃতি ঘটেছে।)। "কল্প-লোকের প্রিয়া আসে না গো ধরণীতে ধরি কায়া।" ছাপা হয়েছে "কল্প-লোকে প্রিয়া আসে না গো ধরণীতে ধরি' কায়া।" "কেঁদে কেঁদে রাতে যদি মোর হাতে লেখনী যায় গো থামি" ছাপা হয়েছে "কেঁদে কেঁদে রাতে যদি মোর হাতের লেখনী যায় গো থামি" ("হাতে" স্থানে "হাতের" হওয়াতে ছন্দ পতন হয়েছে।) "নিরুক্ত" কবিতাটির 'চির-পবিত্রা অমৃতময়ী, বল কোন্ অভিমানে" পংক্তিটি ছাপা হয়েছে "চির-পবিত্রতা অমৃতময়ী, বল কোন্ অভিমানে" ("পবিত্রা"র স্থানে "পবিত্রতা" হওয়াতে ছন্দ-পতন হয়েছে এবং অর্থবিকৃতি ঘটেছে); "আসিবে তুমি কি বেণুকা হইয়া সেদিন অধরে মম" ছাপা হয়েছে "আসিবে তুমি কি বেণুকা লইয়া সেদিন অধরে মম" ("হইয়া" "লইয়া" হওয়াতে পংক্তিটি অর্থহীন হ'য়ে পড়েছে।); "সে যে আমি" কবিতাটির "ভুত নিয়ে একি অদ্ভুত খেলা, কে সে হানিয়াছে হেলা?" ছাপা হয়েছে "ভুত নিয়ে একি অদ্ভুত খেলা, কে হানিয়াছে হেলা" ('কে হানিয়াছে'র মাঝখানে "সে" শব্দটি বাদ যাওয়াতে ছন্দপতন হয়েছে)। "তোমার প্রেমের রাখী কে নিল না, কে গো সেই গরবিনী?" ছাপা হয়েছে"—তোমার প্রেমের রাখী কে নিল না কে সেই গরবিনী?" ("গো" শব্দটি বাদ যাওয়াতে ছন্দপতন হয়েছে), "ততই লুকাতে চাহি ; আজিও যে আমি অপূর্ণা জানিয়া," পংক্তিটি হয়েছে "ততই লুকাইতে চাহি ; আজিও যে আমি অপূর্ণা

জানিয়া" ("লুকাতে" স্থানে "লুকাইতে" হওয়াতে ছন্দপতন হয়েছে); "অভেদম" কবিতাটির "কেবলই রূপের আচরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কায়া" পংক্তিটি ছাপা হয়েছে "কেবলই রূপের আচরণে যিনি ঢাকিয়াছেন নিজ কায়া" ('ঢাকিছেন' স্থানে 'ঢাকিয়াছেন' ছাপা হওয়াতে ছন্দ পতন হ'য়েছে); "কেন জাগাইলি তোরা?" কবিতাটির "দিগ দিগন্তে প্রসারিয়া শাখা বাঁধেনি সেথায় নীড়?" ছাপা হয়েছে "দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত শাখা? বাঁধেনি সেথায় নীড়." ('প্রসারিয়া'র স্থানে 'প্রসারিত' ছাপা হয়েছে। জিজ্ঞাসা চিহ্নটি মাঝখানে হবে না শেষে হবে নইলে বাক্য অর্থহীন হয়।), "আমারে খুঁজিতে সহসা সে কোন শক্তিরে পরশিনু" পংক্তিটি "আমারে খুঁজিতে সহসা কোন্ শক্তিরে পরশিনু" ছাপা হয়েছে ('সে' শব্দটি বাদ যাওয়াতে ছন্দপতন হয়েছে।); "দুর্বার যৌবন" কবিতাটির ৭ম পংক্তির "বাঁধিল" হয়েছে "বাঁধিলে," "দেখে না তাহার প্রাণ-তরঙ্গে ডুবিল তরণী কার" পংক্তিটির "তাহার" স্থানে "তার" ছাপা হ'য়েছে, সুতরাং একটি মাত্রার পতন ঘটেছে; "শান্ত হইয়া দুয়ারে রহিবে—শুনিয়াছ কভু কেউ" পংক্তিটি "কেউ" স্থানে "কে" হয়েছে (এটা অবশ্য পাঠক বুঝে নিতে পারবেন); "খোলো অর্গল পাষাণের, দুর্গা রক্ষক অনর্গল" পংক্তিটির "খোলো" স্থানে মুদ্রণ প্রমাদে "খোলে" ছাপান হয়েছে। "আর কতদিন" কবিতাটির "শরাব পিয়ায়ে জাগায়ে রাখিবে, প্রীতম্ আসিবে নাকি" পংক্তিটি হ'য়েছে "শরাব প্রিয়ারে জাগায়ে রাখিবে, প্রীতম্ আসিবে নাকি?" ("পিয়ারে" স্থানে "প্রিয়ারে" হওয়াতে ছন্দ ও অর্থের পতন হ'য়েছে।) "শিরাজী পিয়ায়ে শিরায় শিরায় কেবলই জাগাও নেশা" হ'য়েছে "শিরাজী পিয়ায়ে শিরায় শিরায় কেবলই জাগাও নেশা" (পিয়ারে" স্থানে "পিয়ারে" হওয়াতে অর্থ বিপত্তি ঘটেছে), "মনে হয় তাঁর স্বর্ণ-জ্যোতিঃ দুলে ওঠে কুতুহলে" স্থানে "মনে হয় তাঁর স্বর্ণ-জ্যোতিঃ দুলে উঠে কৌতুহলে।" ("কুতুহলে" স্থানে "কৌতুহল" হওয়াতে একমাত্রা বেড়ে গেছে); "ফিরদৌস আলা হ'তে যেন লালা ফুলের সুরভি আসে" পংক্তিটি হ'য়েছে "ফিরদৌস-আলা হ'তে লালা ফুলের সুরভি আসে" ("যেন' শব্দটি বাদ যাওয়ায় ছন্দপতন হ'য়েছে।); "কে যেন হাসিয়া ছুঁইয়া আমারে পলায় অলখ-পথে।" পংক্তিটি হ'য়েছে "কেন যেন হাসিয়া ছুঁইয়া আমারে পলায় অলখ-পথে।" ("কে" স্থানে "কেন" হওয়াতে ছন্দ ও অর্থের পতন ঘটেছে।); "ওঠ রে চাষী" কবিতাটির "তেমনি আকাশ ফর্সা আছে ভরসা শুধু নাই" পংক্তিটি হ'য়েছে "তেমনি আকাশ ফর্সা ভরসা শুধু নাই" ("আছে" শব্দটি বাদ পড়াতে ছন্দপাত হয়েছে); "মোবারকবাদ" কবিতাটির "তোমাদের মহফিলে আমি সেই বুলবুলেরে আজ চাই" পংক্তিটি "তোমাদের মহফিলে আমি সেই বুলবুলেরে চাই" ছাপা হয়েছে ("আজ" শব্দটি বাদ পড়াতে ছন্দপতন হ'য়েছে)। এ-ছাড়া "শিখা" কবিতাটির "কোথা সে অনাগত সাগ্নিক পুরোধা" হবে "কোথা সেই অনাগত সাগ্নিক পুরোধা," "হইয়াছে ভারতে জনগণ পতি" হবে "হইয়াছে ভারতের জনগণপতি?" "নয়ন ঢাকিয়া। যৌবনে এ লাঞ্ছনা" হবে "নয়ন ঢাকিয়া। যৌবনের এ লাঞ্ছনা", "যেন, নাহি বাঁচে আর। সমাধি হইতে" হবে "যেন নাহি বাঁচি আর। সমাধি হইতে।" "আজাদ" কবিতাটির "কোথা সে 'আরিফ', কোথায় সে ইমাম, কোথা সে শক্তিধর?" হবে "কোথা সে 'আরিফ', কোথা সে ইমাম, কোথা সে শক্তিধর?" ('কোথায়' হবে না।)

অবশ্যই এ-প্রমাদ ছান্দসিক কবি আবদুল কাদিরের নয়, এ-প্রমাদ প্রুফ-সংশোধক অথবা মুদ্রাণালয়ের কর্মচারীদের। তাঁরা যথেষ্ট সাবধান ছিলেন না। এখানে বলা প্রয়োজন মুদ্রণ সংশোধনের ব্যাপারে সম্পাদক আবদুল কাদিরের উপর এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করলে চলবে না। তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়েছে।

চোখ পূর্বের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হারিয়েছে। তাই তাঁর সম্পাদনার ও গ্রন্থ সংশোধনের কাজে একজন সুতীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সহযোগীর প্রয়োজন। (প্রসংগত তিনি আমাকে বলেছিলেন চতুর্থ খণ্ডের প্রথম দিককার কয়েকটি ফর্মা তাঁকে দেখিয়ে নেওয়া হয়নি।)

নজরুলের যে-কোন রচনা মুদ্রণে আমাদের সাধ্যমত সতর্ক হ'তে হবে। কেননা আমাদের ত্রুটির প্রমাদ কবির উপর পড়তে পারে। যা অনেক সময় হয়েছে। কবির কাব্যের মুদ্রণ ত্রুটি সমালোচকের চোখে কবির ছন্দত্রুটি বলে গণ্য হয়েছে। এর একটা বাস্তব প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম। আমাদের "নজরুল একাডেমী পত্রিকা"র একজন পণ্ডিত একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: নজরুল মাঝে মাঝে ছন্দে ভুল করেন। যেমন: "স্বরাজীরা ভাবে নারাজী, নারাজীরা ভাবে তাহাদের অঙ্কুশি।" মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ছ'মাত্রার এই কবিতা পংক্তিটির দ্বিতীয় পর্বে একটি অতিরিক্ত মাত্রা বেড়ে গেছে। বস্তুতঃ এই ত্রুটি কবির নয় এ-প্রমাদ ছাপাখানার ভূতের। কবির আসল লেখার পংক্তিটি ছিল: "স্বরাজীরা ভাবে নারাজী, নারাজী ভাবে তাহাদের অঙ্কুশি।" সুতরাং মাত্রা পতনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। অতএব আমাদের যেন শ্যেন দৃষ্টি থাকে যাতে আমাদের ভুল কবির ভুলে পরিণত না হয়। নজরুলের শেষ পর্যায়ের দু'চারটি কবিতায় ছন্দ-পতন হয়ত দেখা যায়। কিন্তু সে তাঁর খসড়া পর্যায়ের লেখা। যা তিনি দ্বিতীয় বার দেখেন নি। "নজরুল-রচনাবলী"র চতুর্থ খণ্ডের কোন কোন কাব্যগ্রন্থের কোন কোন কাব্যপংক্তিকে ছন্দ-দুর্বল মনে হয়। মনে রাখা দরকার এর কোন গ্রন্থ কবির চোখের সামনে মুদ্রিত হয় নি। কবি এর লেখাগুলিকে শেষদেখা দেখে দিতে পারেননি। অনেকগুলি প্রায় খসড়ার আকারে ছিল, যেমন 'মরুভাস্কর'। কবির অনুপস্থিতিতে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি ছাপানো হয়—সুতরাং এতে কোথাও ছন্দপাত হ'লে সে-ভাবেই হয়েছে। কবির দ্বারা পরিমার্জিত হয়নি। "শেষ সওগাত"-এর এমনি একটি কবিতার ছন্দ সম্পর্কে কবি আবদুল কাদির গ্রন্থ-পরিচয়ে এই বক্তব্য রেখেছেন:

> 'ছন্দিতা' গীতি-গুচ্ছের প্রায় সবগুলি গান সংস্কৃত বৃত্তছন্দে বিরচিত। তাহাতে 'দীপক মালা' ১৬-মাত্রা; তাহার আস্থায়ী—
>
> দীপক-মালা   গাঁথ গাঁথ গাঁথ   সই।
> মাধব আসে   পারিজাত কই॥
>
> সংস্কৃত রীতি অনুসারে ইহার প্রথম পংক্তিতে হয় ৮+১১ মাত্রা, কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিতে ঠিক ৮+৮ মাত্রা। ইহার প্রকৃত পাঠ হইবে এ-রূপ—
>
> দীপক-মালা   গাঁথ গাঁথ সই।
> মাধব আসে   পারিজাত কই
>
> এখানে পংক্তিতে ৮+৮ মাত্রার দু'টি পদ।

এখানে স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে, মুদ্রিত কবিতার "গাঁথ গাঁথ গাঁথ সই"-এ তিনটি মাত্রা বেড়েছে অতিরিক্ত একটি 'গাঁথ" শব্দ প্রয়োগে। আমার ধারণা এটি একটি প্রসিদ্ধ মুদ্রণ প্রমাদ। কারণ

কবির কবিতাটির উপর মাত্রা সংখ্যা "১৬ মাত্রা" লেখা আছে। কবিতাটির শিরোনামটা এমনি :

"দীপক মালা —১৬ মাত্রা (তা—নানা—তা—তা, তা না তা না তা)"

যে-কবি মাত্রা সম্বন্ধে এতদূর সজাগ তাঁর মাত্রা পতন হবে এমন মনে করা অনুচিত। অথবা "গায়কী"র নাটকীয়তার জন্য একটি অতিরিক্ত "গাঁথ" শব্দ ব্যবহার হয়ত বা হ'তে পারে। কিন্তু তা গাইবার সুবিধার জন্যে—মাত্রার পতন ঘটিয়ে নয়। এই অতিরিক্ত শব্দ মুদ্রণ—মুদ্রণ প্রমাদ ছাড়া আর কিছু নয় ব'লে আমি মনে করি। বলা বাহুল্য রস সঞ্চারের জন্যে গানে শব্দের উচ্চারণ দু'বার করা যায় কিন্তু সেটা কবিতার জন্যে লেখা যায় না। সম্পাদক এবং ছান্দসিক আবদুল কাদির এখানে ব্যাখ্যা দিয়ে এবং মাত্রা বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের উপকার করেছেন এবং পারদর্শী সম্পাদকের উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

সম্পাদক আরও একটি অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করেছেন। তা হ'ল কবির কবিতার পাঠান্তর দেখিয়ে দেওয়া। কবি সম্বন্ধে একটা সাধারণ কথার প্রচলন আছে। নজরুল একবার যা লিখতেন সেটাই তাঁর শেষ লেখা। তিনি তার দিকে আর ফিরেও চাইতেন না। ভক্তরা কবির অসাধারণ শক্তিকে প্রমাণ করার জন্য এটা গৌরবের কথা ব'লে প্রচার করতেন। কিন্তু ছিদ্রান্বেষীরা ওটাকেই কবিকে ঘায়েল করার একটা অস্ত্র হিসেবে ধরে নেন। এবং "নজরুলের কাব্যে পরিমার্জনা"র চিহ্ন নেই ব'লে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। কথাটা দু'তরফ থেকেই আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ অথবা জীবনানন্দ দাশের কিছু কবিতা দেখলে মনে হয় যে তাঁরা একটা কবিতাকে গ'ড়ে তুলতে বিস্তর ঘসা মাজা করেছেন। হয়ত গোটা কবিতা লিখে কাটতে কাটতে তার একটা মাত্র পংক্তিকে অথবা স্তবককে নির্বাচন করছেন অথবা একই রকম দশটা পংক্তি থেকে একটা পংক্তিকে বেছে নিচ্ছেন। কবি যেখানে শিল্পী সেখানে রেখাকে অকম্পিত রাখার জন্য এ-প্রয়োজন পড়ে—ঠিক মনোমত শব্দটি অথবা পংক্তিটি ধরা না পড়া পর্যন্ত এই অপেক্ষার ও পরিশ্রমের কাজ করতে হয়। শেকস্‌পীয়রও এমন কাজ করেছেন—এ-ব্যাপারে সবচেয়ে খ্যাতি ফ্লুবেয়ারের।
কিন্তু বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রথম পাণ্ডুলিপিই শেষ পর্যন্ত একটা মনুষ্যাকৃতি অথবা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী হয়ে ওঠেনি। তাঁরও কোনো কোনো লেখা একটানে নির্ভুলভাবে বেরিয়ে এসেছে। নজরুল ইসলাম পরিবর্তন অথবা পরিমার্জনার ধার ধারতেন না—এই বাক্য অসত্য। আমার "নজরুল-সাহিত্য বিচার" গ্রন্থে এ-কথার উল্লেখ করেছি—প্রমাণ সহ। আবদুল কাদির সাহেবও এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দু'একটি উদাহরণ। গ্রন্থ-পরিচয়ের এক স্থানে তিনি বলছেন :

> ১. 'আগত' ১৩৪৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ১ম বর্ষের ৭ম সংখ্যা 'রূপায়ণ' পত্রিকায় "আর জিজ্ঞাসা করিব না কোন কথা" শিরোনামে মুদ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই সংখ্যার 'রূপায়ণ' সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও বাজারে বাহির হয় নাই। অতঃপর কবিতাটি ১৩৪৮ সালের 'সওগাত' পত্রিকার 'সাগরের ঢেউ' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সওগাতে' মুদ্রিত কবিতাটিতে ২৪ সংখ্যক পংক্তির পরে আছে এই শ্লোকটি :
>
> মোর কবিতার কথাগুলি তোমার হৃদয়াকাশে
> উড়িতে যখন চায়, কেন সেথা মেঘ ঘনাইয়া আসে?

এই শ্লোকটি "শেষ সওগাত" কাব্যে নাই। সেখানে কবিতাটির শেষ ১০টি পংক্তির মুদ্রণেও বিপর্যয় ঘটিয়াছে,—শেষের ৪টি পংক্তি তাহার পূর্ববর্তী ৬টি পংক্তির উপরে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উক্ত ১০টি পংক্তি 'সওগাত'-এ প্রকাশিত 'সাগরের ঢেউ' কবিতাটিতে নাই। সে স্থলে আছে নিম্নোদ্ধৃত ১০টি পংক্তি—

প্রেম দিয়ে এক পূর্ণ পরম প্রেমময়ে পাওয়া যায়:
মজনু পায় না লায়লীরে প্রেম দিয়ে হায় দুনিয়ায়।
প্রেম যে কি চায়, প্রেমিকও জানে না, বিশ্বে জানে না কেউ;
ঢেউয়ে মিশে ঢেউ শান্ত হয় না, কেন ওঠে আরো ঢেউ?

দেহ চায় দেহ, মন চায় মন, আত্মা আত্মা চায়;
প্রেম তবু বলে কাঁদিয়া নিত্য—কিছু পাইল না হায়।
বিরহের মধু মঞ্জরী তুমি প্রিয়া,
নহ মিলনের মধুমালা;
কা'বার তীর্থ-পথে কেন এত মরু-তৃষ্ণার জ্বালা?
কে বলিতে পারে কেন অনুরাগ 'লোহিত সাগর'-তীরে
তৃষ্ণা-কাতর গোবী-সাহারার মরুভূমি আছে ঘিরে?

উপরন্তু 'সাগরের ঢেউ' কবিতাটিতে অনেক পংক্তির পদ পরিবর্তিত।

একটা কথা রহস্যময়। উদ্ধৃতিতে সম্পাদককে 'মুদ্রণেও বিপর্যয় ঘটিয়াছে' লিখতে দেখছি। 'বিপর্যয়' বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন? "শেষ সওগাত" কবির অনুপস্থিতিতে প্রকাশিত হয়েছিল—পরিবর্তনটা তা হ'লে কি কবির হাতে হয়নি? "শেষ সওগাত" সম্পাদনা করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। এই পরিবর্তনে তাঁর কি কোন হাত আছে? অথবা তিনি কবির হস্তলিখিত মূল পাণ্ডুলিপি থেকে "শেষ সওগাতে" কবিতাটি তুলেছেন—যার জন্যে এই ওলটপালট। নজরুল ইসলাম অনেক সময় তাঁর লেখার প্রুফ দেখতেন এবং প্রুফেও পরিবর্তন করতেন ব'লে মনে হয়। আমাদের মত অনেকের, যাঁদের মুদ্রণালয়ের সংগে সম্পর্ক আছে, তাঁরা প্রুফের উপর রচনা পরিবর্তন করেন অনেক সময় প্রুফ-সংশোধনে আমূল পরিবর্তন ঘটান। সে-জন্য তাঁর পাণ্ডুলিপির সংগে মুদ্রিত কবিতার বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই চতুর্থ খণ্ডে তার একটা বাস্তব প্রমাণ আছে। 'ঝড়' কাব্যের ৪নং কবিতা 'কর্ষ্যভাষা'র পাঠ এই:

কর্ষ্যভাষা কইতে নারি শুর্দ্ধ কথা ভিন্ন
নেড়ার আমি নিন্ন বলি (কারণ) ছেঁড়ার বলি ছিন্ন॥
গোঁসাইকে কই গোর্ষামী, আই মশাইকে মোর্ষামী।
বানকে বলি বন্যা, আর কানকে কন্যা কই আমি॥
চাষার আমি চার্ষ বলি, আশার বলি অর্ষ।
কোটকে বলি কোর্ট, আর নাসার বলি নস্য॥

শশারে কই শিষা আমি, ভাষারে কই ভীষ্ম।
পিসিরে কই পিষ্টক আর মাসীরে মাছিষ্যা॥
পুকুরকে কই পুষ্করিণী, কুকুরকে কই কুকু।
বদনকে কই বদ্না, আর গাড়ুকে গুড়ুকু॥
চাঁড়ালকে কই চণ্ডাল, তাই আড়ালকে অণ্ডাল।
শালারে কই শলাকা, আর কানায় বলি কঙ্কাল॥
শ্বশুরকে কই শ্মশ্রু, আর দাদাকে কই দক্র।
বাবারে কই বব্রু, আর কাদারে কই কক্র॥
আরো অনেক বাত্রা আমি, বুঝলে তারা ঝিণ্টু।
ভেবেছ সব শিখে নেবে বলছি নে আর কিন্তু॥

কবিতাটির একটি পাণ্ডুলিপি এখানে ছাপা হ'য়েছে তার পাঠ মুদ্রিত কবিতাটি থেকে অনেকখানি পৃথক। এখানে তারও উদ্ধৃতি দিলাম :

হাসির গান

আমি গেরামা ভাষা কইতে নারি সংস্কৃত ভিন্ন।
নেড়ায় বলি নিন্ন, কারণ ছেঁড়ায় বলি ছিন্ন॥
গোঁসাইকে কই গোস্বামী, তাই মশাইকে কই মোস্থামী,
কানকে বলি কন্যা, কারণ বানকে বন্যা কই আমি।
চাষায় চষ্ণ বলি ব'লে আশায় বলি অষ্ণ
হাসায় বলি হিস্‌সো আমি ভাষায় বলি ভীষ্ম॥
টাকায় বলি টঙ্কা আমি কাকায় বলি কঙ্কা তাই।
আখ্ বলতে ইক্ষু বলি টাক্‌কে বলি টিক্ষু ভাই।
বসারে কই বিষ্ণু আমি, শশারে কই শিষ্য,
পিসিরে কই পিষ্টক আর মাসীরে মাছিষ্যা॥
পুকুরকে কই পুষ্করিণী, কুকুরকে কই কুকু
বদনকে কই বদ্না আর গাড়ুকে গুড়ুকু॥
চাঁড়ালকে কই চণ্ডাল আর আড়ালকে কই অণ্ডাল,
শালায় বলি শলাকা, কালায় বলি কঙ্কাল।
মুখকে বলি মুর্খ আমি, বোকায় বলি বোর্কা,
ঘাড়কে বলি হড়কো আমি চোখকে বলি চক্কা॥
দাদারে কই দক্র আমি বাবারে কই বব্রু,
রামকে বলি রম্ভা আমি, লোমকে বলি লম্বু।
আরো অনেক বাত্রা আমি বুঝলে তারা ঝিণ্টু?
ভেবেছ সব শিখে নেবে বলছিনে আর কিন্তু॥

এটাই সম্ভবতঃ প্রথম খসড়া ছিল। তারপর প্রেসে যাওয়ার আগে তার চেহারার যে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল, কবি যে তাকে ওলটপালট ক'রে মুদ্রিত কবিতার রূপ দিয়েছিলেন তাতে আর সন্দেহ নেই। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে নজরুলও তাঁর লেখার খসড়া করতেন এবং অনেক সময় মাজাঘষাও করতেন। চতুর্থ খণ্ডে যে-সব কাব্য গ্রন্থ ছাপা হয়েছে তাঁর উপস্থিতিতে সে-সব ছাপা হ'লে তার দুর্বল পংক্তিগুলোকে তিনি নিশ্চয় সবল ক'রে তুলতেন। সে-রকম সবল ক'রে তোলার শক্তির তাঁর অভাব ছিল না।

এর প্রমাণ নজরুলের "রুবাইয়াত-ই-ওমর-খৈয়াম"। 'রুবাই'গুলো "মোহাম্মদী"তে যে-ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল গ্রন্থবদ্ধ 'রুবাই'গুলোর অনেকগুলি তেমন আর নেই। প্রথম রুবাইটিও সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটা আমি আমার প্রবন্ধ "ওমর খৈয়াম ও নজরুল ইসলাম" প্রবন্ধে দেখিয়েছি, সম্পাদক তাঁর "অনুবাদক নজরুল" প্রবন্ধেও এই খণ্ডের "গ্রন্থ পরিচয়ে" তা বলেছেন।

এই সংগে বলি অনেকের মতে নজরুল ইসলাম ১৯৪০/৪১ সালের দিকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই তাঁর তখনকার লেখা কবিতায় ছন্দপতন হয়েছে এবং তাঁর চিন্তায় অসুস্থতার ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এঁরা নজরুলের আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণাকে তাঁর অসুস্থতার লক্ষণ ব'লে তাঁর তখনকার চিন্তা ও চেতনাকে গৌণ ব'লে চিহ্নিত করতে চান। আসলে এটাও প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণকে প্রমাণ করার একটা চেষ্টা মাত্র। কবি তাঁর অসুস্থতার পূর্বে আত্মমগ্ন হয়েছিলেন, আধ্যাত্মিক চেতনাশ্রয়ী হ'য়ে পড়েছিলেন। তাঁর রচনার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল—বলা যায় না। ঐ সময়কার কিছু রচনা যা এই চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন সজাগ সমাজসচেতন লেখকের রচনা ব'লে আমার ধারণা। সম্পাদক যে ভূমিকায় বলেছেন :

> পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যাঁরা পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য লাভের আনন্দ সংবাদ দিয়েছেন, সামাজিক ঐক্য ও আর্ত-মানবতার প্রতি সুগভীর সহানুভূতি তাঁদের অমূল্য শিক্ষার এক বড় অঙ্গ। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে স্বভাবতঃই তাঁর সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও প্রেম বিহ্বলতা পেয়েছে প্রগাঢ়তর রূপ, কিন্তু উদাসীন শিল্পীর সেই প্রসন্ন ধ্যানের আসনে ব'সেই নিপীড়িত মানবতার জন্য তাঁর বেদনাবোধের প্রকাশ হয়েছে পূর্বের চেয়ে আরও তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ। নজরুল রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ড এই বৈশিষ্ট্যের দাবীদার।

আবদুল কাদির সাহেবের এই কথার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। একেবারে মেদহীন অভিজ্ঞতাকে যথোপযুক্ত শব্দ ও উপমা ও চিত্রকল্পের সাহায্যে নজরুল তাঁর এ-যুগের কবিতায় তুলে ধরেছেন। মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা, বাঙলার মুসলমানদের অধঃপতনের জন্যে তাঁর দরদী মনের তীব্র ব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিক জীবনের নিবিড় উপলব্ধি তাঁর এই যুগের কবিতাকে নতুন বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

সম্পাদক আবদুল কাদির সাহেবের আর একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এই চতুর্থ খণ্ডে 'রাঙাজবা' (নামটি প্রকাশকের দেওয়া) ও 'দেবীস্তুতি' নামে দুটি গ্রন্থ ছাপা হয়েছে। 'রাঙাজবা' গীতিকাব্য গ্রন্থ এবং 'দেবীস্তুতি' তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। 'দেবীস্তুতি' হিন্দু দেবী কালির মহাকালি, মহালক্ষী, মহাসরস্বতী, রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী ও ভ্রামরী অবতার রূপের ব্যাখ্যা।

গ্রামোফোন কোম্পানীর সংগীত রচয়িতা ও ট্রেনার হিসাবে এবং শেষের দিকে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সংগীত রচয়িতা হিসাবে নজরুলকে এক সময় কোম্পানীর ব্যবসার খাতিরে নানা ধর্মের ও সম্প্রদায়ের লোকের মনোপযোগী গান লিখতে হয়েছে। এ-গুলো রচনার পিছনে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রশ্ন জড়িত ছিল কি না সেটা অনেকের জিজ্ঞাসার কারণ। বিশেষ ক'রে নজরুল রচিত শ্যামা সংগীত, শিব সংগীত ও বৈষ্ণবগীতি বিখ্যাত ব'লে বিবেচিত হয়েছে। কারও কারও ধারণা অনুভূতিতে আশ্রয় না নিলে এমন চিত্তাকর্ষক গান লেখা কেমন ক'রে সম্ভব? বলা বাহুল্য নজরুল যেমন জাগরণের গান, বিপ্লবের গান, স্বদেশী গান, প্রেমের গান, প্রকৃতির গান, লেখার চরম সাফল্য অর্জন করেছিলেন তেমনি একদিকে ইসলামী সংগীত, শ্যামা সংগীত, শিব সংগীত ও বৈষ্ণব গীতি ইত্যাদি ধর্মীয় গীতি ও অন্যদিকে ঝুমুর, ভাটিয়ালী প্রভৃতি লোকগীতি রচনায় অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় ও সুর সংযোজনায় অপূর্ব শৈল্পিক সিদ্ধি দেখে বোঝা কঠিন হয় যে কোন্‌টা তাঁর বিশ্বাসের অন্তস্থল থেকে উদ্‌গত আর কোন্‌টা নয়, কোন্‌টা আসল ও কোন্‌টা নকল। বিশেষ ক'রে তাঁর শ্যামা বিষয়ক গানগুলি কাব্য হিসাবে এমন উচ্চাঙ্গের যে মনে না করা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে ওঠে যে তিনি শ্যামা ভক্ত নন।

পাঠকের মনে এই জিজ্ঞাসা জাগার কারণে কোন কোন ঘোর শরীয়তপন্থী মুসলমান যেমন নজরুলের মুসলমানত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তেমনি একদল তান্ত্রিক হিন্দু তাঁকে 'মাতৃসাধক' ব'লে আখ্যায়িত করেন।

আবদুল কাদির সাহেব ভূমিকাতে লিখছেন:

> নজরুলের 'দেবীস্তুতি' নামক রচনাটির রূপকাশ্রিত ভাবতত্ত্ব ব্যাখ্যাচ্ছলে তার 'ভূমিকা'য় অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন: 'নজরুলের আসল পরিচয়: কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শাক্ত।''

আবদুল কাদির সাহেব এই মতের প্রতিবাদ ক'রে বলেছেন:

> এ-প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যক 'জয়তী' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমি লিখেছিলাম: 'নজরুল ইসলাম বাঙলার মুসলিম রিনেসাঁসের প্রথম রূপকারই শুধু নহেন, কাব্যচর্চায় ইসলামের নিয়ম কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া neo paganism-এর সাহায্য গ্রহণেও অগ্রণী।'—আমার সেই লেখাটি প'ড়ে নজরুল ইসলাম দৃঢ় স্বরে মন্তব্য করেন যে, তাঁর কবিতায় ও গানে বাহ্যত: neo-paganism বলে যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হ'চ্ছে: তা প্রকৃতপক্ষে pseudo paganism।

এই বক্তব্য রাখার পর আবদুল কাদির সাহেব বলছেন:

> নজরুলের কোন কোন রচনায় বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ ও শৈবমূলক শক্তি আরাধনা দেখে' যাঁরা তাঁকে মূল কথায় প্রতীক-পূজারী বলতে চান, তাঁদের কাছে কবির বক্তব্য যে, তিনি কখনই প্যাগান বা নিও প্যাগান নন, তিনি কখনও কখনও কাব্যবিষয়ের অনুসরণে ও অন্তরের

অনুপ্রাণিত ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনে পরেছেন pseudo pagan-এর (নকল প্যাগানের) সাময়িক কবি বেশ।

এই বিষয়টি নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে স্পষ্ট মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় একজন হিন্দু লেখক। কিন্তু তাঁরও মত কিছুটা আবদুল কাদির সাহেবের কাছাকাছি। এ-ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করলাম :

> কাজী নজরুল ইসলামকে ঈশ্বর প্রেরিত বা তান্ত্রিক সাধকের আশীর্বাদ-পূত কবি বা সাধক ব'লে প্রচার করবার একটা ঝোঁক দেশের এক শ্রেণীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ১৩৭৭ সালের (ইং ১৯৭০) নজরুল-সংখ্যা "কথা সাহিত্য" পত্রিকার ১২২৫ পৃষ্ঠায় "তারাক্ষ্যাপা নজরুল" নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীসমীরকুমার ঘোষ মহাশয় লিখেছেন :—"তারাপীঠের তারা মায়ের আশীর্বাদে এক মুসলমান কাজী পরিবারে আত্মভোলা সন্ন্যাসী মাতৃসাধক নজরুলের জন্ম হয়।" এ তথ্য ঘোষ মহাশয় কোথায় পেলেন? আমরা নজরুলের পুরাতন বন্ধুরা যতদূর জানি, চুরুলিয়ার খানদানী কাজী পরিবার ধর্ম বিষয়ে পুরাতনকালে এবং একালেও অত্যন্ত গোঁড়া এবং বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন। ভাবেভোলা নজরুলের ঐ পরিবারে জন্ম হয়েছিল এবং নির্যাতনের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। সেইজন্যই তাঁকে তের বছর বয়সেই (১৯১২) গৃহছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়া হ'তে হ'য়েছিল। এমন কোন তথ্যই নেই যে তিনি বা তাঁর মাতৃদেবী কোন সময়ে তারাপীঠে গিয়েছিলেন।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে :

> কবির মনোজগত স্ফটিকের মত স্বচ্ছ এবং নিষ্কলঙ্ক দর্পণের মত। তাই বালককাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত যখনই যে রাস্তায় মোড় ঘুরে গেছেন তাঁর রস গ্রহণ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল ব'লেই তিনি মুসলমানের সন্তান হ'য়েও উদার মন নিয়ে নানা ভাবদর্শন প্রভৃতি অতলান্তিকের তলে ডুব দিতে পারতেন। তাই ইসলামী সাধনা থেকে বৈষ্ণব, সহজিয়া, সুফী ও তান্ত্রিক সাধনার ভাবমগ্ন হ'য়ে তার সুষ্ঠু রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। তাঁর এই শক্তিতে কোন অলৌকিক হিন্দু-সাধকের কোন আশীর্বাদের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া ছিল না। এর কোন তথ্য নেই। কষ্ট কল্পনা দ্বারা প্রমাণ ক'রে কবির জীবনকে লোকসমাজে ঘোলাটে ক'রে তোলা উচিত নয়।

যুক্তিটা পুরোপুরি আবদুল কাদির সাহেবের বক্তব্যের সমার্থক নয়। এবং একটু পরে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ঐ লেখার যে উক্তি করেছেন সেটা সত্য হ'লে আবদুল কাদির সাহেব ও প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যও চিড় খায়। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন জীবন পরিক্রমার কমরেড মুজফ্ফর আহমদের প্রেরণায় সাম্যবাদী হ'লেও পরবর্তী কালে তিনি "ভক্তিপথের" সাধক হ'য়ে ওঠেন। তিনি বলছেন :

> মুক্তি—আন্দোলনের বন্ধুরা প্রায় সকলেই স্বল্প ও দীর্ঘদিন কারাগারে আবদ্ধ হ'য়ে থাকায় কিন্তু ভক্তিপথের বন্ধুরা তাকে পেয়ে বসেন। এই সময় বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য, তাঁর

যেজ ছেলে বুলবুলের মৃত্যুতে নজরুল শোকার্ত হ'য়ে শান্তির পথ খুঁজতে থাকেন। তখন তাঁর ভক্তিমার্গের বন্ধু কালিপদ গুহরায় (যোগীরাজ) ও অত্যুৎসাহী বিপ্লবী ও যোগবাদী কবি বরদেন্দু দাশগুপ্ত তাঁকে এই পথে শান্তি সন্ধানের জন্য প্ররোচনা দিয়ে যোগসাধনার পথে টেনে আনেন। বিপাকে পড়েই নজরুল যোগসাধনার পথে গিয়েছিলেন। কিন্তু সাধনা তিনি নিষ্ঠার ও আন্তরিকতার সঙ্গে করেছিলেন, এটা অবিসংবাদিত সত্য তথ্য।

এই যোগসাধনা paganism-এর ব্যাপার কি না। Paganism শব্দার্থে প্রকৃতিবাদ অর্থাৎ এক কথায় প্রকৃতি উপাসনা। অভিধান-এর অর্থ নিকৃষ্ট ধর্ম বা ধর্মাচারণ বা অ-দার্শনিক প্রকৃতি উপাসনা। আবদুল কাদির সাহেব paganism অর্থে পৌত্তলিকতা বা প্রতীক-পূজা বুঝিয়েছেন। এবং তিনি বলছেন যে তিনি যখন লেখেন যে নজরুল নব্য প্রতীকবাদের উদ্বোধক তখন নজরুল বলেন যে তাঁর কাব্যে যে প্রতীক দেখা যায়—তা নব্য প্রতীকবাদ নয় তা নকল প্রতীকবাদ।
আমাদের প্রথমে দেখতে হবে যে নজরুল প্রতীক পূজা বা পুতুল পূজাকে সমর্থন করছেন কি না?
"দেবীস্তুতি"তে ব্রহ্মশক্তির ব্যাখ্যায় আমরা দেখছি নজরুল পুতুল পূজার সমর্থক নন। অথবা ঐ ধর্মশাস্ত্রই বলছে সে পুতুল পূজার সমর্থক নয়। [দেবী-স্তুতির ভূমিকায় শ্রীনিতাই ঘটক সংকলকের ভূমিকায় লিখেছেন—"১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে আমার ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরোধে কবি 'দেবীস্তুতি' লেখেন।" (ঐকান্তিক আগ্রহ তা হ'লে নজরুলের ছিল না?)] মহালক্ষ্মী পরিচ্ছেদে নজরুল ব্যাখ্যায় বলছেন:

> তোমরা মাতার ঐশ্বর্য দিয়ে যে ষড়ৈশ্বর্যময়ী শ্রীদুর্গার বছর বছর পূজার অভিনয় কর। তিনি ভিখারিণী হ'য়ে দ্বারে দ্বারে তোমাদের জন্য শক্তি ভিক্ষা, কল্যাণ কামনা ক'রে বেড়াচ্ছেন। তাঁরই পূজা মণ্ডপে নিরশক্তি আসেন ভিখারী-ভিখারিণীর রূপে। তোমরা মাটির প্রতিমা পূজা কর। তাই প্রাণের প্রতিমাকে দেখতে পাও না, মাকে পাও না।

[উদ্ধৃত অংশ নজরুল রচনাবলীর বর্তমান চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত 'দেবীস্তুতি' থেকে বাদ যাওয়ার কারণ বুঝতে পারলাম না। আবদুল কাদির সাহেবের কাছে যে বই আছে তা কি অসম্পূর্ণ?]
উপরের উদ্ধৃতির "তোমরা মাটির প্রতিমা পূজা কর, তাই প্রাণের প্রতিমাকে দেখতে পাও না।" সুস্পষ্টভাবে বলে না কি? ব্যাপারটা পুতুল পূজার ব্যাপার নয়।
বলা বাহুল্য 'শ্যামা' নজরুল-কাব্যে পরম স্রষ্টার প্রতীক হিসাবে অর্থাৎ তান্ত্রিক মতে যিনি সকল শক্তির শক্তি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা—তার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছেন।
ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে নয়, নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যের উপাদান হিসাবে যেমন একদিকে শ্যামা, শ্যাম, শিব, বলরাম, পরশুরাম, রাম, রাবণ, সীতাকে প্রতীকার্থে ব্যবহার করেছেন তেমনি অন্যদিকে তিনি এজিদ, শাদ্দাদ, জুলফিকার, কেরামত, নূহ, নমরুদ, ইব্রাহীমকে প্রতীকার্থে ব্যবহার করেছেন। এর কারণ সহজভাবে তিনি হিন্দু-মুসলমানকে সাম্য, স্বাধীনতা, শোষণ বঞ্চনার রূপটিকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আরও একটা ব্যাপার, রূপক ও প্রতীকের অলঙ্কারে কবিতা যতটা কাব্য হয়—অন্য কিছুতেই তা হয় না। কোন কোন কাব্যরসিক বলেন—নজরুলের ইসলামী গানের চেয়ে তাঁর শ্যামাসঙ্গীত কাব্য হিসেবে উৎকৃষ্ট।

কথাটা আংশিক সত্য। নজরুলের সব শ্যামাসংগীত উচ্চাঙ্গের কাব্য নয়—আবার ইসলামী গানের অনেকগুলি অবশ্যই উচ্চাঙ্গের কাব্য। "রাঙাজবা" কাব্যের ১ম গান 'বল্ রে জবা বল' ভাবগত দিক থেকে উচ্চাঙ্গের কবিতা। 'রূপক'-এর উৎকর্ষের জন্যে কবিতাটি একটি অমূল্য রত্ন বিশেষ। তেমনি 'সঞ্চীতাঞ্জলি' কাব্যের ৩৫নং গান "ফুলে পুছিনু—বল্, বল্ ওরে ফুল" (ছাপা হ'য়েছে "বলো, বলো ওরে ফুল"। আমার ধারণা "বলো" হবে না, কেননা পরবর্তী পংক্তিতে জিজ্ঞাসা হ'ল—"কোথা পেলি" দ্বিতীয় স্তবকে "কে তোরে" "কোথা পেলি"; তৃতীয় স্তবকেও "কোথা পেলি"। এখানে সমস্ত সম্বোধন অতি আদরার্থে।) আঙ্গিকগত ও কাব্যগত দিক থেকে উচ্চাঙ্গের কবিতা-রত্ন। প্রতীক ও রূপক ব্যতীতই কবিতা সরল প্রত্যক্ষ বাক্য ও শব্দবিন্যাসের অপূর্ব কৌশলে শ্রেষ্ঠ কাব্য হ'য়ে ওঠে—সেই সংগে উচ্চাঙ্গের ভাবনার যদি সংমিশ্রণ থাকে। কিন্তু বলা বাহুল্য এ-কাব্যেও সূক্ষ্ম কৌশলে প্রতীকের ব্যবহার করা হয়েছে। সুফীদের ধারণা সৃষ্ট প্রাণী মাত্রই, জড়, অজড় সমস্ত কিছুই পরমেশ্বরের অংশ বিশেষ। প্রকৃতির এই খণ্ডাংশসমূহ সেই ঈশ্বরের প্রতীক। দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষ সেই নিরাকারকে এই আকারের মধ্যে দেখান। এই গীতি-কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবে সেই দার্শনিক উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে। কবি বলছেন :

"ওরে রবি-শশী, ওরে ও গ্রহ তারা,
কোথা পেলি এ রওশনী জ্যোতিঃধারা?"
কহে, "আমরা তাঁহারি রূপের ইশারা
মুসা বেহুঁশ হ'লো হেরি যে খুবরু।"

"রবি-শশী" "তাঁহারি রূপের ইশারা"। কার? অবশ্যই আল্লাহ্‌র। অতএব "রবি-শশী" সেই আল্লাহ্‌র খণ্ড রূপাংশ। সুতরাং রূপকের আশ্রয় এখানে আছে। বলা বাহুল্য যেখানে কবিতা কাব্য সেখানে কবিতা শাস্ত্র নয়। শ্যামা সংগীতে নজরুল যেখানে বলছেন:

আমার কালো মায়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে,
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক
ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন।

*

সিন্ধুতে মার বিন্দু খানিক—
তার ঠিক্‌রে পড়ে রূপের মানিক।

তখন উল্লিখিত 'হাম্‌দ'-এর সংগে এর কাব্যগত অর্থের কোন পার্থক্য থাকে না। ঠিক এইজন্যেই মধুসূদন বসু রাজনারায়ণকে বলেছিলেন —When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. বেতার বাংলার ১৯৭৫-এর জানুয়ারীতে প্রকাশিত আমার "বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও কাজী নজরুল ইসলাম" প্রবন্ধে (পরে আমার "নজরুল সাহিত্য বিচার গ্রন্থে সংকলিত) এই উদ্ধৃতি দিয়ে আমি বলেছিলাম—"শিল্পীর আদর্শ সৌন্দর্য। কোন ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় অথবা শাস্ত্র

শিল্পীর আদর্শ নয়। আবদুল কাদির সাহেব বর্তমান সংকলনের ভূমিকাতেও সে কথার উল্লেখ করেছেন। (নজরুল ইসলাম জনাব আনওয়ার হোসেনকে লিখিত এক পত্রে বলেছিলেন 'ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়।') বলা বাহুল্য নজরুল ইসলাম ১৯১৯ সালে এলবার্ট হলে বাঙালী জাতির অভিনন্দন পত্রের জবাবে বলেছিলেন : "সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীট্‌সের মত আমারও মন্ত্র—"Beauty is truth, truth beauty." "সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর,"—এটা কবির কাব্যাদর্শের মন্ত্র ব'লে বিশ্বাস করলে মনে হয় কবি সম্বন্ধে আমাদের যাবতীয় সন্দেহ ঘুচে যাবে। কবিকে যদি আমরা কবি হিসাবে দেখি তাহ'লে তাঁর মধ্যে আমরা বৈসাদৃশ্যের অবস্থান দেখতে পাব না—বৈসাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়বে তখন যখন আমরা তাঁকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ক'রে দেখব। কিন্তু নজরুল ইসলাম নিজেকে কোন সম্প্রদায়ের একক সামগ্রী হিসাবে বোধ করি দেখতে চাননি। সে-জন্যই তিনি উল্লিখিত এলবার্ট হলের ভাষণে বলেছিলেন :

> আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি ব'লেই শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি ব'লেই কবি।

কিন্তু সন্দেহের পর্দা তাতেও ঘুচবে না ব'লে তিনি তাঁর সামাজিক দায়িত্বের ব্যাখ্যাও করেছেন এই ব'লে :

> কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু মুসলমানকে এক জায়গায় ধ'রে এনে হ্যাণ্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে-হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হ'য়ে থাকে, তা হ'লে ওরা আপনি আলাদা হ'য়ে যাবে। আমার গাঁট ছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোন বেগ পেতে হবে না। কেননা, একজনের হাতে আছে লাঠি, আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি।

•

নজরুলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। "ওরা" শেষ পর্যন্ত আলাদা হ'য়ে গেল। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'লেও সেটা যে নিন্দনীয়, কোন শান্তিকামী মানুষ সে-কথা বলবে না।
প্রকৃতপক্ষে নজরুল ইসলাম শান্তিকামী। কিন্তু একদিকে সম্পদের পাহাড় গ'ড়ে,—যে সম্পদ সূক্ষ্ম শোষণযন্ত্রের নিষ্পেষণে সৃষ্টি হয়,—অন্য দিকে শান্তির বাণী প্রচার করলে সে শান্তি কোন দিন বাস্তবায়িত হয় না। সুষম ধনবণ্টনের মধ্যেই শান্তির বীজ লুকানো আছে। সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য নজরুল ইসলাম সারা জীবন যুদ্ধের জন্য সকল মজলুম মানুষকে আহ্বান করেছেন। আর এই যুদ্ধ-কাব্য রচনায় তিনি কখনো মার্ক্সীয় অস্ত্র, কখনো ইসলামিক মন্ত্র, কখনো গীতার মন্ত্র আবার কখনো তন্ত্রের মন্ত্রকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই চতুর্থ খণ্ডে 'দেবীস্তুতি'তে সেই মন্ত্র বীজ যেমন লুকানো আছে, তেমনি আছে "নতুন চাঁদে"র "কৃষকের ঈদ", "ঈদের চাঁদ,"

'কেন জাগাইলি তোরা', 'আজাদ", "নতুন চাঁদ", "ওঠ রে চাষী," এবং "শেষ সওগাতে"র বহু কবিতায়; এমনকি কিছু কিছু ইসলামী গানে। বিশেষ ক'রে কবির "শেষ সওগাত" কাব্যে কবির মানবিক ভাবনা গভীর বেদনার ভাষা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিপ্লব ও প্রেম, নজরুলের কাব্যে প্রথম থেকেই পাশাপাশি বিরাজ করছিল। এই প্রেম যেমন ব্যক্তিগত তেমনি বিশ্বগত। চতুর্থ খণ্ডেও সেই ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত প্রেমের গভীর উপলব্ধির পরিচয় প্রকাশিত। বিশেষ ক'রে কবির আধ্যাত্মিক চেতনা ও উপলব্ধির গভীর জটিল প্রকাশ হয়েছে কয়েকটি কবিতায়। যা পড়লে বোঝা যায় যে নজরুল মানব জীবনের গভীরতম জিজ্ঞাসার শেষ দিগন্তে পৌঁছানোর ক্লান্তিহীন সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। এই স্তরে নজরুল যে যোগসাধনার আশ্রয় হওয়ার চেষ্টা করেন তা তান্ত্রিকদের যোগ নয়, সুফীদের যোগ। "সে যে আমি", "অভেদম" ও "আর কতদিন?" এই তিনটি কবিতার অপূর্ব শিল্প সুষমাময় ভাষায় নজরুল তাঁর সুফী ধ্যান-ধারণার গভীর অনুভূতিকে রূপময় ক'রে তুলেছেন—যেখানে সৃষ্টি স্রষ্টার সংগে নিজেকে অভেদ রূপে কল্পনা করে। মনে রাখতে হবে কবির beauty যেমন truth সুফীর beauty তেমনি পরম আদির সত্তা-স্বরূপের সত্তা—সৌন্দর্যরূপে যা বিরাট বিশ্বে বিচ্ছুরিত। এই ভাব-কল্পনায় কবি ও সুফী অভিন্ন।
এ-খণ্ডে নজরুলের গদ্য রচনার মধ্যে তাঁর 'কুহেলিকা' উপন্যাসটি (আকর্ষণের দিক হ'ল বাজারে প্রকাশিত উপন্যাসটিতে যে পরিচ্ছেদটি ছাপা হয়নি গ্রন্থ-পরিচয়ে সম্পাদক সেই পরিচ্ছেদের পুরোটা এখানে ছাপিয়ে দিয়েছেন। এটা "নওরোজ" পত্রিকায় ভাদ্র সংখ্যায় ১৩৩৪ সালে ছাপা হয়েছিল)। "মধুমালা" নাটকটি ও পাঁচটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধগুলি হ'ল 'লাঙল', "পোলিটিকাল ভুবড়ি-বাজি," "নজরুল ইসলামের পত্র", "গণবাণী ও মুজফ্‌ফর আহমদ" ও "রাঙামাটির বাঙলা"। সমগ্র নজরুল ইসলামকে জানতে তাঁর এই গদ্য রচনা যে বিশেষ সহায়ক সে-কথা বলা বাহুল্য।

পরিশেষে বলি স্বার্থান্ধ মহলের প্রবল অপচেষ্টার ফলে নজরুল ইসলামের বিলুপ্ত হওয়ার সাময়িক সম্ভাবনা আজ অবলুপ্ত। আজ প্রমাণ করা আদৌ দুরূহ নয় যে পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম নজরুল ইসলাম—ভাষায়, চিত্রকল্পনায়, ভাব-ব্যঞ্জনায়, অমল কল্পনা-প্রতিভায়, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার প্রজ্ঞায় এবং বিষাদবিধুর গীতরস সংযোজনায় মহাকালবিজয়ী সকল মহাকবিদের তিনি সহযাত্রী। বিংশ শতাব্দীতে আমরা যে অত্যন্ত নিকটে থেকে তাঁর কাব্যের রসাস্বাদন করতে পেরেছি—এ আমাদের অতি বড় সৌভাগ্য; এবং নিশ্চয়ই সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা। প্রকৃতপক্ষে "নজরুল রচনাবলী" সংকলিত হ'ল তাদের জন্যে। আর এই সংকলন যার ভক্তি-প্রণত চিত্তের নিবেদন সেই আবদুল কাদির সাহেব হলেন আমাদের সংগে তাদেরও নমস্য।

—শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

সংকলনে নজরুল ইসলাম

সহজাত আবেগের অকৃত্রিম ও অবলীলাময় স্বতোৎসারণে নজরুল ইসলাম কবি। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমাত্রিক। বিপ্লব ও বিদ্রোহ, শান্তি ও সংঘাত, সাম্য ও শ্রেণী-সচেতনতা, প্রেম ও অপ্রেম, মিলন ও বিরহ, হিংসা ও ভালোবাসা, ধার্মিকতা ও অধার্মিকতা, আস্তিকতা ও নাস্তিকতা, ইসলাম ও অনৈসলাম, হিন্দু ও মুসলমান নজরুল-সাহিত্যে পাশাপাশি বর্তমান। প্রতিভার এই বহুমাত্রিকতাই নজরুল-মানসের যথার্থ মূল্যায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে।

'নজরুল সমীক্ষণ'* গ্রন্থের শুরুতে সম্পাদক ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেছেন:

> এ যাবৎ নজরুল সম্পর্কে বিচিত্রবিধ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। নানা দিক থেকে নানা বর্ণের আলো পড়েছে; সে আলো উৎসভেদে সরল, তীর্যক, মৃদু, তীব্র, নম্র, প্রখর। তার মধ্যে জিন্দাবাদ নিন্দাবাদ উভয় প্রসঙ্গে সমুৎসুক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীসুলভ কখনো ভক্তির প্রাবল্য, আবেগের আতিশয্য, বিশেষণের বাহুল্য, কখনো অনর্গল নিন্দা, অসহিষ্ণু বিদ্রূপ, খর কটাক্ষ বেশ প্রাচুর্যে বিদ্যমান—সন্দেহ নেই। বস্তুত খুব কম চিন্তাই সেই মধ্যবিন্দুতে উপনীত যেখানে সরল নিন্দা-প্রশংসা, কি ব্যক্তিগত সাধারণ ভাল-লাগা মন্দ-লাগা মুখ্য নয়, মুখ্য কবি-প্রতিভার ধনাত্মক মূল্যায়নের প্রয়াস। তবু, বলা বাহুল্য, সেই প্রয়াসই বিরল হলেও প্রার্থিত। ......বর্তমান গ্রন্থ...কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী, সুস্থ, ধনাত্মক প্রবন্ধাবলীর নির্বাচিত সংকলন। (পৃ—১৫)

'নজরুল সমীক্ষণ'-এর পরিচয়ের জন্যে এই প্রাক-কথনই যথেষ্ট। সাধারণত এ ধরনের সংকলনে প্রায়ই সম্পাদকের সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী এবং একটা গতানুগতিকতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আলোচ্য সংকলন সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য কারণেই ব্যতিক্রম।

প্রথমতঃ প্রবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বইটিতে একটি পরিচ্ছন্ন, নিরপেক্ষ ও সুস্থ চিন্তার পরিচয় বিধৃত। দ্বিতীয়তঃ একটি সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক ধারাবাহিকতায় প্রবন্ধসমূহের বিন্যাস বইটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। "নজরুলের সাহিত্যিক সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমি, নজরুল-প্রতিভার মূল্যায়নের প্রশ্ন, নজরুলের বহুমাত্রিক কবিমানস, নজরুলের কবিতার বিবিধ প্রসঙ্গ, শব্দ, উপমা, অলংকার, ছন্দ, নজরুলের উপন্যাস, গল্প, নাটক, শিশুসাহিত্য, গান ও প্রবন্ধ—এই বিচিত্রবিধ বিষয়ের প্রত্যেকটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এইসব প্রবন্ধে বিধৃত।" (পৃ—১৫-১৬)

সকল মহৎ প্রতিভাই দেশ-কাল ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের পটভূমিতে পূর্ণতা লাভ করে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর সামাজিক অবক্ষয় ও বিক্ষোভ এবং ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় আধা সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়াকে ধারণ করে সাহিত্যক্ষেত্রে নজরুলের আবির্ভাব। ইসলামের প্রবল মানবতাবাদী আদর্শ ও ঐতিহ্য, ফরাসী ও রুশ বিপ্লবের ইতিহাস, শেলী-হুইটম্যান-গোর্কি-র সাহিত্যচিন্তা এবং খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ স্বদেশ ও স্বকালের পশ্চাদপট প্রভৃতি তাঁর মানস-পরিমণ্ডল গঠনের

*নজরুল সমীক্ষণ ॥ ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ: ১৩৭৯। প্রকাশক: আমদ প্রকাশন, ঢাকা। দাম বারো টাকা।

উপাদান। নজরুলের সহজাত প্রতিভা এই বিস্তৃত পটভূমিকে আত্মসাৎ করেই বহুমাত্রিক আত্মপ্রকাশের শক্তি লাভ করেছে। 'বাংলার কাব্য ও নজরুল ইসলাম' (হুমায়ুন কবির), 'নজরুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা' (আতাউর রহমান), প্রভৃতি প্রবন্ধ এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য।

মানবতার চারণ-কবি রেনেসাঁসের অগ্রদূত চির-বিদ্রোহী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগ ও নতুন ধারার পথিকৃৎ। অসন্তোষ, অতৃপ্তি, অস্থিরতা, উত্তেজনা, প্রচণ্ড আশাবাদ আর অদম্য স্বতঃস্ফূর্তি তাঁকে প্রতিনিয়ত সৃষ্টিশীল রেখেছে। তাঁর বিদ্রোহ একাধারে ভাববাদী ও বস্তুবাদী। প্রখর দৈনন্দিনতাকে তিনি কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কালের প্রয়োজন মিটিয়েই নজরুলের কবিতা কালোত্তর মহিমায় ভাস্বর। 'নজরুল মানসের একদিক: একটি প্রশ্ন' (হাসান হাফিজুর রহমান), 'শিল্পীসত্তার লালন ও নজরুল' (আহসান হাবীব), 'নজরুল সাহিত্যে নতুন ধারা' (বেগম সুফিয়া কামাল), 'নজরুলের কবি-প্রতিভা (মুহম্মদ এনামুল হক), 'নজরুল কাব্যে বিদ্রোহের স্বরূপ' (কবীর চৌধুরী)। 'নজরুলের কবিতা: কালের অমীমাংসিত প্রশ্নাবলী' (মযহারুল ইসলাম) প্রভৃতি প্রবন্ধে নজরুল-প্রতিভা মূল্যায়নের প্রশ্ন এবং তাঁর বহুমাত্রিক কবিমানসসম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হয়েছে।

মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসায় নজরুল ছিলেন অকৃত্রিম। তাঁর প্রবল মানবতাবোধই ঐতিহ্য-প্রীতিকে জীবন সম্পৃক্ত করেছে এবং বর্তমানকে পরিণত করেছে পুনর্নির্মাণের হাতিয়ারের। "সাম্যবাদের অনুপ্রেরণা ও মানবতাবোধজাত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি কামনা নজরুল মানসের এক প্রধান অংশ।" (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'নজরুল ইসলাম ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক', পৃ—৬১)। "মানবতার উদ্বোধনই কবির বিশেষ লক্ষ্য।" (পূর্বোক্ত, পৃ—৫৮)।

'নজরুল ইসলামের ধর্ম' নামক প্রবন্ধে কবির ধর্ম সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন ড: আহমদ শরীফ। তিনি বলেন: "নজরুল ইসলামকে কোন বিশেষ ধর্মের অনুরাগী বলা চলে না।" (পৃ: ১১৬) তাঁর "কাব্য সাধনা ছিল একান্তভাবে মানবনিষ্ঠ। নজরুলের ধর্মও ছিল তাই মানবনিষ্ঠ। (পৃ: ১১৫) আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় বোধ মহৎ প্রতিভার অন্যতম লক্ষণ। নজরুল-মানসে আধ্যাত্মিক বোধ বিদ্রোহী চেতনার সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টির পরিবর্তে সম্পূর্ণ নির্বিরোধ সাযুজ্যে বর্তমান। এই আধ্যাত্মিকতাই কবির আত্মোপলব্ধির নিয়ামক। জনাব আবুল ফজল 'নজরুলের কাব্যে আধ্যাত্মিকতা প্রবন্ধে এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন।

কবিতার ভাব ও শরীর গঠনে শব্দ নির্বাচন ও এর সুষ্ঠু প্রয়োগ অপরিহার্য। নজরুল ইসলাম অত্যন্ত সাবলীলভাবে শব্দকে একটি প্রবল স্রোতধারার প্রবাহের মতো ব্যবহার করেছেন। এই স্রোতের বেগে আরবী, ফারসী সংস্কৃতি প্রভৃতি শব্দ সহজভাবে মিশে গেছে। 'নজরুল ইসলামের কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গে" (সৈয়দ আলী আহসান), 'নজরুল কাব্যে শব্দ ব্যবহার: আবেগ-উদ্দীপনার অনুষঙ্গ" (আবু হেনা মোস্তফা কামাল) এবং 'নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ' (সৈয়দ আলী আশরাফ)—এই প্রবন্ধ তিনটি নজরুল ইসলামের শব্দ প্রয়োগের শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় পরিস্ফুট।

নজরুলের ছন্দ ও উপমা-অলঙ্কার প্রয়োগের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কবি আবদুল কাদির ও মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ যথাক্রমে 'নজরুল ইসলামের কবিতার ছন্দ' ও 'নজরুল কাব্যে উপমা: শেষপর্ব' প্রবন্ধদ্বয়ে। এ বিষয়ে আলোচনা আরো পূর্ণাঙ্গ হওয়া উচিত ছিল।

নজরুল ইসলাম তিনটি মাত্র উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু এর মধ্যেই তাঁর প্রস্ফুটিত ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে। 'ঔপন্যাসিক নজরুল প্রবন্ধে জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই দেখিয়েছেন—"নজরুলের

উপন্যাসত্রয়ীতে কাহিনীর গাঢ় বিন্যাস এবং উজ্জ্বল চরিত্র-চিত্রণ আমরা পাইনে সত্য, কিন্তু তাঁর কবি-জীবনের স্বপ্ন ও সাধ, কবিতা ও সংগীতে যেমন, এগুলোতেও তেমনি বিধৃত হয়েছে। (পৃ: ২৬৪)।

প্রেম ও সৌন্দর্য-চেতনা নজরুলের কাব্য-ভাবনার এক মূলীভূত উপাদান। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে নজরুল-মানস মূলতঃ প্রেমের ব্যথা-বিধুর পরিমণ্ডলে আবর্তিত। জনাব আতোয়ার রহমানের 'নজরুলের ছোট-গল্প' প্রবন্ধে এই সত্যই ব্যাখ্যাত হয়েছে।

শিল্প সম্মত ও স্বীকৃত নাটকের অভাব থাকলেও সঙ্গীত মাধুর্য এবং কাব্যরসের সমৃদ্ধিতে নজরুলের নাটকসমূহ উপভোগ্য। ডঃ নীলিমা ইবরাহীম ও জনাব আবদুল হক 'নজরুলের নাটক' নামক দুটি প্রবন্ধে নজরুলের নাট্য-প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।

শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নজরুলের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনের শিশু-চিত্ত-সুলভ সারল্য এবং শিশু-মনস্তত্ত্বে সহজ ও স্বাভাবিক অধিকার এক্ষেত্রে তাঁর সফলতার কারণ। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ তাঁর 'শিশু সাহিত্যে নজরুল' প্রবন্ধে আরো দেখিয়েছেন—নজরুলের শিশু সাহিত্য তাঁর জীবন ও সাহিত্যের প্রধান সুরের সঙ্গে সমান্তরাল।

নজরুলের কবি-প্রতিভা গজল-গানের ভুবনে সর্বাধিক পরিস্ফুট। 'বাংলা গানের নব গানের নব জোয়ারের স্রষ্টাকর্তা' হিসেবে নজরুলের অবদান ও কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন জনাব আসরাফ-উদ্দীন আহমদ "গীতিকার নজরুল" নামক প্রবন্ধে।

স্বকাল-বিদ্ধ প্রাবন্ধিক নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যান্য প্রশাখার তুলনায় স্বল্পপরিচিত। কিন্তু 'আবেগসঞ্চারী প্রাণময় পৌরুষদৃপ্ততার এগুলো তাঁর কবিসত্তারই লিকাভাষা। 'নজরুলের প্রবন্ধ: চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পমান' প্রবন্ধে জনাব আকরম হোসেন প্রাবন্ধিক নজরুলের মানস-লোকের গঠনপ্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবন্ধগুলোর শিল্পমূল্য পরীক্ষা করেছেন।

ছত্রিশ জন প্রাবন্ধিকের ৩৭টি প্রবন্ধের সংকলন 'নজরুল সমীক্ষণ' গ্রন্থে আমরা নজরুল-প্রতিভার একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ উপস্থাপিত দেখতে পাই। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধসমূহে কবি-প্রতিভার গুণাত্মক মূল্যায়নের প্রয়াস বইটির অপর বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে সম্পাদক ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান যে নিষ্ঠা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তার জন্যে তিনি প্রশংসার্হ ও ধন্যবাদার্হ।

বাংলাদেশে নজরুল-চর্চার ক্ষেত্রে 'নজরুল সমীক্ষণ' নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বলা বাহুল্য, প্রয়োজন মেটাবার সামর্থ্যেই বইটি সুধীসমাজে, বিশেষতঃ নজরুল-চর্চায় অনুরাগীদের কাছে স্বীকৃত এবং ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বইটির প্রচ্ছদ সুরুচিসম্পন্ন। বাঁধাই উত্তম। কিন্তু একটি ত্রুটি অত্যন্ত স্পষ্ট ও ব্যাপক বলে এর উল্লেখ না করে পারা গেল না। বইটির আদ্যোপান্ত অজস্র মুদ্রণ-প্রমাদে অতিশয় পীড়াদায়ক। বোঝা যায় বইটি সত্যিই "অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে মুদ্রিত ও প্রকাশিত" হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে এই অবাঞ্ছিত ত্রুটি মুক্ত হয়ে বইটির অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাবে বলে ভরসা রাখি।

—মোহাম্মদ কাসেম

শেষ সালাম

বাংলাদেশে নজরুল : তাঁর মহাপ্রয়াণ

আবদুল মুকীত চৌধুরী

কবি নজরুল ইসলামের বাঙলা সাহিত্যে আবির্ভাব হওয়ার সময় থেকে লক্ষ্য করা যায় একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য ক'রে তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছিল। "মোসলেম ভারতে" প্রকাশিত তাঁর কবিতা 'শাত-ইল-আরব', 'কোরবানী', 'মোহররম', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম্', 'খেয়াপারের তরণী', 'রণভেরী' প্রভৃতি কবিতায় যে সাধারণ অনুভূতি প্রকাশ পায় তা ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের মুক্তি-কামনার ও জাগরণের আকাঙক্ষা। পরবর্তীকালে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি বৃহত্তর পরিমণ্ডলে প্রসারিত হ'লেও শিক্ষাদীক্ষায় হীনবল এবং পশ্চাৎপদ, এবং পরাধীনতার জন্যে বঞ্চিত সর্বহারা মুসলমানদের পার্থিব উন্নতির জন্যে তাঁর প্রচেষ্টা তাঁর রচনায় বর্তমান ছিল। তাঁর কবিতায়, তাঁর গদ্যে, তাঁর অভিভাষণে ও গানে নিরন্তর সে পরিচয় ফুটে উঠেছে। মুসলমানের, বিশেষ ক'রে বাঙালী মুসলমানের, আশা ও ভাষা তাঁর কাব্যে, তাঁর সাহিত্যে সার্থকভাবে রূপায়িত হওয়াতে বাঙালী মুসলমান তাঁকে জাতীয় কবি হিসাবে বরণ ক'রে নিয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হ'লেও পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান নজরুল ইসলামের অবদান বিস্মৃত হন নি এবং তিনি পশ্চিম বঙ্গে থাকলেও (তিনি সেখানে ছিলেন কারণ ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দ থেকে জীবিত থাকলেও তিনি বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।) পূর্ব বঙ্গের মুসলমানগণ তাঁকে নিজেদেরই জাতীয় কবি ভাবতেন। সে-ভাবেই প্রতি বছর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে এই জাতীয় মহাকবির সম্মানার্থে পূর্ব বঙ্গবাসীরা "নজরুল-জয়ন্তী" ক'রে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন নিঃকুণ্ঠ চিত্তে। শুধু তাই নয় বাঙালী মুসলমানের জাতীয় কবির স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার পরবর্তীকালে মাসিক ভাতা দানের ব্যবস্থা করেন।

বলা বাহুল্য তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে মহাকবিকে কয়েকবার নিয়ে আসার প্রচেষ্টাও হয়েছিল কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা সম্ভব হয় নি। বাঙালী মুসলমান তার প্রাণের কবিকে নিজেদের কাছে পাওয়ার চেষ্টা ক'রেও সফল হয়নি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের নাগরিকের কবিকে কাছে পাওয়ার সুযোগ ঘটে। ১৯৭২ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ অনুরোধক্রমে ভারত সরকার

কবিকে ঢাকায় পাঠাতে সম্মত হন। ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ২৪শে মে একটি বিশেষ কোকার ফ্রেন্ডশীপ বিমান কবিকে নিয়ে সকাল ১১-৪০ মিনিটে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করে।
সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য সকাল থেকেই বিমান বন্দরে ভীড় জমতে শুরু হয়। বিমান-বন্দর ভবনের ছাদ এবং রানওয়ের একাংশ সকাল ১০টার মধ্যে সকল বয়সের নারী-পুরুষে ভ'রে যায়। সকলের হাতে ছিল ফুলের মালা ও স্তবক। কবির আগমন উপলক্ষে সে-সময় পত্রিকাসমূহে যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তার কয়েকটি উদ্ধৃতি:

দৈনিক বাংলা/১০ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৯ সাল। প্রধান সংবাদ শিরোনাম : "নজরুল বাঙালীর স্বাধীন সত্তার রূপকার" :
"অবিরাম ফুলবর্ষণের মাঝে কবি বাংলাদেশে পদার্পণ করলেন। বাঙলার নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বর 'অগ্নিবীণা'র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম গতকাল বুধবার সকালে ঢাকায় এসেছেন। সকাল ১১-৪০ মিনিটে বিদ্রোহী কবিকে নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফোকার ফ্রেন্ডশীপ ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করে। কবিকে বহনকারী বিমানটি বিমানবন্দরে অবতরণ করার সাথে সাথে অপেক্ষমান বিশাল জনতা গগনবিদারী স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। জনতা আবেগে নিরাপত্তা-বেষ্টনী ভেঙে বিমানের চারপাশ ঘিরে ধরে। ফলে কবিকে বিমানের ভেতর থেকে বাইরে আনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। নিরাপত্তা পুলিশ বিশ মিনিট চেষ্টা করেও জনতাকে দূরে সরাতে পারেনি। কাজী সব্যসাচী মাইক্রোফোনে বলেন, 'কবি অত্যন্ত অসুস্থ। আপনাদের খুশী করার জন্যে তবুও আমরা তাঁকে বাংলাদেশে এনেছি।' ছাত্র-নেতারাও অনুরোধ জানান। এরপর বিমানের সামনের দরোজা দিয়ে কবিকে কোনমতে একটি এ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়। জনতা এম্বুলেন্সের উপর অবিরাম পুষ্পবর্ষণ করেন।

এম্বুলেন্সটি কবিকে নিয়ে সরাসরি ধানমণ্ডিতে কবির জন্য নির্দিষ্ট বাড়ীতে চলে আসে। রাষ্ট্র-প্রধান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কবিকে ওখানে দেখতে যান। বুধবার কবির ধানমণ্ডি বাসভবন কবির সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভীড়ে পরিপূর্ণ হয়। কবি এর আগে ১৯৩৯ সালে শেষবার ঢাকায় এসেছিলেন। সেবার তিনি বনগ্রামে সুধীন দাসগুপ্তের বাসভবনে উঠেছিলেন। পাকিস্তান আমলে একবারও আসেননি।

বিমানবন্দরে দর্শনার্থীদের ভেতর ছিলেন রাজনীতিক, সাহিত্যিক, কণ্ঠশিল্পী, স্কুল-কলেজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, ছাত্র-নেতা। আর এসেছিলেন নজরুল একাডেমীসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের তরুণ শিল্পীরা।

কবিকে তাঁর বাস-ভবনে মাল্যভূষিত করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবুসাঈদ চৌধুরী বলেন, 'আমি এসেছি সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আর বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে মহান কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে। কবি নজরুলের বাংলাদেশে আগমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।' তিনি আরো বলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামকালে আমরা নজরুলের কাছ থেকে অশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। তাঁর 'দুর্গম গিরি' গান চিরদিন মানুষকে

সংগ্রামের অনুপ্রেরণা থেকে।' বাংলাদেশ সরকার কবিকে মাসে এক হাজার টাকা ভাতা মঞ্জুর করেছেন। এ ঘোষণার পর থেকে তা কার্যকরী করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে প্রধানমন্ত্রী বাসভবনে দেখে আসার পর এই সরকারী সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।"

দৈনিক বাংলায় (১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ সাল) এই সংবাদ পরিবেশিত হয়:

''রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী বিদ্রোহী কবি নজরুলের সমগ্র রচনাবলীর প্রকাশ এবং দেশের আগামী নাগরিকদের জন্য তা সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কবি নজরুলই বাঙালীজাতিকে সত্য, ন্যায় ও মানবতা প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছেন। নজরুলের কাব্যসম্ভার, গীতিমালা, স্বরলিপি ও অন্যান্য রচনা সংরক্ষণের দায়িত্ব দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে বলে রাষ্ট্রপ্রধান উল্লেখ করেন।''

পত্র-পত্রিকায় কবি-সত্তার মূল্যায়ন:

জীবিত কবিকে সামনে নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে যে প্রথম 'নজরুল-জয়ন্তী' উদ্‌যাপিত হয় সে সময়কার অনুভূতি ধরা পড়েছে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলিতে। এখানে পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত কয়েকটি সম্পাদকীয়ের আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল।
১৯৭২-এর ১১ই জ্যৈষ্ঠের ''দৈনিক বাংলার" সম্পাদকীয় 'নজরুলের প্রেরণার পথে'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

''বাংলার মাটির পলির রসে, বাংলার আত্মায় রক্তের হরফে উৎকীর্ণ তাঁর নাম। তিলে তিলে নিজেকে উজাড় করে তিনি ভালবেসেছেন এ দেশের মাটিকে। মানুষের দুঃখের, যন্ত্রণার, সংগ্রামের এত বড় শরীক হতে পেরেছেন খুব কম কবি এবং শিল্পী। বাংলাদেশের মানুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর কৈশোর আর যৌবনের স্মৃতি। তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্ম এখানে। এ মাটির সংগে সংযোগ তাঁর নাড়ীর। আমাদের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা, তাঁর কবিতায়, অগ্নিবীণায়, গানের স্নিগ্ধ সরোবরে বেঁচে আছেন তিনি। তাঁর এ আলোর পথ ধরেই যাত্রা করছি আমরা। তিনি আছেন আমাদের সংগে। চিরকাল থাকবেন।---"

''দৈনিক ইত্তেফাকে''র সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

''বলা বাহুল্য, কবি নজরুলের নামের পুরোভাগে সংযোজিত 'বিদ্রোহী' বিশেষণ যেমন তাঁহার সামগ্রিক কীর্তির পরিচয় বহন করে না, একটা বিশেষ স্বষ্টি বা রূপকেই ভাবর করিয়া তুলে,—তেমনি তাঁহার বিদ্রোহ কোন ব্যক্তিবিশেষ, শ্রেণীবিশেষ বা সরকার বিশেষের বিরুদ্ধে ছিল না। তাঁহার বিদ্রোহ ছিল অসত্য, অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে। যে কবির জীবন ও যৌবনের জয়ধ্বনি দুঃসহ প্রহর অতিক্রমের অন্যতম প্রধান প্রেরণা ছিল এবং যাহা আগামী দিনের চলার পথেও সাহস যোগাইবে, সেই কবি আজ আমাদের মধ্যে থাকিয়াও নাই।"

"দৈনিক সংবাদে"র 'স্বাগত হে বিদ্রোহী কবি' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

"পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় জাগা জোয়ারের মতো আমরা আনন্দিত। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পেয়েছি আমাদের মধ্যে।---আজ আমরা ধন্য। আজ আমরা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে ঢেলে মনের সমস্ত জমিয়ে রাখা কথা কবিকে শোনাতে ব্যগ্র। ---সাম্যের নামে, সত্যিকার স্বাধীনতার নামে আমরা সত্যিকার সোনার বাংলা গড়ার শপথ নিচ্ছি। যাঁর কবিতা গত পঁচিশ বছরে বারবার আমাদের এই শপথকে লালিত করেছে, তাঁকে একেবারে সামনে পেয়েছি। কবির কবিতা আর গানের অগ্নিবীণাতেই তাঁকে আমরা বরণ করে নিয়েছি।"

"দৈনিক গণকণ্ঠে"র সম্পাদকীয়—'সুপ্ত বিস্ময়ভিয়াসের সান্নিধ্য' :

"দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা যে আমরা বুঝি না, স্বয়ং নজরুল তার জাজ্বল্য প্রমাণ হিসাবেই আমাদের মাঝে উপস্থিত। অভাব, অনটন, লাঞ্ছনা, উপেক্ষার মাঝেও যখন তিনি বাঁশের বাঁশরী ও রণতূর্য বাজিয়েছেন, তখনও তাঁকে শোষণ করা হয়েছে অতি নির্মমভাবেই। চৈতন্য সেদিন আমাদের আসেনি বলেই আমরা বুঝতে পারিনি, কি অমূল্য রত্ন আমরা হারাতে চলেছি। ---তবুও তিনি আছেন শুধু দেহে নয়, আপন সৃষ্টির মধ্যে এবং সেই সৃষ্টির মাধ্যমেই চিরদিন বেঁচে থাকবেন। কারণ, মহাকাল সব বাহ্যিক সৃষ্টিকে গ্রাস করলেও অন্তরের সৃষ্টির কাছে সে পরাভূত। সমগ্র মানবজাতির লয় না হওয়া পর্যন্ত এই সৃষ্টি অবিনশ্বর থাকবেই। তাই, তেমনি অবিনশ্বর এক সৃষ্টির অধীশ্বরকে আজ আমরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।—জয়তু নজরুল বলে।"

Morning News–এর সম্পাদকীয় :

A prodigal son of nature—he gave with both hands... ...It is natural that the rebel poet should be close to the hearts of the people of Bangladesh ... ... Some of our dreams have yet to be realised. Nazrul Islam, who stood for the down-trodden and oppressed, has a message for us as we move forward.

•

'দৈনিক পূর্বদেশে"র 'কালের জলসায় নীরব কেন কবি?' শীর্ষক সম্পাদকীয় :

"নজরুল সম্পর্কে বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি বহু রকমের মন্তব্য করেছেন। কিন্তু সব কিছু বাদ দিয়ে নজরুল সম্পর্কে যে সত্য সবার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, তা হলো নজরুল মানবতার কবি। শোষিত মানবতার ত্রাণের জন্য তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।---প্রকৃতপক্ষে কবি বিদ্রোহ করেছিলেন অন্যায়, অবিচার, অনাচারের বিরুদ্ধে। তাঁর লেখনীর কশাঘাতের দ্বারা তিনি শুধু শাসক-শোষকগোষ্ঠীকেই জাগাতে চান নি, সাথে সাথে জনসাধারণকেও জাগাতে চেয়েছেন। ---রূপোর চামচ মুখে দিয়ে তিনি পৃথিবীতে আসেননি। জীবনে বহু দুঃখকষ্ট তিনি পেয়েছেন। তাই সর্বহারার ব্যথা তাঁর কবিতার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।"

The People-এর Homage to Nazrul শীর্ষক সম্পাদকীয় :

Nazrul sang of man, of man groaning in tyranny and oppression. The profound vigour and vitality of his forceful poetry and charming songs inspired the enchained people to rise against the Britishers and the historic liberation movement which led to the emergence of Bangladesh owed much to the spirit of freedom pervading his poetic creations. Endowed as he was with creative vision, he dreamt of a society based on equality and free from exploitation, tyranny and oppression. Nazrul can inspire us now as much in building an ideal society as he did during the liberation movement.

......The message of Truth and Beauty Nazrul's poetry and songs convey will continue to captivate and vitalise the present as well the future generations. *

"বাংলার বাণী"র 'আমার আত্মীয় নজরুল' শীর্ষক সম্পাদকীয়ঃ

"মানুষের কবি নজরুল, বিশ্বমানবতার কবি নজরুল তাই দেশের হয়েও বিশ্বজনীন আবেদনে ধরা দিয়েছেন। 'আর্ট ফর আর্টস সেক' এর মহান পূজারীর চেয়ে তিনিই একমাত্র প্রতিভা যিনি ম্যাক্সিম গোর্কির ভাষায়, 'আর্ট ফর মেনস্ সেক্'—এর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ---বাংলা ও বাঙালীর জন্য নিবেদিতপ্রাণ নজরুল তাই আবহমান রূপসী বাংলার প্রাণের প্রিয়তম কবি, অবহেলিত মানবাত্মার দুর্জয় নিনাদ। সাহিত্যের সাধনা করে কারাগার বরণের ইতিহাসে বাংলা সাহিত্যে তিনি অনন্য। --- সত্যভাষণে এমন নির্ভীকতার আর তুলনা হয় না। ---আমরা বলব বাংলার প্রত্যেকটি মানুষের প্রাণের মন্দিরে যে নজরুল আসন পেয়েছে, তার কোন ক্ষয় নেই---বাংলার আবহমান সংস্কৃতি আর নজরুল অবিচ্ছিন্ন সত্তা। নজরুল চিরকালের। জয়তু নজরুল।"

১১ই জ্যৈষ্ঠ মহাসমারোহে ঢাকায় বিদ্রোহী কবির জন্মদিবস পালিত হয়। পরের দিন পত্রিকা সমূহে সেই উদ্দীপনাময় জন্ম-জয়ন্তীর সংবাদ যে-ভাবে প্রকাশিত হয় তার কয়েকটি উদ্ধৃতিঃ

"বিদ্রোহী কবি নজরুল সকল শোষণ নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ" শিরোনামে 'ইত্তেফাক' লেখেন :

"সঙ্গীত কবির মহাপ্রয়াণ'—এই দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকাসহ বিশ্বের স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বত্র 'অগ্নিবীণার' চিরবিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। বিদ্রোহী কবির স্বপ্ন শোষণমুক্ত বাংলাদেশের মুক্ত পরিবেশে তাঁহার ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সকল কর্মসূচীতে রাষ্ট্রের কর্ণধারসহ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী ছাড়াও মুক্তচিত্তে সর্বশ্রেণীর নাগরিক এইবারই প্রথম বাংলাদেশে কবির জন্মোৎসবে জাতীয় মর্যাদার সহিত অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যৌবনের কবি, জীবনের কবি, এবং সর্বোপরি মানুষের কবি কাজী নজরুল

ইসলামের সাহিত্য-কর্মের নূতন মূল্যায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার মাধ্যমে কবির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।"

'কয়েকটি দুর্লভ মুহূর্ত' শিরোনামে "সংবাদ" বলেন :

'গতকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে কবির বর্তমান বাসভবন ধানমণ্ডীর আটাশ নম্বর রোডের বাড়ীটি বাংলার চারণ-কবি নজরুলের জন্মতিথি উপলক্ষে একটি পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছিল। সমবেত দর্শনার্থীরা নির্বাক কবির কতকগুলো দুর্লভ মুহূর্তের সান্নিধ্য লাভ করেন। বাকহারা কবি সমাগত শিল্পীদের গান শুনে একসময় হেসে ওঠেন আবার কাঁদেন, আদর করে শিল্পীদের পিঠে হাত বুলিয়ে দেন।...

দুপুরের দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে যখন নজরুল গীতির অনুষ্ঠান চলছিলো তখন 'ফুলের জলসায় নীরব' ক্লান্ত কবির মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল এবং স্মিতমুখে তিনি মালাগুলো নিচ্ছিলেন এবং যেন খুশী হয়ে সমবেত গায়ক-গায়িকাদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। ---কবি তবলা বড় ভালবাসেন। তাই তবলচী যখন তবলা বাজানো বন্ধ করেন, তখন তিনি ইশারা করে তাঁকে বাজাতে বলেন। মাঝে মাঝে তিনি শিল্পীদের দিকে ফুলের পাপড়ি ছুঁড়ে দেন।"

বাসসের উদ্ধৃতি দিয়ে Morning News/Over 50,000 visit Nazrul' শিরোনাম দিয়ে বলেন :

Over fifty thousand visitors men, women and Childern of all ages defied inclement weather yesterday, greeted the rebel poet Kazi Nazrul Islam at his Dhanmondi Residence on the occassion of the poet's 74th birthday.

২

সাহিত্যে তাঁর অমর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান উপলক্ষে এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করেন। কবিকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করে—১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ গ্রহণ করেন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে :

Extract of the Minutes of the Syndicate held on the 13th April, 1974. Conferment of degree of Honoris Causa on some distinguished persons : With reference to the recommendation of the Academic Council (23.3.74) RESOLVED :
That the Degree of Honoris Causa be conferred on the following persons has noted against each :

I. Professor Satyendranath Bose (D. Sc)
II. Dr. Muhammed Shahidullah (D. Litt)
III. Kazi Nazrul Islam (D. Litt)*

IV. Ustad Ali Akbar Khan (D. Litt)
V. Hirendra Lal Dey (D. Sc)
VI. Muhammad Qudrat-Khudai (D. Sc)
VII. Dr. Kazi Motahar Hussain (D. Sc)
VIII. Prof. Abul Fazal (D. Litt)

Sd/-
Registrar

এক সম্মানপত্রে নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁরা কবির সৃষ্টির মূল্যায়ন করেন :

"দেশকালের জরা-শোক-মৃত্যু-অন্ধকারকে নীলকণ্ঠের মত ধারণ করে প্রজ্বলন্ত আকাংক্ষার, আনন্দের, সংগ্রামের আলোকিত চেতনাকে যাঁরা বিশ্বলোকে পৌঁছে দিতে সক্ষম, তাঁরাই মহৎ। তেমনি এক মহৎ প্রতিভা আপনি, কাজী নজরুল ইসলাম।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ নিয়ন্ত্রিত বাংলার অসম্পূর্ণ পুনর্জাগরণে আহূত সকল বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন নষ্টস্বপ্নে মগ্নমান, তাদের চেতনাস্রোত যখন অন্ধকার বৃত্তে আবর্তিত, বাংলা সাহিত্যে তখন আপনার আবির্ভাব প্রমিথিউসের মত।

আপনার অত্যুজ্জ্বল আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের প্রাণে ও শরীরে সঞ্চার করেছিল বিপুল তারুণ্যের ঐশ্বর্য, বেগের আবেগ, গতির উচ্ছ্বাস, স্বাস্থ্যবান কল্পনার উদ্দামতা।

আপনি কবি; এবং আপনার কবিপ্রতিভার প্রাণশক্তি বাঙালী জীবনের বৃহত্তর ঐতিহাসিক ঐক্যে ছিল প্রতিষ্ঠিত। সে-কারণেই আপনার সৃষ্টি নিপীড়িত জন-মানুষের আকাংক্ষার, সম্ভাবনার, প্রতিবাদের, বিদ্রোহের ব্যতিক্রমী উচ্চারণ। আপনার সাহিত্যকর্ম সত্যসুন্দর আর মানবতার উচ্চকণ্ঠ শিল্পরূপ। আপনি ছিলেন আপোষহীন সত্যসন্ধ কবি। ব্রিটিশের রাজরোষ, কারাগার আপনাকে বন্দী করেছে, কিন্তু অকুতোভয় আপনি দ্বিগুণ আনন্দে প্রজ্বলিত হয়েছেন সত্যের স্বপক্ষে। আপনি সর্বহারার সাম্যবাদী কবি, কল্যাণ আর প্রেম-সাধনার কবি। তাই আজ পর্যন্ত আপনি জনগণপ্রিয় কবি, এবং আপনিই সমকাল ও শিল্পরীতির সাথে ঘটিয়েছেন বিস্ময়কর একান্ত সমন্বয়।

কেবলমাত্র জীবনের বহিরঙ্গ সংলাপে নয়, অন্তরঙ্গ অস্তিত্বে আপনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। মানুষের ধর্মে, আত্মশক্তির আন্তর্জাতিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতায়, প্রবন্ধে, সঙ্গীতে আপনি তরুণ সমাজকে মানবতার উদার আদর্শে প্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বাঙালী জাতির সাম্প্রদায়িক সংকটে আপনার লেখনী ছিল সদাসতর্ক, সৃষ্টিশীল ঐক্যবদ্ধ আত্মশক্তির উদ্বোধনে নিরলস।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আপনিই একমাত্র কবিপ্রতিভা যিনি ঐতিহ্য সন্ধানে এবং নির্মাণে ছিলেন স্বচ্ছন্দ, নির্বন্ধ। হিন্দু ও মুসলমান, জাতিক ও আন্তর্জাতিক উভয় ঐতিহ্যকেই আপনি আপনার স্বাতন্ত্র্যশাসিত চেতনার শিল্পরূপে ব্যবহার করেছেন। আপনার জীবন সম্পৃক্ত ঐতিহ্যবোধ, ধর্মকথার সীমাবদ্ধতা থেকে ঐতিহ্যকে মুক্তি দিয়েছে। আপনি বাঙালী ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাতা, নবভাষাকার।

আপনি ছিলেন শব্দের ধ্বনিগত ব্যবহারের বিস্ময়কর কারুশিল্পী। প্রাকৃত এবং অভিজাত শব্দ-শৃংখলিত সীমানাকে আপনি প্রসারিত করছেন মৌখিক শব্দ-সম্ভারের এলাকায়, কখনো বা

বিদেশী ভাষার সীমানায়। আপনার কবিত্ব-প্রতিভার প্রবল আবেগে বিচিত্র-উৎসের শব্দাবলী বাংলায় হয়েছে পুষ্পিত।
সঙ্গীত জগতে আপনার অবদান অতুলনীয়, বিচিত্রধর্মী ও স্বতন্ত্র। আপনার দেশাত্মবোধক সঙ্গীত সর্বকালের বাঙালীকে করবে উদ্দীপিত, উদ্বোধিত। আপনি কেবল বিপুল সংখ্যক গানের রচয়িতাই নন, সুরের সৃজনী শক্তিতে আপনি সঙ্গীত জগতের নতুন পথ-নির্দেশক। আজও আপনি বাংলাদেশের বিচিত্রমুখী সঙ্গীতের অনতিক্রমণীয় নিরীক্ষাধর্মী সার্থক সুরকার।
আমাদের দুর্ভাগ্য, দীর্ঘ বত্রিশ বছর আপনি স্তব্ধ। আপনার সাহসী অভিযাত্রী-মানসের সৃষ্টি ঐশ্বর্য থেকে আমরা বঞ্চিত। আপনার দু'দশকের সৃষ্টিসম্ভারের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য এবং অভিনবত্বের উত্তরাধিকারের সৌভাগ্যে চিরকৃতজ্ঞ বাঙালি জাতি নিয়ত প্রার্থনা করে যে, আপনি আবার সুস্থ হয়ে উঠুন। আজ আপনাকে সম্মান জানাবার সুযোগ পেয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।"

৩

নজরুল প্রথমতঃ অতিথি হিসাবে এলেও বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে আপনজন হিসাবে নিজেদের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন। ভারত সরকার এ-দেশের মানুষের মনোভাব বুঝে তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার তেমন কোন চেষ্টা করেননি। বাংলাদেশে থাকাকালীন কবির স্বাস্থ্য প্রথম দিকে উন্নতি লাভ করে। তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং একটি চিকিৎসক কমিটির তত্ত্বাবধানে তাঁকে রাখা হয়। এ-অবস্থায় বাংলাদেশের মানুষ আশা করে যে কবি তাঁদের দেশের নাগরিকত্ব পাবেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলাদেশে থাকবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দান করেন।
১৯৭৬ ইংরেজীর একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস উপলক্ষে সরকার সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার একুশে পদকে ভূষিত করেন মহান এই কবিকে।

১৯৭৬ সালের ২৪শে মে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কবিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর "আর্মি-ক্রেস্ট" উপহার দেন। ১৪ই জ্যৈষ্ঠের বাসস-এর বরাত দিয়ে Bangladesh Times-এ খবরটি এইভাবে প্রকাশিত হয়:

Major General Ziaur Rahman Chief of Army Staff and Deputy Chief Martial Law Administrator visited the rebel poet Kazi Nazrul Islam at the P. G. Hospital on Tuesday and presented him the Crest of Bangladesh Army.

কবিকে চিকিৎসকদের বিশেষ তত্ত্বাবধানের জন্য কবিকে ইতিমধ্যে তাঁর ধানমণ্ডীর গৃহ থেকে ঢাকার পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে কবি পি. জি. হাসপাতালে অবস্থান করছিলেন। হাসপাতালে আসার পর থেকে কবির স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হ'তে থাকে। কবির বার্ধক্য বাড়ছিল। তাঁর পায়ে কিছু কিছু পানি জমছিল।

১৯৭৬-এর আগস্টে এসে কবির স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটে এবং আগস্টের ২৯ তারিখে বেলা ১০টা ১০ মিনিটে কবি এন্তেকাল করেন। পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী কবির খাবার মোটামুটি ভালই যাচ্ছিল। শুক্রবার (২৭শে আগস্ট ১৯৭৬) বিকেল চারটার দিকে তাঁর গায়ে সামান্য জ্বর আসে। শনিবার (২৮শে আগস্ট) সকাল ১১টার পর জ্বর বাড়তে শুরু করে। জ্বর ১০৩ ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে। ডাক্তার তাঁকে দেখে বলেন, কবি ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। ঔষধ দেয়া হয়। রাতে তাঁকে দুধ ও পাউরুটি খেতে দেয়া হয়। রোববার (২৯শে আগস্ট) সকালে জ্বর আরো বাড়ে। একশ' পাঁচ ডিগ্রীরও বেশী। কবি অস্থিরভাবে করুণচোখে কাকে যেন খোঁজেন। কবিকে তখন অক্সিজেন দেয়া হয়। কবির ফুসফুস থেকে কফ বের করার জন্য সাকশান দেয়া শুরু হয়। বিগত বছরের ২২শে জুলাই গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড ও কবির ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রফেসর নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরী আসেন সকাল ৮-৩০এ। সকাল পৌনে ৯টার সিস্টার শামসুন্নাহার কবির মুখে চার চামচ পানি তুলে দেন। এরপর কবি আর কিছু খাননি। সোয়া ৯টার বোর্ড কবির স্বাস্থ্য আবার পরীক্ষা করেন। জ্বর কমাবার শেষ চেষ্টা হিসাবে তাঁর শরীর একবার স্পঞ্জ করা হয়। এর আগে কবিকে জীবনরক্ষাকারী ঔষধও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কবির অবস্থা দ্রুত-গতিতে আরো খারাপ হতে থাকে। সময় কাটে সকলের অস্বাভাবিক উত্তেজনায়। চিকিৎসকরা কবির আশা ছেড়ে দেন—অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষা করতে থাকেন তাঁরা। দশটার দিকে কবি আরো নিস্তেজ হয়ে পড়েন। একসময় ব্রাদার ওয়াহিদউল্লাহ ভুঁইয়া চেঁচিয়ে বলেন, 'কবির শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে।' ডাক্তাররা শেষবারের মত পরীক্ষা করে ঘোষণা করেন: কবি আর জীবিত নেই। তখন সময় দশটা দশ মিনিট। শোকার্ত কণ্ঠে সবাই উচ্চারণ করেন: 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।'

রেডিও, টেলিভিশনের নিয়মিত প্রচার বন্ধ রেখে কবির মৃত্যু' সংবাদ ঘোষণা করা হ'তে থাকে। অপ্রত্যাশিত এই সংবাদে সারা নগরী শোকাভিভূত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লো। আবালবৃদ্ধবনিতা অশ্রুভেজা চোখে ভীড় জমাতে শুরু করলো পি. জি. হাসপাতালের আঙিনায় ও কবির অন্তিম দিনগুলোর আশ্রয় পোস্ট গ্রাজুয়েট হাসপাতালের ১১৭নং কেবিনের সামনে। মাত্র পনর মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে ছুটে এলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, এলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, ছাত্র, সাংবাদিক, দিনমজুর, রিকসাওয়ালা তথা সর্বস্তরের মানুষ—আপামর জনসাধারণ। বর্ণনাতীত সেই উত্তাল জনসমুদ্রের উচ্ছ্বাস প্রমাণ করলো, এদেশের মানুষের হৃদয়ে কবির জন্য কী বিপুল শ্রদ্ধার আসন পাতা রয়েছে। জনতার হাতে ফুল, গোলাপ, আগরবাতি—আর চোখভরা অশ্রু—আপনজন হারানোর বেদনার নির্যাস।

স্মৃতিচারণ

পি. জি. হাসপাতালে কবির সাথে একবছরের মধুর সাহচর্যের স্মৃতিচারণে অনেক চিকিৎসক ও কর্মচারীর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। কবির আবাস সেই কেবিনটি, যেখানে কবি এক বছর,

এক মাস এক সপ্তাহ চিকিৎসাধীন ছিলেন, সে কক্ষটি বন্ধ করে দেয়া হলেও কবির ব্যবহৃত জিনিসপত্র ইত্যাদি দেখার জন্য বিরাট ভীড় জমে ওঠে। বাসস প্রতিনিধি দেখেন, শত শত মানুষ কেবিনটিকে ঘিরে রয়েছে। পরম আগ্রহ নিয়ে তারা দেখছে কবি কি ব্যবহার করতেন, কি পছন্দ করতেন ও কি তাঁর পরিবেশ। কবির দীর্ঘ ত্রিশ বছরের ভৃত্য ও সাথী কিশোর সাহ প্রবীণ স্টুয়ার্ট সৈয়দ নাসির আলী, স্টাফ নার্স বিলকিস বেগম এবং কবি ভবনের চৌকিদার মুজিবুর রহমান উৎসুক দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন বিষণ্নমুখে, অশ্রুসিক্ত চোখে।

পি. জি. হাসপাতালের স্টুয়ার্ট সৈয়দ নাসির আলী বলেন, 'আমি কেবিনে ঢোকার সাথে সাথে কবি কাঁদতেন। আমি ভয় পেতাম। কবি কেন কাঁদতেন–আমি তা বুঝতাম না। আমি কোন কারণ খুঁজে পেতাম না। আমরা তাঁকে কখনো রোগী হিসাবে দেখিনি, দেখেছি মায়েরে সন্তান হিসাবে। তাঁর কবিতা, গান, গজল আমাদের মনে এই অনুভূতি এঁকে দিয়েছে।' উল্লেখ্য মাননীয় উপদেষ্টা কর্নেল এম, এম, হকের তত্ত্বাবধানে সৈয়দ নাসির আলীই কবিকে শেষ গোসল দেন জানাজা ও দাফনের পূর্বে।

কবির সাথী ও ভৃত্য কিশোর সাহ বলেন, 'বারো বছর বয়সে কবি পরিবারে এসে কবির আকর্ষণেই আমি এতো দীর্ঘদিন এ পরিবারে থেকে যাই। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে কবি-পত্নী মারা গেলে কবি দারুণ আঘাত পান। কবির সেবার জন্য দীর্ঘকাল আমি আমার মা-বাবাকে দেখতে যাইনি। আজ সকালবেলা দুবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কবি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় আমি এখানে ছিলাম না। তাঁর খাবার আনতে নীচে গিয়েছিলাম। সকালে কবিকে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। আমার মনে হয়, কবির শেষ ডাক আসন্ন।'

কবির কেবিনের দায়িত্বে নিযুক্ত স্টাফ নার্স বিলকিস বেগম বলেন, 'আমি আমার সহকর্মী ও জুনিয়ররা কবিকে দাদু বলে ডাকতাম। দাদু আমাদের চিনতে পারতেন। আমরা তাঁকে খাওয়াতাম। তাঁর পরনের কাপড় বদলিয়ে দিতাম। বিছানা পরিপাটি করতাম। দাদু আমাদের আপনজনের মতো ভালবাসতেন। আমরা আমাদের ছুটির দিনেও তাঁর পরিচর্যা করতাম। কবিও আমাদের সঙ্গ পছন্দ করতেন।

কবি অত্যন্ত সতীর্থকাতর ছিলেন। আমাদের সঙ্গ যখন তাঁর পছন্দ না হতো তখন তিনি বিব্রত বোধ করতেন। একদিন আমি এক মজার কথা বলায় কবি খুশি হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন।'

কবি-ভবনের চৌকিদার মুজিবুর রহমান বলেন, 'কবিকে তাঁর পত্নীর কিংবা তাঁর তরুণ বয়সের ছবি দেখালে তিনি হাসতেন। তাঁর গানের টেপ বাজালে কিংবা কোন শিল্পী তাঁর সামনে তাঁর বিশেষ কতকগুলো গান করলে তিনি কাঁদতেন। আবার কতকগুলো গান বাজানো বা গাওয়া হলে তিনি হাসতেন। কবি মিষ্টি এবং পান ভালবাসতেন। খাবার দিতে দেরী হলে কবি বিরক্ত হতেন। কবি ফুল ভালবাসতেন। ফুল দেয়া হলে তিনি খুশি হতেন।'

পূর্ববর্তী বছরের পাঁচই আগস্ট থেকে কবির জন্য নিযুক্ত এ্যাটেনড্যান্ট [illegible] ওয়াহিদউল্লাহ্ ভূঁইয়ার সাথে দৈনিক বাংলার প্রতিবেদকের আলাপ হয় পি. জি. হাসপাতালে। তিনি বলেন, 'গত

বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন কবির স্বজন। আমার জীবন ধন্য আমি কবিকে সেবা করতে পেরেছি।' তিনি দুঃখ করে বলেন, 'কবি এতদিন হাসপাতালে ছিলেন, কিন্তু তাঁর কোন আত্মীয় তাঁকে দেখতে আসেননি। পিতাকে সেবা করে যেমন আনন্দ পায় সন্তান, তেমনি প্রিয় কবিকে সন্তানের মতো সেবা দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি সবাই।'

৪

অনন্ত-যাত্রায়

সবাই যাতে কবিকে শেষ দেখা দেখতে পায় তার জন্য সোয়া এগারোটায় তাঁর মরদেহ হাসপাতাল থেকে বের করে এনে রাখা হয় আউটডোরের দোতলার হলঘরের উঁচু মঞ্চে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে এখানেও ভীড়ের চাপ মোকাবেলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। লোবানের খোশবু আর আগরবাতির গন্ধের পবিত্র পরিবেশে তাঁর নশ্বর দেহের পাশে চলছিল পবিত্র কোরান পাঠ। পুলিশ জনতাকে লাইন করাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল। অবশেষে অন্তহীন লোকের মিছিল ক্রমেই দুর্বার হয়ে ওঠে। দুঃসাধ্য হয় শৃংখলার ব্যবস্থাপনা। কবির শবদেহ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের খোলা চত্বরে নিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইতিমধ্যে অধ্যাপক আবুল ফজলকে সাথে নিয়ে প্রেসিডেন্ট সায়েম নিজে বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ এলাকায় গিয়ে বিদ্রোহী কবির কবরের স্থান নির্বাচন করেন।

বেলা আড়াইটায় দিকে কবির লাশবাহী ট্রাক টি. এস. সি পথে রওয়ানা হয়। জনসমুদ্রের মিছিল ঠেলে এই সামান্য পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে পুরো আধঘণ্টা। পথের দুপাশে অশ্রুসিক্ত চোখে উদ্বেলিত জনতার মুখে ছিল কলেমা শাহাদাত।

কবির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দলে দলে জনপ্রবাহ ভেঙে পড়তে থাকে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে। কবির মরদেহ নিয়ে সেখানে পৌঁছানোর আগেই সেখানে সৃষ্টি হয় বিরাট ভীড়। ফুলের তোড়া, মালা কিংবা ফুল নিবেদন করে তারা শ্রদ্ধা জানায় কবির প্রতি। ক্রমশঃ সেখানেও ভীড় দুর্নিবার হয়ে ওঠে।

বিকেল সাড়ে চারটায় বিরাট শোক-মিছিল লাশ নিয়ে রওনা হয় সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে। লাখো মানুষের ঢল নামে সারা উদ্যান জুড়ে। বিকেল পাঁচটায় সর্বস্তরের মানুষের সেই মহামেলায় অনুষ্ঠিত হয় কবির নামাজে জানাজা। লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে এ জানাজা সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম নামাজে জানাজা।

প্রেসিডেন্ট সায়েম, সেনাবাহিনী প্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনীর সহকারী স্টাফ প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, অন্যান্য উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ; রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক কবি সাহিত্যিক শিল্পী জানাজায় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ খুরশীদও জানাজায় অংশ নেন। বহু মুসলিম দেশের কূটনীতিবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন উক্ত জানাজায়।

জানাজা শেষে লাশ দাফনের জন্য আনা হয় বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণের নির্ধারিত স্থানে। কবির শবাধার যাঁরা বহন করেছেন মসজিদ প্রাঙ্গণ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে ছিলেন: রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, রিয়ার এডমিরাল মুশাররফ হোসেন খান, ও রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং বি. ডি. আর. প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর।
জানাজার নামাজের পর কবির মরদেহ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। লাশ কবরে নামাবার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হয় কবিপুত্র কাজী সব্যসাচীর আগমন প্রত্যাশায়। কিন্তু তাঁর আসতে বিলম্ব ঘটে।
জুনিয়র টাইগার নামে পরিচিত সেকেণ্ড বেঙ্গল রেজিমেণ্ট বিউগলে শেষ বিদায়ের করুণ মূর্ছনা তোলে। একুশ বার তোপধ্বনির সাথে সাথে বাংলার এই মহান কবির নশ্বর দেহ কবরে নামানো হয়। কবিকে সমাহিত করার সময় পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূতেরা উপস্থিত ছিলেন।

ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেণ্টের এক প্লাটুন সৈনিক দাঁড়িয়েছিলেন কমাণ্ডের অপেক্ষায়। কমাণ্ড আসে—লাষ্ট প্রেজেণ্ট্ আর্মস। একের পর এক তিনটি রাইফেল গর্জে ওঠে। সমাপ্ত হয় তপ্ত ফায়ার। শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ অবনমিত হয় রেজিমেণ্টাল কালার—বীরত্বের প্রতীক, রেজিমেণ্টের নিজস্ব পতাকা। বিউগলে বেজে ওঠে লাস্ট পোস্টের করুণ সুর। বিকেল ৫-৩০টা তখন—প্রলম্বিত লয়ে লাস্ট পোস্ট বেজে চলছিল। কাফনের উপর থেকে ফুলের স্তূপ সরিয়ে কবির নশ্বর দেহ নামানো হয় কবরে। কেঁপে কেঁপে তিন মিনিট ধরে বেজে যায় বিউগলের লাস্ট-পোস্ট। সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেণ্টের রণসঙ্গীত হিসাবে কবির বিখ্যাত গান 'চল্ চল্ চল্'-কে ঘোষণা করেন। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ও রণসঙ্গীত হিসাবে স্বাধীনতা যোদ্ধারা সেদিন এ গানটিকে গ্রহণ করেছিলেন। কবির কবরে সবাই ছড়িয়ে দেন মাটি। পড়েন, 'মিন্‌হা খালাক্‌নাকুম------উখরা।' উচ্চারিত হয় হাজারো মুখে কালেমায়ে শাহাদাত—'আশহাদু আল্‌লা-ইলাহা ---------' দাফন শেষ হয়। রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পাঠ করা হয়। অতঃপর কবির গোরে মাল্যদান করেন প্রেসিডেণ্ট সায়েম। মাল্যদান করেন বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফ থেকে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ ও মেজর জেনারেল দস্তগীর। মাল্যদানের পর এঁরা সকলেই কবরের সামনে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

৫

শোকবাণী

কবি কাজী নজরুল ইসলামের মহাপ্রয়াণে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট আবুসাদাত মোহাম্মদ সায়েম বলেন, 'কবির মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হারিয়ে গেলো। কবি তাঁর অসাধারণ ও বহুমুখী প্রতিভা দিয়ে শুধু যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন তাই নয়, জাতিকে একটি স্বাধীন সত্তা অর্জনের সংগ্রামে প্রেরণাও যুগিয়েছেন।'

সেনাবাহিনীর স্টাফপ্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, 'বিদ্রোহী কবি নজরুল ছিলেন মানবতা ও সাম্যের কবি।' 'বিদ্রোহী কবি তাঁর কবিতা গান প্রবন্ধ ও অন্যান্য সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে থাকবেন।'

দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সাবেক রাজনৈতিক দল এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ গভীর শোক প্রকাশ করে কবির রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর জাতীয় মূল্যায়নে সোচ্চার হন। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বলেন, 'নজরুল ইসলাম ছিলেন নিপীড়িত জনতার কবি।' দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দিনের পর দিন শোকবার্তার খবর আসতে থাকে।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রদূতরা তাঁর মহাপ্রয়াণে শোকবাণী পাঠান:

ভারতের রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দীন আলী আহমদ শোকবাণীতে বলেন, 'কবির দেশপ্রেম এবং বিপ্লবী চেতনা ভারত এবং বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণকে অনুপ্রেরণা যোগাবে।'
ভারতের প্রধান মন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, "তাঁর সক্রিয় জীবনে কবি যা লিখেছেন তা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রেখেছে। তাঁর মৃত্যু ভারত এবং বাংলাদেশকে রিক্ত করে দিয়েছে।"
মালয়েশিয়ার হাই কমিশনার জনাব ইবরাহিম আবিদ ও মালয়েশিয়ার নাগরিকরা কবি নজরুলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রদূত ডঃ ভিজেন কসুটিক এবং বাংলাদেশে বসবাসরত যুগোস্লাভ নাগরিকরা বিদ্রোহী কবি নজরুলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।
ঢাকার সোভিয়েট ইউনিয়নের দূতাবাস বাংলাদেশে বসবাসরত সোভিয়েট নাগরিকদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহী কবি নজরুলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। দূতাবাসের এক শোকবাণীতে বলা হয়, 'নজরুল সোভিয়েট ইউনিয়নে সুপরিচিত কবি। তিনি ছিলেন আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।'

বাংলাদেশে নিযুক্ত লিবিয়ার রাষ্ট্রদূত জনাব আলী হোসেন আল্-গাদামসী 'মহান মুসলিম কবি' কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুতে বাঙালী জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি কবির রুহের মাগফেরাত কামনা করে কবির শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানান।

ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চ ও নিম্ন পরিষদ বিদ্রোহী কবি নজরুলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। কবির রুহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পার্লামেন্ট সদস্যরা এক মিনিট মৌনতা পালন করেন। লোকসভার স্পীকার শ্রী বি. আর. ভগত বলেন, 'নজরুলের জীবন ও রচনাবলী যুগ যুগ ধরে জনসাধারণকে প্রেরণা দেবে।'
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সি. পি. আই. গভীর শোক প্রকাশ করেন। সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাও বলেন, 'কবি ছিলেন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রবক্তা।'
শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায় বলেন, 'কবির মৃত্যুতে একটা স্মরণীয় যুগের অবসান ঘটলো।...
শুধুমাত্র বাংলার জনগণই কবিকে স্মরণ করবেন না, ভারতের সমগ্র দেশবাসীই তাঁকে স্মরণ করবে।'
এছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন সংগঠন, ব্যক্তি এবং বাইরের আন্তর্জাতিক মহলের শোকবাণী আসতে থাকে কবির মহাপ্রয়াণের পর।

৬

কবির মৃত্যুর পরের দিন ১৩ই ভাদ্র, ১৩৮৩ সাল (৩০শে আগষ্ট, ১৯৭৬ ইং) দৈনিক বাংলার খবর ছিল এই: ২ দিন জাতীয় শোক, পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত: আজ সরকারী ছুটি ঘোষণা: সারা দেশে শোকের ছায়া। 'আজ জাতীয় ছুটি' শিরোনামের সংবাদে তাঁরা বলেন: "জাতীয় বীর কবি নজরুল ইসলামের ইন্তেকালে শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে সরকার আজ সোমবার জাতীয় ছুটি ঘোষণা করেছেন।
গতকাল রোববার জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকে। আজ সোমবারও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।' উল্লেখ্য হাইকোর্ট সহ সমস্ত নিম্ন আদালত, বাংলাদেশ ব্যাংক, রেডক্রস সমিতির সকল অফিস সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী অফিস, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং কল-কারখানা ইত্যাদি একদিন বন্ধ থাকে।

মহাপ্রয়াণের পর: পত্র-পত্রিকায় নজরুলের মূল্যায়ন

মহাকবির মহামৃত্যুতে বাংলাদেশী জনগণ শোকে অভিভূত হ'য়ে পড়েন। তাঁদের অন্তস্তল পর্যন্ত মহাবীরের মহাপ্রয়াণে অশান্ত হ'য়ে ওঠে। কবির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ভালবাসা ছিল সীমাহীন। সেই সীমাহীন শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্বাধীন দৈনিক সমূহে। সেদিনের সংবাদ শিরোনামাগুলি ছিল নিম্নরূপ:
দৈনিক বাংলার প্রধান খবর ছিল "চির নিদ্রায় বিদ্রোহী কবি নজরুল।" তাঁদের সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল, 'চির-বিদ্রোহী বীর।' এতে তাঁরা বলেন:
"বাংলা সাহিত্যের সেই বিরল পুরুষদের তিনি সম্ভবতঃ শেষ প্রতিনিধি যিনি সাহিত্যের সঙ্গে জীবন, স্বাদেশিকতা, আর সংগ্রামকে নিজহাতে সংযুক্ত করেছিলেন।...
বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে কোমলে-কঠোরে মিশ্রিত এমন ব্যক্তিত্ব আর চোখে পড়ে না।...
নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িকতার অনন্য প্রতীক—বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ধারাকে তিনি যেমন পরিপুষ্ট করেছেন, তেমনি পশ্চাৎপদ বাঙালী মুসলমান সমাজকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন উজ্জ্বল আলোকবৃত্তে।...
সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে গিয়েছিল তাঁর মহত্ব, ঔদার্য আর মানবপ্রেম।...
আমাদের সান্ত্বনা, কবি নজরুল অনন্ত, কবি নজরুল অনিঃশেষ, অমর তাঁর স্বাধীনতা আর বিদ্রোহের বাণী।... স্বাধীন বাংলাদেশ তার অগ্রযাত্রায় নজরুলের কাছ থেকে খুঁজে নেবে শক্তি, সাহস আর অনুপ্রেরণা।... জাতি হিসাবে আমরা তাঁর কাছে ঋণী।"

সেদিনের "সংবাদ"-সম্পাদকীয় ছিল 'ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে'। তাঁরা তাঁর মর্যাদার দিকে আলোকপাত করে বলেন: 'ভাষাহীন বোধশক্তিহীন কবি ও সুরকার জীবিত থেকেও অনুভব করে যেতে পারেন নি যে, বাংলাভাষী সকল মানুষেরই শ্রদ্ধার মালা তিনি জয় করে নিয়েছেন। দুঃখ শুধু এটুকু যে, সুস্থ তাঁর সার্থক শক্তির প্রভাব অনুভব করতে পারলেন না, অদৃষ্ট অন্তরেই তাঁর মহাপ্রয়াণ আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হলো।...

নজরুল বিয়োগে বাঙালী আজ হতবাক। বিদ্রোহী কবিকে তাঁর অনন্তলোকে যাত্রার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরাও বলি—'কে বলে মরেছ তুমি যে অমর আছো চিরদিন।"

কবির ইন্তেকালে "আজাদে"র সম্পাদকীয় 'আমাদের কবি আর নাই'। তাঁরা বলেন: 'সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুলের অবদান শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়—বিশ্ব সাহিত্যেও বিপুল স্বীকৃতির দাবী রাখে।' তাঁরা তাঁকে 'মুসলিম সমাজের জাগরণের চারণ কবি' বলেন। তাঁরা আরও বলেন: "নজরুল আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি আমাদের জাতীয় সম্পদ। এই জাতীয় সম্পদের উপযুক্ত সংরক্ষণ জাতির জন্য একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অনুবাদের মাধ্যমে নজরুল সাহিত্যকে বিশ্বের সাহিত্যামোদীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করাও আমাদের একটি প্রধান দায়িত্ব।"

Bangladesh Times "Undying Flame" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলেন:

'The Rebel Poet is dead. But the flame will burn undyingly. "Blood, imagination and intellect" ran together in him to produce one of the finest artisans of words. The brevity of his stay did not stand in the way of making him an immortal figure of Bengali literature. As long as Bengali is spoken, Kazi Nazrul Islam will be remembered with appropriate reverence. His melodies will ring in our minds eternally. A brilliant era in Bengali literature has come to an end the sparks from which will inspire posterity for earning new laurels in literature.

তাঁর মহাবিদায়ে 'সম্পাদকের দপ্তর থেকে' সাপ্তাহিক 'চিত্রালী' বলেন:

"বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাসে ও জীবন-চর্চায় যে মানুষটি ছিল উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের মতো দেদীপ্যমান, সূর্যের মত তেজস্বী সেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আর নেই।...
বাংলাদেশের ইতিহাসে নজরুল যুগস্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের সম-সাময়িককালে জন্ম নিয়ে রবীন্দ্র-প্রভাবের কালে পদচারণা করেও নজরুল রবিবলয়ের বাইরে নতুন চিহ্ন স্থাপন করে অনন্যতায় ভাস্বর বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। যাঁরা নজরুলকে যুগের নয় হুজুগের কবি বলে আখ্যায়িত করতে চান, তাঁরা ভ্রান্ত। নজরুল কোন অর্থেই হুজুগের কবি নন, সর্বঅর্থে তিনি যুগস্রষ্টা এবং সর্বযুগের। যুগে যুগে যদি আমরা বিপন্ন হই, যদি আমাদের অধিকার নিয়ে কোন শক্তি ছিনিমিনি খেলতে চায়, তখন আমরা জানি, নতুন সংগ্রামের প্রেরণা হিসাবে তখনও নজরুল আমাদের অবলম্বন।"

কবির শেষ বিদায়ের প্রেক্ষিতে 'চিরজীব চিরবিদ্রোহী' সম্পাদকীয় শিরোনামে 'পূর্বাণী' বলেন:

"আমাদের সাহিত্য জগতের কীর্তিমান মহাপুরুষ আমাদের ঐতিহ্যের পরম নিষ্ঠাবান মহৎব্যক্তিত্ব, আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার যৌথ ধারার প্রগাঢ় সঞ্জীবনী শক্তি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম শ্যামলী বাংলাদেশের কোমল মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন। কবি নজরুল, সাহিত্যিক নজরুল, সাংবাদিক নজরুল, মানবপ্রেমিক নজরুল, তাঁর চিন্তা, তাঁর চেতনায় ছিলেন নির্ভীক ও আপোষহীন। নীলকণ্ঠের ন্যায় সমস্ত হলাহল পান করে কবি আজীবন অমৃতের সন্ধানে ছুটেছেন। কবির কবিতা কবির মানবতাবাদী আদর্শ আমাদের জন্য পথের দিশা হয়ে থাকবে।"

ইত্তেফাক, তাঁদের সম্পাদকীয় 'বিদ্রোহী কবির মহাপ্রয়াণ'-এ বলেন:

'ভোরের কান্নার মত আজ প্রতিজনের হৃদয়ে হৃদয়ে বাজিতেছে একটি করুণ বেহাগ। 'তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না' কবির এই ব্যথিত উচ্চারণ আজ শাব্দিক অর্থেই সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম যেখানে সত্য, সেখানে মৃত্যুর চিহ্ন নাই। পাবক শিখার মত তিনি জ্বলন্ত ও দেদীপ্যমান।---হিমালয়ের মত উঁচু ও অটল শির ছিল তাঁর এবং গোটা জাতিকে তিনি চারণের গাহিয়া উন্নীত করিয়া গিয়াছেন সেই আত্মবোধের পর্যায়ে।
তোলপাড় করা এক কীর্তির তিনি সম্রাট। বলিষ্ঠ জীবনবোধের নায়ক। শতাব্দীর অন্ধকার তাঁর হাতে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। আলোর দীপ্ত মশাল উচ্চে তুলিয়া ধরার অন্যতম প্রধান ভূমিকা তাঁরই।
---সাহিত্যের যেখানেই হাত দিয়াছেন, ফলাইয়াছেন সোনার ফসল। ------
বাংলা সাহিত্যে এমন বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের এমন উচ্চকিত প্রাণস্ফূর্তির নজীর আর দ্বিতীয়টি নাই।
---নজরুল বলিতেই বুঝায় বেদনা-বিধুর না পাওয়া একটি চিরন্তনী প্রেমিককে, বুঝায় সংসার বিরাগী এক পুরুষকে। শিশুর মতো সরল-সুন্দর চোখ, সিংহের কেশরের মত বাবরি, বজ্রের মত কণ্ঠ—এই ইমেজও নজরুলের। বাংলা সাহিত্যে তিনি শুধু নূতন বাণীই সংযোজন করেন নাই, নূতন সাহিত্য-ব্যক্তিত্বেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।
উপমহাদেশে মুসলমান জাতির আত্মবোধের বিকাশে কবি জাতীয় কবির ভূমিকা পালন করিয়াছেন। নজরুল কখনো আপোস করেন নাই। কণ্ঠের সমস্ত শক্তি দিয়া অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও নিপীড়নের তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখানেই নজরুল সত্য ও অমর।
কবির মৃত্যু আছে। কবিব্যক্তির ও তাঁর সৃষ্টির মৃত্যু নাই। যতদিন সুধা ও সৌন্দর্যের জগত আছে, ততদিন থাকিবেন নজরুল। নয়নসমুখে না থাকিলেও তিনি থাকিবেন আমাদের নয়নের মাঝখানে।"

১৯৭২-র ১০ই মে থেকে ১৯৭৬-এর ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে কবির আগমন, অবস্থান, নাগরিকত্ব, মৃত্যুবরণ এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভের এই হ'ল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই ইতিহাস আমাদের এই কথাটি বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে চির-উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে—জনপ্রিয়তায়, শ্রেষ্ঠতম কবির মর্যাদায় এবং ব্যক্তিত্বের সমুন্নত মহিমায় তিনি চিরকালের চির-উন্নত শির মহাকবি কাজী নজরুল ইসলাম।

নজরুল একাডেমী পত্রিকা

নিয়ম-কানুন

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত—বছরের এই ছয় ঋতুতে—অর্থাৎ প্রতি দু'মাসে "নজরুল একাডেমী পত্রিকা"র একটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জীবন, ভূমিকা, মানস, প্রতিভা, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে মননশীল, বিশ্লেষণধর্মী ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও আলোচনা এ পত্রিকার প্রধান উপজীব্য। নজরুলের অপ্রকাশিত বা বিস্মৃত রচনা ও পাণ্ডুলিপি এবং তাঁর গানের স্বরলিপি এতে প্রকাশিত হয়। এ-ছাড়া সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি সংক্রান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা এ পত্রিকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

পত্রিকার প্রতি সাধারণ সংখ্যার দাম ১০'০০। বাৎসরিক চাঁদা ডাকমাশুল সহ ৭৫'০০ টাকা। পত্রিকা ডাকে পেতে হলে মনি-অর্ডারে অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে অর্ডার দিতে হবে।

বিক্রেতাদের শতকরা ২৫'০০ টাকা কমিশন দেওয়া হবে। বিক্রেতারা যত কপি পত্রিকা চান, তার প্রতি কপির জন্য ৫'০০ টাকা হিসাবে অগ্রিম পাঠালে তাঁদের নামে ভি: পি: পাঠানো হবে।

সাধারণ সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের হার

শেষ কভার পৃষ্ঠা	৩,০০০'০০
২য় কভার পৃষ্ঠা	২,০০০'০০
৩য় কভার পৃষ্ঠা	১,৫০০'০০
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা	১,০০০'০০
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা	৫০০'০০

অর্ধ পৃষ্ঠার কমে কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না।

লেখক, গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন।

কর্মাধ্যক্ষ: নজরুল একাডেমী পত্রিকা
মোনাবাদ কলোনী মগবাজার, ঢাকা।
সম্পাদক/ম্যানেজার

টেলিফোন: ২৫ ৩৫ ৫৫ / ৪০ ১৬ ৬৬

একাডেমী সংবাদ

নজরুল ইসলাম ও নজরুল একাডেমী

তালিম হোসেন

[সাধারণ সম্পাদক]

[এক]

নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের গণমানসের কবি, তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপকার। একই সঙ্গে, তাঁর কবিতা সর্বমানবের কবি-কণ্ঠ, তাঁর গান চির-মানুষের প্রাণের সুর। সাধারণ মানুষের, সকল আশা-আকাঙ্খা, বেদনা বিক্ষোভকে তিনি নিজের জীবনে আত্মস্থ করেছেন, নিজের কণ্ঠে ধ্বনিত করেছেন। তা করতে গিয়ে তিনি প্রতিভাত হয়েছেন একই সঙ্গে বিদ্রোহীরূপে এবং প্রেমিক-রূপে। বিদ্রোহী ও প্রেমিক মূর্তির মধ্যে ভাব ও মেজাজের যে আপাতঃ-বিরোধিতা তা সাধারণ মানুষের চেহারাতেই অলক্ষ্য থাকে। এই অলক্ষ্যের প্রকাশ-মূর্তিটি ধারণ করেন তার কবি, তার জীবন-শিল্পী। নজরুল ইসলাম সেখানে সাধারণ মানুষের সত্যিকার প্রতিনিধি, তার সার্থক বাণী-মূর্তি। কেবল অসাধারণ ব্যক্তিরাই এভাবে সর্ব-মানবের অন্তর-সত্তাকে নিজের মধ্যে অঙ্গীভূত করতে পারে।

মানবতার কবি-কণ্ঠ

নজরুল ইসলাম নেমে এসেছেন জীবনের রুক্ষ্য কঠিন মাঠে, উঠে গিয়েছেন তার অধ্যাত্মের ঊর্ধ্ব-লোকে, প্রবেশ করেছেন তার রোমান্টিকতার নির্জন প্রদেশে। কিন্তু তাঁর এই সব যাত্রায়, সব অবস্থানেরই সঙ্গী চিরন্তন মানুষ। নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতির তুরীয় মার্গে আত্মরতি-মগ্নতা তাঁর স্বভাবে ছিল না। তাই তার হাতছানি তাঁকে চরিত্র-ভ্রষ্ট করেনি। তার আক্রমণ থেকে তিনি বারবার পালিয়ে এসেছেন। মানবতার বেদীতে সব অর্ঘ্য দিয়ে আপন চরিত্র-মগ্ন অস্তি মানবতাকে তিনি নিঃস্ব করেছেন। নিয়তি তাঁকে সর্বকালের মানবতার কবি-কণ্ঠ করে রাখতে চেয়েছে বলেই হয়তো এমনটা ঘটেছে।

বাংলা ভাষা ও বাঙালীর ভাগ্য যে সর্বকালের অন্যতম-শ্রেষ্ঠ এই মানবতাবাদী কবি তাদের মধ্যে জন্ম-লাভ করেছেন। অসামান্য প্রাণৈশ্বর্যে নজরুল স্বদেশে নিজের মহিমাকে চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত করে-

ছিলেন বটে, তবে তাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার আয়োজন বা সঙ্গতি তাঁর নিজের কখনও ছিল না। আর এখন পর্যন্ত বাংলাভাষা ও বাঙালীর লজ্জা এই যে, তারাও তাদের এই অনন্য ঐশ্বর্যকে বিশ্ব-সভায় পরিপূর্ণভাবে উপস্থিত করতে পারেনি।

হিন্দু-মুসলমান

নজরুল নিজের অবদানে ধন্য করেছেন তাঁর দেশকে, দেশের সমগ্র মানুষকে। তাঁর গুণ-মুগ্ধ ও প্রেম-সিক্ত বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়। বাঙালী হিসাবে তাদের যে ঐক্যবদ্ধ ও মিলিত সত্তা, নজরুল তার একমাত্র প্রতিনিধি। আবার উভয়ের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক মানসেরও তিনিই একমাত্র দরদী রূপকার। ইসলামের ঐতিহ্য, আদর্শ ও মূল্যবোধকে নতুন কালের প্রেক্ষাপটে স্ব-মহিমায় উপস্থাপিত করে তিনি যেমন বাংলার মুসলিম সমাজকে আত্মবিস্মৃতি ও হীন-মন্যতার অন্ধকার থেকে গৌরবোজ্জ্বল নবজীবনের পথে তুলে দিয়েছেন, তেমনি আপন অলোক-সামান্য প্রতিভার অকৃপণ স্পর্শ দিয়ে হিন্দু সমাজকেও তিনি তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঞ্জীবনী প্রেরণায় উদার মানবতার পথে উদ্দীপিত করেছেন। তাঁর সাধনা ছিল—ক্ষুদ্রতা ও ভেদবুদ্ধির কবল থেকে উদ্ধার করে উভয় সম্প্রদায়কে একদেহ-একপ্রাণে স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতি-পথের অভিমুখী করা। অখণ্ড মানবতার প্রেমিক ছিলেন বলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে তিনি উৎসাহবোধ করেন নি। তাই সাম্প্রদায়িক উপদ্রবের ঝড়ের লগ্নে প্রশ্ন করেছেন—"হিন্দু না ওরা মুসলিম—ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন।" কিন্তু তাঁর ব্যাকুল প্রশ্ন সদুত্তর খুঁজে পায়নি। বাংলাদেশের হিন্দু আর মুসলমান পৃথক পৃথক ভাবে তাঁকে ভালোবাসলেও তাদের রাজনৈতিক মানস একযোগে তাঁর মিলনের বাণীকে উপেক্ষা করেছে। উপমহাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিত তাঁর অদম্য মানবিক মিলনের জন্যে আপাত-ব্যর্থতার শয্যা রচনা করেছে।

'চির-কবি নজরুল'

কিন্তু ব্যর্থ হবার মত স্মৃতির পসরা নিয়ে নজরুল আসেননি। তিনি সেই জাতের এক অমর ব্যক্তিত্ব, সমকালীন মানুষের গ্রহণ-বর্জনে যাঁর মূল্য ও উপযোগ নিঃশেষ হয়ে যায় না। "পরোয়া করি না বাঁচি বা না-বাঁচি/যুগের হুজুগ কেটে গেলে"—তিনিই বলতে পারেন, যাঁর হাতের মুঠিতে থাকে কালের ঘোড়া ঘোড়ার ঝুঁটি। তারই জোরে তিনি ঘোষণা করেন—"আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব-হেতু।" সেই 'মহা-বিপ্লব' কি অতিক্রান্ত হয়েছে? হবে কখনো? 'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না/অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না'—সেদিনের আগে তো তাঁর ছুটি নাই। সেদিন কি কখনো আসবে? কবে আসবে? মানুষের এই পৃথিবীতে সেদিন তো চিরায়ত, অথবা মহাপ্রলয়ের কাল পর্যন্ত প্রসারিত। কাজেই ব্যর্থতার মালা গলায় দিয়ে কে তাঁকে বিদায় জানাতে পারে। তিনি যে বলেছেন, তিনি 'বর্তমানের কবি,' সে বর্তমান তো অনন্ত। বিগত কাল, সমকাল ও অনাগত কালে প্রসারিত সে বর্তমান। সেই চির-বর্তমানকে তিনি ভাষা দিয়ে মুখর করেছেন, সুর দিয়ে জাগর করেছেন। যে অতীত অনিঃশেষ স্বপ্নে বর্ণকিত, তারই বাণীবাহক নজরুল; যে বর্তমান চিরন্তন সংগ্রামে আন্দোলিত তারই তূর্য-বাদক নজরুল; যে ভবিষ্যত

চিরায়ত আশার উচ্চকিত তারই দিক-নির্দেশক নজরুল। নজরুলের নিজের ছিল সেই অকম্প প্রত্যয়। তাই বুঝি রোগ-ক্লিষ্ট চেতনার প্রদোষেও তাঁর কম্পিত কলমে রেখায়িত হয়েছিল—"চির-কবি নজরুল" —এই অহংকারী আত্মঘোষণা।

'বাঙালী বলতে একজন আছে'

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় একদা ছড়া কেটে সুন্দর করে বলেছিলেন:

ভুল হয়ে গেছে বিলকুল—
আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে,
ভাগ হয়নিকো নজরুল।
এই ভুলটুকু বেঁচে থাক,
বাঙালী বলতে একজন আছে—
দুর্গতি তার ঘুচে যাক্।

আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেলেও 'নজরুল' যে কেন ভাগ হয়নি তার কারণ তিনি বলেন নি। কারণ এই যে, 'চির-কবি' কখনো ভাগ হয় না। শ্রীরায় বলেছেন, "বাঙালী বলতে একজন আছে।" তাঁকে আমার বলতে ইচ্ছা করে—'আছে' নয়, বাঙালী বলতে ছিলই মাত্র একজন; তিনি নজরুল। দেশ ভাগ হবার পরে নয় বা তাঁর অমন আন্তরিক ছড়া লেখার কালেই শুধু নয়; অভগ্ন, অখণ্ড দেশেও নজরুল ছাড়া সে-বাঙালী কখনো আর দ্বিতীয়টি ছিল না। সেজন্যই তো নজরুল না চাইলেও ভারত ভাগ হয়েছে, বাংলাদেশও ভাগ হয়েছে। বস্তুতঃ দেশ ভাগ হওয়া দেখে নয়, তার অনেক আগে, দেশের বিভক্ত হৃদয়ের চূড়ান্ত রূপ দেখেই কবি স্তব্ধ, মূক হয়ে গিয়েছিলেন:

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না,
কোলাহল করি' সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।

অবশ্যম্ভাবী আসন্ন পরিণতির রূপ দেখেই কি তাঁর নিজের বাণী নিজের কানেই 'কোলাহল' মনে হয়েছিল? এবং তাই কি এই মরণ-পণ অভিমান?
বাংলা সাহিত্যের আর এক মহান দিকপাল রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধে এই পরিণতির হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন বটে, কিন্তু আদর্শ বাঙালী সত্তার রূপায়নে সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নজরুলের মৈত্রী সাধনার যে পথ তা তাঁরও চরণ-স্পর্শ পায়নি। পায়নি মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্র বা তাঁদের পূর্ব বা উত্তরসূরী অন্য কোন মহাপ্রাণের। তাই সমান্তরাল পথে পদচারণা করে হিন্দু বাঙালী এবং মুসলমান বাঙালী তাদের নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছেছে, আর সমন্বয়ের সাধনা নিয়ে নজরুল ইসলাম হারিয়ে গিয়েছেন এক অন্ধকারে—যার নাম 'আদর্শ বাঙালিত্ব'।

রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালের দ্বৈত-স্বরূপ

কিন্তু নজরুলের অস্তিত্বে শুধু আদর্শ বাঙালিত্বের সাধনার অনুষ্ঠান নয়। তাঁর সাধনা তো মূলতঃ মানবতারই সাধনা। নজরুল হিন্দু-মুসলমানের স্বতন্ত্র সত্তাকে অস্বীকার করেননি, তাদের বিশিষ্ট

সাংস্কৃতিক পরিচয়কে মানবিক মহিমায় উপস্থাপিত করে তিনি তাদের আন্তঃমানবিক মৈত্রী সম্পর্কই শুধু অঙ্গীকার করতে চেয়েছেন। তবু তাঁর কি এমন কোথাও ভুল হয়েছিল, যেখানে রবীন্দ্রনাথের ভুল হয়নি, ইকবালের ভুল হয়নি? সম্ভবতঃ তাই। অন্ততঃ ক্রান্তির ইতিহাস তাই প্রমাণিত করেছে। নজরুল তাঁর একক ব্যক্তিত্বে রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালের দ্বৈত-স্বরূপকে ধারণ করতে চেয়েছিলেন। সেটা ছিল সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জাতি-চেতনার দিক থেকে ব্যক্তি-সত্তার এমন এক সংকট-সন্ধি, যার উত্তরণের সীমানা বিস্তৃত ছিল বাঙালিত্বকে ছাড়িয়ে সমগ্র ভারতীয় জাতি-সত্তার মধ্যে। তাই, যখন ভারত বিভক্ত হলো তার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশও দু'ভাগ হয়ে তার অনুগামী হলো; আর বিবর্তিত দুই নতুন দেশের দুই পৃথক জাতিসত্তা ভাগ করে নিল রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালকে আপন আপন মুখপাত্র রূপে। দেখা গেল, 'সোনার বাংলা'র কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ হলেন ভারতের এবং 'হিন্দুস্তাঁ হামারা'র কবি হয়েও ইকবাল হলেন পাকিস্তানের। নজরুল কার, তার মীমাংসা রইলো মুলতুবী।

নতুন বাংলাদেশ ও নজরুল

কিন্তু মাত্র সিকি শতাব্দীর ব্যবধানে উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আর একবার পরিবর্তন ঘটলো। উপমহাদেশের ভাঙাগড়ার মুলতুবী ইতিহাস আজ আবার নতুন এক ভৌগোলিক জাতি-রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে—যার নাম বাংলাদেশ। এ এক নতুন বাংলাদেশ, যা রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ থেকে এবং ইকবালের পাকিস্তান থেকে এক নতুন অবস্থানে নিজেকে চিহ্নিত করেছে এবং এক স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সত্তায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ সত্তার বিবর্তনের ধারাই বলে দেয়, কাকে সে গ্রহণ করবে জাতীয় কবি রূপে। উপমহাদেশের ভূগোল, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রাজনীতির যে চতুরাশ্রমের পরিক্রমায় নব-অভ্যুদিত বাংলা দেশের উত্তরণ, তারই আদর্শিক প্রতিনিধি নজরুল। আমরা জানি নজরুল সবার—যেমন রবীন্দ্রনাথ সবার, ইকবালও সবার। কিন্তু সবার রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতের জাতীয় কবি, সবার ইকবাল যেমন পাকিস্তানের জাতীয় কবি, তেমনি সবার নজরুল আজ অনিবার্যভাবে বাংলাদেশের জাতীয় কবি। কারণ আমরা এও জানি যে, আন্তঃমানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের দ্বৈত-সত্তার সাগর-সঙ্গম বাংলাদেশ। নিয়তি-কর্তৃক সেই ভূমিকাই তার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। তাই নজরুলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালের দ্বৈত-স্বরূপের যে প্রতিনিধিত্বকে এককালে বিভ্রান্তিকর মনে হয়েছিল, তাই আজ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এক নতুন সত্যের মহিমা লাভ করেছে। বাংলাদেশ মুসলিম-গণ-প্রধান, তাতে কি হয়েছে? বাংলাদেশ যদি কোনদিন শতকরা একশ' ভাগ মুসলিম গণ-ভূমিও হয়, তাতেই বা কি হবে? নজরুল যদি থাকেন আমাদের মুখপাত্র ও পথপ্রদর্শক, ভারত ও পাকিস্তান বাংলাদেশের কাছেই অভেদ মানবিক সম্পর্কের পাঠ গ্রহণ করবে।

[দুই]

১৯৪২ সালের দিকে প্রতিভার দীপ্ত সূর্য নজরুল রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির তোলপাড় অঙ্গন থেকে প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে বিদায় গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের বিদেশী শাসনমুক্তি এবং দেশবিভাগের আনুষঙ্গিক ফলশ্রুতিরূপে বাংলাদেশও বিভক্ত হয়। বিভক্ত দেশের ভারতীয় অংশে কাল-ব্যাধি-কবলিত কবি নিশ্চেতন পড়ে রইলেন।

অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নিকণ্ঠ এই মহান কবি স্বদেশী শাসনের খণ্ডিত প্রভাতে স্বাধীনতার আলো-ঝলমল চাঁদোয়ার তলে কোথাও তাঁর নিজের আসনটি খুঁজে পেলেন না। তবু ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের চোখে পড়বার মত যে ব্যতিক্রমী নিদর্শন তখন একমাত্র নজরুলের ক্ষেত্রেই চিহ্নিত হলো, তা হচ্ছে, তাঁর দীনতম রোগশয্যা এবং ন্যূনতম গ্রাসাচ্ছাদনের আর্থিক ব্যবস্থায় যমজ অথচ বৈরী মনোভাবাপন্ন দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তানের প্রথম স্বেচ্ছাবুদ্ধক সহযোগিতা।

নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠা

সে যাই হোক, সব চেয়ে বড় দুঃখের বিষয় এই যে, কবির মৃতপ্রায় দৈহিক অস্তিত্বের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা যেখানে যা-ও-বা হলো, তাঁর সচেতন সৃষ্টিশীল জীবনের সার্থক পাঠের দুই যুগ পরেও উপমহাদেশের কোথাও, এমন কি বিভক্ত বাংলাদেশের যে-অংশে তিনি পড়ে রইলেন সেখানেও তাঁর মহনীয় ভাবমূর্তি এবং উজ্জ্বল অবদানের লালনের কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ দেখা গেল না। অবশেষে ১৯৬৪ সালে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় কবির গুণমুগ্ধ, ভক্ত ও সহচরদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলো নজরুল একাডেমী। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী-প্রতীম মহৎ ও উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনা ছিল এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মনে। কিন্তু প্রধানতঃ প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতির অভাবে আজো সে পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। এ পর্যন্ত নজরুল একাডেমী ন্যূনতম কর্মসূচী নিয়ে তার অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে মাত্র।

ভূমিকা ও অবদান

তবু আমরা মনে করি, ঢাকায় নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার ঘটনা একদিন ইতিহাসে তার যথামূল্য পাবেই। ইতিমধ্যেই তার যে ফলশ্রুতি, তাও কি দৃষ্টি এড়াবার মত? নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠা তার উদ্যোগ-আয়োজন এবং প্রারম্ভিক কার্যক্রমেই তার অস্তিত্বের মূল্য অনেকখানি প্রমাণিত করেছে। এদেশে, এবং ভারতেও, বিস্মরণ-ও-অবহেলার-কবলে-পড়ে-থাকা কবির প্রতি সরকার ও সুধীসমাজের মনোযোগ বৃদ্ধি, তাঁর ভূমিকা ও অবদানের চর্চা ও মূল্যায়নে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি এবং তাঁর স্মৃতিকে জাগরূক রাখার উদ্দেশ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও প্রধান জনপথ তাঁর নামাঙ্কিতকরণ—এর প্রায় সবই ১৯৬৪ সালে ঢাকায় নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার অনুগামী ঘটনা। তাই বলা যেতে পারে, নজরুল একাডেমীই উপমহাদেশের মনোজগতে নবপর্যায়ে নজরুল আন্দোলনের দ্যোতক।

কবির বাংলাদেশে আগমন

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। সম্ভবতঃ সেটাই ছিল সে-সরকারের সর্বাপেক্ষা জনচিত্তরঞ্জক কাজ। ঢাকা বিমান বন্দরে কবির বিমানের অবতরণ-কাল সম্পূর্ণ গোপন রাখা সত্ত্বেও সেদিন সেখানে দর্শনার্থী জনতার যে বিপুল সমাবেশ হয়েছিল তা যে-কোন দেশের যে-কোন কবির জন্য শ্লাঘার বিষয়। সরকার কবিকে ধানমণ্ডীর একটি সুসজ্জিত গৃহে সম্মানিত রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে রাখার ব্যবস্থা করেন। অবিরাম জনস্রোতের প্রবাহ বইতে

থাকে সেই কবি-তীর্থ অভিমুখে। সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশ যেন বহুযুগ পরে ফিরে পেয়েছে তার প্রবাসী প্রিয়তমকে নিজের বুকে—সবলব্ধ স্বাধীনতার প্রথম উপহার রূপে।

স্থায়ী হাসপাতাল শয্যা

কিন্তু পরিতাপের বিষয় সেই সরকারের আমলেই কোন কোন মহলের প্রবল পরামর্শে উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার নাম করে কবিকে ধানমণ্ডীর বাড়ী খালি করে স্থায়ীভাবে হাসপাতাল-শয্যা বরাদ্দ করা হয়। সে ব্যবস্থা অনেকেরই মনঃপূত হয়নি। নজরুল একাডেমীর তরফে আমরাও তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। হাসপাতালে লভ্য চিকিৎসার বিশেষ সুবিধাদি কবি-ভবনেই আয়োজন করা যেতো, অথচ কবি-ভবনের মুক্ত ও অন্তরঙ্গ পরিবেশের আবহ হাসপাতালে লভ্য নয় এবং সেটা তাঁর বিশেষ মর্যাদারও পোষক নয়,—এই ছিল আমাদের যুক্তি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা মেনে নিতে পারেননি। ফলে হাসপাতালের বদ্ধঘরে অপরিচিত ও স্বজনহীন পরিবেশে স্বভাবতঃই কবির স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে আর সেটাই নির্দিষ্ট করে দেয় তাঁর জন্য আমৃত্যু হাসপাতাল-বাসের নিয়তি।

উমা কাজী

ইতিপূর্বে পারিবারিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে কবির বহুদিনের নিবিষ্ট সেবিকা ও পুত্রবধূ উমা কাজী স্বামীর সংশ্রব ত্যাগ করে ঢাকায় অন্য বিবাহ করেন। কবির জ্যেষ্ঠপুত্র সব্যসাচীর সঙ্গে বিবাহের আগে থেকেই তিনি খোদ কবির সেবিকারূপে নিযুক্ত ছিলেন, এবং সব্যসাচী অথবা কবি পরিবারের অন্য কেউই ঢাকায় কবির কাছে থাকেন না—এই যুক্তিতে নতুন পরিস্থিতিতে উমা কর্তৃপক্ষের কাছে কবির সেবার অধিকার অব্যাহত রাখার আকুল আবেদন জানান। উমা কাজীর বৈবাহিক সম্পর্কের এই বিপর্যয়কে আমরা সমর্থন করিনি; কিন্তু যেহেতু জানতাম যে দুনিয়াতে এই একটি মানুষই আছে একমাত্র যার কাছে রুগ্ন ও বোধশূন্য কবি, বধূ-মাতা-কন্যার অক্লান্ত ও আন্তরিক সেবাযত্ন পেতে পারেন, সেজন্য কবির প্রতি ভালোবাসার নির্দেশেই আমরা সুপারিশ করেছিলাম উমার আবেদনের পক্ষে। কিন্তু কবি-গৃহ তত্ত্বাবধানের কর্তৃপক্ষীয় ত্রুটির ছিদ্রপথে ততদিনে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যার সুরাহার সব পথই হয়েছিল বন্ধ, এবং পরিণতি হয়েছিল উমার চূড়ান্ত বিদায়, কবির যাবজ্জীবন হাসপাতাল বাস এবং খোদ কবি-ভবনেরই অবলুপ্তি। কে না জানতো—৩০।৩৫ বছর রোগশয্যাগ্রস্ত কবি শীগ্‌গির একদিন বিদায় নেবেন; আমরা তাঁকে ধরে রাখতে পারব না—ঘরেও না, হাসপাতালেও না। কিন্তু সেই তিনি গেলেন, তবে গেলেন হাসপাতালে দু'বছর বন্দীদশা ভোগ করে। তাঁকে বরাদ্দ করা বাড়ীটি হাত বদলে কোথা হতে কোথায় গেল; আর আমরা কবিকে হারাবার সাথে সাথে হারালাম জাতীয় ঐতিহ্যের সম্ভাব্য এক মহামূল্য সম্পদ 'কবি-ভবন'।

একাডেমীর উন্নয়ন

পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত সরকার পরম্পরায় অনেক পদস্থ ব্যক্তিই এতকাল ধরে নজরুল একাডেমীর উন্নয়ন সম্পর্কে আমাদের কর্ণবেণী আশার বাণী শুনিয়েছেন। আশার বুক বেঁধে সব সরকারের কাছেই আমরা এ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা এবং এর যথাযোগ্য

উন্নয়নের পরিকল্পনা পেশ করে এসেছি। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। একাডেমীর অবস্থারও কোন ইতর বিশেষ হয়নি। হতাশ হয়ে ভেবেছি, এর কারণ কি? নজরুল যে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে কতখানি এবং তাঁর অবদান ও ভাব-মূর্তির চর্চা, লালন ও সংরক্ষণের প্রয়াস আমাদের জাতীয় জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভবতঃ সে কথা পদাধিকারী ব্যক্তিদের আমরা ঠিকমতো বুঝাতে পারিনি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে, তাঁদের বুঝানোর দায় কি শুধুই আমাদের? এর গুরুত্ব তাঁরা নিজে কেন বুঝবেন না? নজরুল একটি জাতীয় বিষয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, মানবিক বিষয়। নজরুল আমাদের গর্ব, আমাদের পরিচয়। তাঁরা কি সে কথা জানেন না? তাঁরা কি বলতে পারেন—বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে আর কোন্ ব্যক্তিত্বকে আমরা অধিকতর জীবন্ত প্রেরণারূপে পাব? আর কাকে আমরা বিশ্ব-সভায় আমাদের গৌরবের মহত্তর নিদর্শনরূপে তুলে ধরতে পারব? মনে হয় তাঁরা এসব সামান্য জিনিষ ভাবেন না; কারণ পদস্থ হয়ে তাঁদের মাথায় ভাবনার অন্যান্য সব অসামান্য বিষয় থাকে।

সরকারী সাড়া

বর্তমান সরকারের আমলে নজরুল একাডেমী কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান এবং তাঁকে জাতীয় কবি হিসাবে ঘোষণার প্রস্তাব দিয়েছিল। সরকার সে ডাকে সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানিকভাবে কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেছেন। নজরুল ইসলাম আগে থেকেই জাতীয় কবির মহিমায় বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ের আসনে আসীন হয়েছিলেন। সম্ভবত: তাই কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা না রেখেই সরকারের তরফ থেকেও তাঁকে সর্বতোভাবে জাতীয় কবির উপযুক্ত মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

একাডেমীকে গৃহ বরাদ্দ

স্বাধীনতার পরে বহু বাড়ী-ঘর পরিত্যক্ত সম্পত্তিরূপে ঘোষিত হয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে তা এন্তার বরাদ্দ করা হতে থাকে। তদানীন্তন সরকারের কাছে নজরুল একাডেমীর জন্য আমরা একটি উপযুক্ত বাড়ী বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছিলাম। কর্তৃস্থানীয় কেউ কেউ তা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাসও দেন। কিন্তু প্রশাসনিক স্তরে যাঁদের উপরে সে আশ্বাস কার্যকরী করার ভার, তাঁদের সহযোগিতা লাভে আমরা ব্যর্থ হই। অবশেষে বর্তমান সরকারের কাছ থেকে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমরা একাডেমীর জন্য মগবাজার বেলালাবাদ কলোনীর বর্তমান বাড়ীটির বরাদ্দ লাভ করি।

এ প্রসঙ্গে প্রধান সামরিক আইন পরিচালকের প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার ব্রিগেডিয়ার নূরুল ইসলামের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করা আমি কর্তব্য মনে করি। প্রধানতঃ এঁরই কল্যাণে, কয়েক বছরে যা সম্ভব হয়নি, কয়েকদিনের মধ্যে তাই সম্ভব হলো। এঁর সহযোগিতায় নজরুল একাডেমী তার সঙ্কট-মুহূর্তে শুধু যে বাড়ী বরাদ্দ এবং প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কিছু অনুদান পেয়েছে তাই নয়, কবির সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাব সমূহ এবং নজরুল একাডেমী সংক্রান্ত উন্নয়ন-পরিকল্পনাও এঁরই মাধ্যমে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করতে সক্ষম হই।

নতুন আশাবাদ

কিছুদিন আগে বঙ্গভবনের এক অনুষ্ঠানে মহামান্য প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার ক্ষণিক আলাপের সুযোগ হয়েছিল। আমার তো প্রসঙ্গ একটিই : নজরুল একাডেমী। দু'এক কথা হতেই তিনি বললেন, "আমি জানি। এ-প্রতিষ্ঠানকে উন্নত করতে হবে।" শুনেছি প্রেসিডেন্ট জিয়া এক কথার মানুষ। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত কথাটা আমাকে নতুন আশার তড়িৎ-স্পর্শ দিয়েছিল। কারণ, ইতিমধ্যেই আমাদের আশাবাদে আবার কিছু অবশতার ছোঁয়া লেগেছিল। এখানে সে-বিষয়েও কিছু আলোকপাত করতে চাই।

জাতীয় নজরুল স্মৃতি কমিটি

কবির মৃত্যুর কিছুদিন পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য সরকারী উদ্যোগে 'জাতীয় নজরুল স্মৃতি কমিটি' গঠন করা হয়েছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভূতপূর্ব উপদেষ্টা অধ্যাপক আবুল ফজল ছিলেন সে কমিটির সভাপতি। সরকারী-বেসরকারী অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমাকেও সে কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিটির প্রথম বৈঠকে এর কর্মসূচী নিয়ে যে আলোচনা হয়, তাতে ছিল কবির মাজারে উপযুক্ত স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ব্যবস্থা। এ উদ্দেশ্যে সেই সভাতেই প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ ও স্মৃতি-সৌধের নক্সা প্রণয়ন বিষয়কে দু'টি সাবকমিটি করে দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে অনুষ্ঠিত কমিটির দ্বিতীয় সভায় একটি নতুন বিষয় কমিটির কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হলো : কবির সাহিত্য ও সঙ্গীতের উপরে গবেষণা, সংকলন প্রকাশনা, ইত্যাকার সব কাজ—যা নজরুল একাডেমীর বিঘোষিত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত—এই কমিটিই করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

নতুন বিড়ম্বনা

একাডেমীর আরব্ধ এবং উদ্দিষ্ট এসব কর্মসূচী ও তার বাস্তবায়নে সরকারী সহায়তা বিষয়ে ইতিপূর্বে আমি একাধিকবার মাননীয় উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলেছি; তা ছাড়া প্রথম সভাতেই আমি একাডেমীর কর্মসূচী, সম্পন্ন ও আরব্ধ কাজ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাগজ-পত্র সভাপতিসহ সকল সদস্যের কাছে পেশও করেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় সভায় উপস্থিত হয়ে তার এই ফলাফল দেখে আশ্চর্য হলাম। আমাকে সামনে রেখেই নজরুল একাডেমীকে এভাবে উপেক্ষা করা হলো, এমন কি, কেউ তার নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করলেন না দেখে আহতও হলাম। এই নতুন কর্মসূচীর জন্য যে পৃথক সাব কমিটি গঠন করা হলো তাতে অবশ্য অনুগ্রহপূর্বক আমার নামটাও রাখা হলো। দু' একজন সদস্যই এ বিষয়ে উদ্যোক্তার ভূমিকা নিলেন, এবং অন্যদের কোন বক্তব্য ছিল না বলে অনায়াসে সব কিছু পাস হয়ে গেল। একাডেমীর বিষয়ে আমাদের এতদিনের সকল আবেদন-নিবেদনই অরণ্যে-রোদনে পর্যবসিত হয়েছে এবং তার দুঃখ ও হতাশা আমাদের হজম করতে হয়েছে। কাজেই আজকের সভায় একটা প্রতিযোগী প্রস্তাব পাস হলেই যে তার ফলে নজরুল একাডেমী মাঠে মারা যাবে—এমন কোন নতুন আশঙ্কা অবশ্য আমাকে আক্রমণ করলো না। তবে লোকে যে বলে—বাঙালীর স্বভাবই এই, কাজের কাজ কেউ কিছু করবে না, তবে সত্যি সত্যি কেউ কিছু করতে গেলে তাকে ভণ্ডুল করার লোকের অভাব হবে না,—সে বিষয়ে আর একটা নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

স্মৃতি-কমিটির সিদ্ধান্ত

যাই হোক, আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে আলাপের কয়েক দিন পরেই শিক্ষা-সংস্কৃতির উপদেষ্টা পদে অধ্যাপক আবুল ফজলের স্থলাভিষিক্ত হলেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির প্রথম সভাতেই আবার একটি নতুন ঘটনা ঘটলো। স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজই কমিটির মূল লক্ষ্য, অথচ সেদিকে কোনই অগ্রগতি হয়নি দেখে তার উপরেই তিনি গুরুত্ব দিলেন। তাঁর সরাসরি জিজ্ঞাসা ছিল—স্মৃতি কমিটি কি নজরুল বিষয়ে চর্চা ও গবেষণার জন্য নতুন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চান? সেজন্য তো বাংলা একাডেমী, নজরুল একাডেমী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।—দেখলাম একথার কোন জবাব এলো না। নতুন করে সিদ্ধান্ত হলো : কমিটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে মনোযোগী হবে; বাংলা একাডেমী, নজরুল একাডেমী এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহের বাংলা বিভাগ কবির সাহিত্য-কর্মের উপর গবেষণা চালিয়ে যাবে; এবং নজরুল একাডেমী কবির গানের স্বরলিপি প্রকাশের ব্যবস্থা নেবে। সরকার এসব কাজে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা দেবেন।

নতুন উপদেষ্টার বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গীতে উৎসাহিত হয়ে, পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি একাডেমীর আশু সমস্যাদি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আনুপূর্বিক আলাপ-আলোচনা করেছি। নজরুলের ব্যাপারে সর্বোচ্চ ও কেন্দ্রীয় মর্যাদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়েই নজরুল একাডেমীর বাঞ্ছিত উন্নয়ন সাধন করা যায় কিনা, সেদিকে, আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি এবং সে-প্রশ্নে তাঁকে সহানুভূতিশীলই দেখতে পেয়েছি।

শেষ নিবেদন

একটি সমন্বিত, পূর্ণাঙ্গ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা নিয়েই বেসরকারী উদ্যোগে আমরা নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। বাংলাদেশে নজরুলের জাতীয় কবির মর্যাদা লাভ এবং মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহের প্রতি সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনের ঘটনাবলী এখন সঙ্গতভাবেই নজরুল একাডেমীর পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা দাবী করে। স্বভাবতঃই বে-সরকারী প্রয়াস আর এ প্রতিষ্ঠানকে কার্যকরী অভিভাবকত্ব বা প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি দিতে পারে না। তার দায়িত্ব এখন জনগণের সরকারকেই নিতে হবে। আমরা শুধু এই আশা করব যে, সরকারী ছত্র-ছায়ায় নজরুল একাডেমীকে তার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট মর্যাদায় একটি সমন্বিত ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই যথাযোগ্য উন্নয়নের আওতায় আনা হবে; কোন মহলের স্বার্থান্ধ বা অবিবেচনা-প্রসূত পরামর্শে এর বিচিত্র ও ব্যাপক কর্মকাণ্ডকে বিভক্ত করে অন্যান্য সরকারী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। কেননা, তাতে এই মহান জাতীয় কবির অমর্যাদা হবে। এ শুধু আমাদের অভিমত নয়, আমরা নিশ্চিত যে কবি-ভক্ত সমগ্র দেশবাসীও তাই চায়। কেননা নজরুলের মতো কবির প্রকৃত স্মৃতি-কেন্দ্র তাঁর কবর নয়, সে হচ্ছে তাঁর অমর ভূমিকা ও অবদানের চর্চা, সম্প্রচার ও সংরক্ষণের উন্নত শীর্ষ জাতীয় প্রতিষ্ঠান—জাগ্রত ও জীবন্ত 'নজরুল একাডেমী'।

নজরুল একাডেমী

উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী

জাতীয় ভিত্তিতে নজরুল-কেন্দ্রিক একটি সমন্বিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা ও রূপরেখা নিয়ে ১৯৬৪ সালের মে মাসে নজরুল একাডেমী সংগঠনী পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে এ প্রতিষ্ঠান একটি সমিতি হিসাবে বিধিবদ্ধ করা হয়। একাডেমীর সংবিধানে নিম্নরূপ উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী লিপিবদ্ধ হয়:

১। নজরুলের সমগ্র রচনা ও জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ, সংকলন, গবেষণা ও প্রকাশনা।

২। নজরুল গীতির বাণী ও সুর সংগ্রহ, সংকলন, স্বর-লেখন ও প্রকাশনা।

৩। নজরুল গীতির চর্চা, প্রশিক্ষণ, প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ এবং নজরুল-গীতির নতুন রেকর্ডিং।

৪। সাহিত্য ও সংগীতে নজরুলের অমর সৃষ্টিসম্ভার অনুবাদ, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও অন্যান্য মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে তুলে ধরা।

৫। নজরুল সৃষ্টিসম্ভারের মূল্যায়ন ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষণা, চিন্তাধারা ও সৃষ্টিশীলতার নিয়মিত প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে একাডেমীর মুখপত্র প্রকাশ।

৬। বিশেষভাবে নজরুলের অবদান ভিত্তিক এবং সাধারণভাবে দেশের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যনির্ভর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রগতিশীল বিকাশের উপযোগী কার্যক্রম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা।

৭। একাডেমীর উদ্দেশ্য ও আদর্শের সহায়ক গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং একটা পূর্ণাঙ্গ মুদ্রণ ও প্রকাশনালয় প্রতিষ্ঠা।

৮। অধ্যয়ন, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সুবিধাবিধানের জন্য লাইব্রেরী, পাঠাগার, বিদ্যালয়, মিলনায়তন নাট্যমঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ, ষ্টুডিও ইত্যাদিসহ সমন্বিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, 'নজরুল ভবন' নির্মাণ।

৯। একাডেমীর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সহায়ক অন্য যে কোন প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ।

সম্পন্ন ও আরব্ধ কাজ

সংগ্রহ, সংকলন ও গবেষণা

* ১০০০ অপ্রচলিত ও দুষ্প্রাপ্য গান, ৪০০ গানের আদি রেকর্ড এবং কবির স্বহস্ত-লিখিত কিছু সংখ্যক রচনার পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছে।

* বিভিন্ন সূত্র ও পত্র-পত্রিকা থেকে কবির জীবনী ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণামূলক বহুসংখ্যক প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, আলোকচিত্র ও তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে।

* প্রায় ২০০০ গানের বর্ণানুক্রমিক সূচী এবং প্রায় ৮০০ গানের স্বরলিপির বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রণীত হয়েছে।

স্বরলিপি প্রণয়ন ও সংগ্রহ

* প্রায় ৪০০ গানের স্বরলিপি প্রস্তুত হয়েছে এবং আরো ৪০০ গানের স্বরলিপি সংগৃহীত হয়েছে।

প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকা

* নজরুল একাডেমী পত্রিকা (ত্রিমাসিক): এ পর্যন্ত ১৪টি বিপুলাকার সংখ্যা প্রকাশিত।

* নজরুল গীতি: ৫ খণ্ড। প্রতিখণ্ডে অপ্রকাশিত অথবা অসংকলিত ১০০টি করে গান ছাপা হয়েছে।

* শব্দধানুকী নজরুল ইসলাম: শাহাবুদ্দীন আহমদ প্রণীত নজরুল-কাব্যের শব্দশৈলী বিষয়ক প্রবন্ধ পুস্তক।

* নজরুল কাব্যে শিল্পরূপ: মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ প্রণীত নজরুল-কাব্যের শিল্পোৎকর্ষ-সংক্রান্ত আলোচনা গ্রন্থ।

* নজরুল ইসলাম/কবি ও কবিতা: আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রণীত নজরুল কাব্যের মূল্যায়ন মূলক প্রবন্ধ সংগ্রহ।

* নজরুল জয়ন্তী (পুস্তিকা) ৫টি।

* বিজয়ী বাংলাভাষা: একুশে ফেব্রুয়ারী (পুস্তিকা)

* মুক্তনিশি ভোরে: বিজয় দিবস (পুস্তিকা)

প্রকাশের অপেক্ষায় প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি

* নজরুল স্মৃতিকথা: (সংকলন) নজরুলের জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে নজরুলের বন্ধু ও সমসাময়িক লেখকের স্মৃতি-চারণ।

* নজরুল দর্পণে নজরুল: শাহাবুদ্দীন আহমদ প্রণীত প্রবন্ধ পুস্তক। নজরুলের জীবন ও বাণীর মুকুরে নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা।

* নজরুল-সাহিত্যের নিরীক্ষা (প্রবন্ধ সংকলন) : প্রখ্যাত লেখকদের নজরুল-সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণামূলক রচনার সংকলন।
* নজরুল-কাব্যে ছন্দ : আবদুল কাদির প্রণীত। নজরুল-কাব্যের ছন্দ-সম্পর্কিত গবেষণামূলক গ্রন্থ।
* নজরুল গীতি : ৫ খণ্ড। প্রতিখণ্ডে অপ্রকাশিত ও অসংকলিত ১০০টি করে গান।
* নজরুল স্বরলিপি : ১০ খণ্ড। প্রতিখণ্ডে ৩০টি করে স্বরলিপি।
* নজরুলের ইসলামী গান: সংকলন)।

আশু প্রকাশনা প্রকল্প :

* নজরুলগীতি সম্ভার : কবির সমগ্র গীত-রচনা সংগ্রহ। প্রথম দুই খণ্ডে ২০০০ গান থাকবে।
* নজরুল-জীবনী : ২ খণ্ডে বিশদভাবে লিখিত কবির প্রামাণ্য জীবনী।
* নজরুল-গীতি সমীক্ষা : নজরুল-গীতির বাণী ও সুরের ঐশ্বর্য সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংকলন।
* নজরুলের শ্রেষ্ঠ কবিতা : নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন।
* The Rebel Poet of Bengal : ইংরেজী ও আরবী ভাষায় নজরুলের কবি-পরিচিতি ও নির্বাচিত রচনার অনুবাদ।

গ্রন্থাগার

নজরুল একাডেমীর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা হয়েছে। নজরুলের এবং নজরুল-বিষয়ক তাবৎ গ্রন্থাদিসহ কয়েক হাজার বই-পত্র সংগৃহীত হয়েছে।

সুর সত্যায়ন পরিষদ

নজরুল গীতির সুর-বিকৃতি রোধ এবং গানের প্রামাণ্য স্বরলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশের কাজকে সুগম করার জন্য নজরুল-গীতির 'সুর-সত্যায়ন পরিষদ' গঠন করা হয়েছিল। এ পরিষদের সদস্য-ভুক্ত হয়েছিলেন—কমলদাশগুপ্ত, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, ফিরোজা বেগম, সোহরাব হোসেন, বেদারউদ্দীন আহমদ, শেখ লুৎফর রহমান, সুধীন দাস, রফিকুল ইসলাম, ফেরদৌসী রহমান, মোস্তফা জামান আব্বাসী, এ. এইচ. সাইদুর রহমান, আবদুস সাত্তার হক প্রমুখ। বিভিন্ন কারণে পরিষদের কাজ বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। সম্প্রতি সরকার কর্তৃক নজরুল একাডেমীকে নজরুল-গীতির স্বরলিপি প্রকাশের দায়িত্ব অর্পণের প্রেক্ষিতে বর্তমানে সে পরিষদ পুনর্গঠন ক'রে পূর্ণোদ্যমে কাজ করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

সম্মানিত জীবন সদস্য

কবি মোজাম্মেল হক, ইবরাহীম খাঁ, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, আকবরউদ্দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, সুফী জুলফিকার হায়দার, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন,

আবদুল কাদির, জসীমউদ্দীন, বেনজীর আহমদ, আবুল ফজল, সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদীন, মোহাম্মদ মোদাব্বের, মুজিবুর রহমান খাঁ, আলিম হোসেন, এ, কে, এম, নুরুল ইসলাম প্রমুখকে নজরুল একাডেমীর সম্মানিত জীবন সদস্য পদ প্রদান করা হয়েছে।

নজরুল একাডেমী স্বর্ণপদক

নজরুল বিষয়ে গবেষণায় আবদুল কাদিরকে, নজরুল জীবনী রচনায় খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে এবং নজরুল গীতিচর্চায় সোহরাব হোসেনকে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিসূচক নজরুল একাডেমী স্বর্ণপদক দেওয়া হয়েছে।

গ্রামোফোন রেকর্ডিং

একাডেমীর উদ্যোগে বাংলাদেশের শিল্পীদের দিয়ে নজরুল গীতির নতুন গ্রামোফোন রেকর্ড করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শেখ লুৎফর রহমানের পরিচালনায় প্রথমে একাডেমীর শিল্পীদের দিয়ে 'চল্ চল্ চল্', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'কারার ঐ লৌহ কপাট' ও 'শিকল পরা ছল'—এই চারটি কোরাস গান রেকর্ড করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রেকর্ডগুলো স্বাধীন বাংলা বেতার কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

নজরুল-গীতির প্রশিক্ষণ

নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই একাডেমীর সংগীত বিদ্যালয়ে বিশেষ সুনামের সঙ্গে নজরুল গীতি ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বিশেষ প্রশিক্ষণের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে নজরুল একাডেমী থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অনেক শিক্ষার্থী বিশিষ্ট শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

একাডেমীর সঙ্গীতানুষ্ঠান ও আলোচনানুষ্ঠানসমূহ সুধী মহলের বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে। স্বতঃস্ফূর্ত নজরুল বিষয়ক উপলক্ষগুলো নজরুল একাডেমী বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উদ্‌যাপন করে থাকে। কয়েকবার এসব উপলক্ষে একাডেমী ৩ দিন থেকে সপ্তাহ ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেক বিদেশী অতিথি এবং অতিথিশিল্পী অংশ গ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে [illegible], নাজাকত আলী-সালামত আলী, কমরেড মুজফফর আহমদ, প্রবোধকুমার সান্যাল, আঙুর বালা দেবী, দীপালী নাগ, চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শংকরলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

নজরুল একাডেমী

পাঁচসালা উন্নয়ন পরিকল্পনা

লক্ষ্য

প্রধানতঃ জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের অবদানরাজি এবং তাঁর ভাবানুভূতির ব্যাপক চর্চা, উপস্থাপন মূল্যায়ন, গবেষণা, সংকলন, প্রকাশনা এবং সংরক্ষণের জন্য, এবং সাধারণভাবে জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে, যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্র হিসাবে, একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থায় উন্নয়নের রূপ-রেখা নিয়ে, নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বর্তমান অবস্থা

অতীতের সরকার সমূহের কাছ থেকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ার ফলে নজরুল একাডেমী এ যাবৎ নিয়মিত কর্মসূচী এবং লক্ষ্যপথে জোরালো সাফল্য নিয়ে কোনমতে অস্তিত্ব রক্ষা করে যাচ্ছে।

আশাবাদ

বর্তমান সরকার কবির প্রতি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এবং পরে অভূতপূর্ব ভালবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন রেখেছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা যা করেছেন, তাতে জাতীয় ইচ্ছা ও আবেগেরই প্রতিফলন ঘটেছে। সে জন্য আশা করা যায় যে জাতীয় কবির ভাবানুভূতিকে স্থায়ীরূপে জাগ্রত রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নজরুল একাডেমী যাতে তার উদ্দিষ্ট কর্মসূচী পুরাপুরি বাস্তবায়িত করতে পারে তার জন্য সরকারের তরফ থেকে সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

প্রয়োজনীয় সরকারী সহযোগিতা

নজরুল একাডেমীকে তার পূর্ণ অবয়বে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের তরফ থেকে নিম্নলিখিত কার্যক্রম অবলম্বনের জন্য অনুরোধ ও সুপারিশ করা যাচ্ছে:

১। জাতীয় কবির নামের উচ্চ মর্যাদা উপযোগী দেশের একটি প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হতে হলে নজরুল একাডেমীর জন্য উপযুক্ত গৃহ-সংস্থান প্রয়োজন। এজন্য একাডেমীকে মিলনায়তন, প্রেক্ষাগৃহ, নাট্যমঞ্চ, বক্তৃতামঞ্চ, স্টুডিও, গ্রন্থাগার, সংরক্ষণাগার, অফিসকক্ষ, বিদ্যালয়, মুদ্রণালয়, প্রদর্শনী

কক্ষ, বিক্রয় কেন্দ্র ইত্যাদির স্থান সঙ্কুলানের জন্য সর্বাঙ্গীন 'নজরুল ভবন' নির্মাণের উপযোগী প্রশস্ত জমি বরাদ্দ করা দরকার।

> সম্প্রতি মগবাজারস্থিত বেনারসাদ কলোনীর একটি অংশ নজরুল একাডেমীকে বরাদ্দ করা হয়েছে। বেনারসাদ কলোনী একটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি। এতে প্রায় এক একর জমির উপরে কয়েকটি পুরনো দালান রয়েছে। এই পুরো সম্পত্তিটি নজরুল একাডেমীকে স্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তিতে লীজ দেওয়া যেতে পারে। শহরের কেন্দ্রস্থলে সাধারণ সড়ক পরিবহনের সুবিধাযুক্ত এলাকায় অবস্থিত বলে, এবং পার্শ্ববর্তী আরও কিছু জমিতে এর সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে বলে, এই স্থানটি 'নজরুল ভবন' নির্মাণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে।

২। একটি পাঁচসালা উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে একাডেমীর অফিস ও সাধারণ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয় বাবদ বছরে ১০,০০,০০০'০০ (দশ লক্ষ) টাকা পৌনঃপুনিক গ্রান্ট এবং এর উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়নে অর্থ সংস্থানের জন্য মোট ৩,০০,০০,০০০'০০ (তিনকোটি) টাকার উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

৩। নিম্নলিখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার নজরুল একাডেমীকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আইনগত সহযোগিতা প্রদান করবেন :

(ক) বাংলাদেশের আওতায় নজরুলের সকল লেখা ও রচনার স্বত্ব সম্পূর্ণভাবে নজরুল একাডেমীর কর্তৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে থাকবে। সেজন্য নজরুলের সর্বপ্রকার রচনার প্রকাশনা, রেকর্ড উৎপাদন, পরিবেশন, উপস্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে যে-কোন প্রকার অর্থকরী ব্যবহার নজরুল একাডেমীর পূর্ব অনুমোদন এবং আর্থিক চুক্তি-সাপেক্ষ হবে।

(খ) বাংলাদেশে নজরুল-গীতির স্বরলিপি প্রস্তুত, সংকলন, সুর সংরক্ষণও প্রকাশন ব্যবস্থাদি সর্বতোভাবে নজরুল একাডেমীর কর্তৃত্ব ও অধিকারভুক্ত হবে।

(গ) গ্রামোফোন, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা প্রভৃতিসহ সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা —যারা বাংলাদেশে যে-কোন ভাবে নজরুল গীতির প্রশিক্ষণ, পরিবেশন, রেকর্ড উৎপাদন এবং বাণিজ্য পুনরুৎপাদন প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা সকলেই নজরুল-গীতির বাণী ও সুরের ব্যাপারে নজরুল একাডেমীর কর্তৃত্বমূলক নিয়ন্ত্রণের অধীন হবেন।

মন্তব্য

আশা করা যাচ্ছে যে, সরকারের উপরোল্লেখিত সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্যজনক বাস্তবায়ন সম্ভব হলে পাঁচ বছর পরে নজরুল একাডেমী নিজের পায়ে নিজের চলার মতো আর্থিক স্বয়ম্ভরতা লাভ করবে।

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

[সংক্ষিপ্ত রূপরেখা]

(ক) প্রকাশনা

		আনুমানিক ব্যয়
১।	দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ নজরুল রচনাবলী ..	টা, ১০,০০,০০০.০০
২।	পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ নজরুল গীতসম্ভার ..	টা, ৫,০০,০০০.০০
৩।	বিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ নজরুল-স্বরলিপি ..	টা, ১০,০০,০০০.০০
৪।	দুইখণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য নজরুল জীবনী ..	টা, ২,০০,০০০.০০
৫।	ইংরাজী ও আরবী ভাষায় নির্বাচিত রচনার অনুবাদ সহ নজরুল-পরিচিতি : ২টি প্রকাশনা	টা, ১,৫০,০০০.০০
৬।	কবির অবদান ও চিন্তাধারার মূল্যায়ন, গবেষণা, ব্যাখ্যা ও তুলনামূলক আলোচনার ত্রিশটি বই ..	টা, ৭.৫০,০০০.০০
৭।	নজরুল-রচনার বিভিন্ন বিষয়বস্তু-ভিত্তিক বিশটি সংকলন	টা, ৫,০০,০০০.০০

(খ) সংগ্রহ ও গবেষণা

১।	কবির জীবন ও চিন্তাধারা সংক্রান্ত উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ	
২।	কবির স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ..	টা, ৫,০০,০০০.০০
৩।	কবির অসংকলিত রচনা সংগ্রহ ..	

(গ) স্বরলিপি প্রণয়ন

১।	নজরুল-গীতির স্বরলিপি সংগ্রহ ও প্রণয়ন ..	
২।	নজরুল-গীতির আদি গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ ..	টা, ৭,৫০,০০০.০০
৩।	নজরুল গীতির সুর-সম্পাদন : নজরুল মিউজিক বোর্ড	

(ঘ) রেকর্ডিং ষ্টুডিও

টেপ ও গ্রামোফোন রেকর্ড প্রস্তুতের সাজ-সরঞ্জাম .. টা, ৫,০০,০০০.০০

(ঙ) লাইব্রেরী ও পাঠাগার

নজরুলের/নজরুল-বিষয়ক এবং অন্যান্য বই-পত্র .. টা, ১,০০,০০০.০০

(চ) নজরুল ভবন

মিলনায়তন, বক্তৃতাকক্ষ, নাট্যকক্ষ, প্রেক্ষাগৃহ, ষ্টুডিও, লাইব্রেরী, পাঠাগার সংরক্ষণাগার, অফিস কক্ষ, বিদ্যালয়, মুদ্রণালয় প্রভৃতি বিভাগ সহ 'নজরুল-ভবন' নির্মাণ টা, ১,৫০,০০,০০০.০০

(ছ) সাজ-সরঞ্জাম

যন্ত্রপাতি, বাদ্যযন্ত্র, সাজ-সজ্জা, আসবাব, ফিটিং ও ফিক্শ্চার টা, ২৫,০০,০০০'০০

(জ) মুদ্রণালয়

মুদ্রণালয় (ব্লক তৈরী ও প্যাকেজিং ব্যবস্থা সহ) .. টা, ৫০,০০,০০০'০০

(ঝ) স্মৃতি-শালা ও সংরক্ষণাগার

হস্তলিপি, পাণ্ডুলিপি, আলোকচিত্র, টেপ, গ্রামোফোন
রেকর্ড ও স্মৃতি-নিদর্শনাদি সংরক্ষণ .. টা, ২,০০,০০০'০০

(ঞ) প্রশিক্ষণ ও পরিবেশন

সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য প্রশিক্ষণ, পরিবেশন এবং সাংস্কৃতিক
অনুষ্ঠান উন্নয়ন .. .. ৫,০০,০০০'০০

(ট) যান-বাহন

মাইক্রোবাস, পিকআপ ভ্যান ও অফিস কার .. টা, ৫,০০,০০০'০০

(ঠ) হিসাব বহির্ভূত ও অতিরিক্ত .. . টা, ৩,৫০,০০০'০০

সর্বমোট : টা, ৩,০০,০০,০০০'০০

তিন কোটি টাকা মাত্র]

নজরুল একাডেমী

প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ-রেখা

মহাপরিচালক

পরিচালক
প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ

[দফতর, হিসাব, তহবিল, বিক্রয় ও বিতরণ, যানবাহন ও 'নজরুল ভবনের' বিভিন্ন বিভাগ] আধিকারিক, তত্ত্বাবধায়ক, হিসাব রক্ষক, সহকারী, করণিক, মুদ্রাক্ষরিক, মন্ত্রী, মিস্ত্রী, গাড়ীচালক, পিয়ন, ফরাস, দারওয়ান।

সচিব
সার্বিক তত্ত্বাবধান

[সংগঠন, প্রকল্প, নির্মাণ, পরিচালনা, নিয়োগ এবং স্বত্ব ও সম্পত্তি তত্ত্বাবধান] অধিকারিক, প্রকৌশলী, ব্যক্তিগত সচিব, ব্যক্তিগত সহকারী, সহকারী, করণিক, মুদ্রাক্ষরিক, পিয়ন।

পরিচালক
সাহিত্য ও সঙ্গীত বিভাগ

[গবেষণা, সংগ্রহ, অনুবাদ, প্রণয়ন, সংকলন, সুর-সত্যায়ন (মিউজিক বোর্ড), স্বরলিপি প্রণয়ন, সঙ্গীত বিদ্যালয় (সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য প্রশিক্ষণ)] আধিকারিক, অধ্যক্ষ, শিক্ষক, গবেষক, বিশেষজ্ঞ, সংকলক, সংগ্রাহক, অনুবাদক, সহকারী, করণিক, মুদ্রাক্ষরিক, পিয়ন, দফতরী।

পরিচালক
মুদ্রণ ও প্রকাশনা, বিভাগ

[প্রকাশনা, মুদ্রাণলয়, ষ্টুডিও ও নজরুল একাডেমী পত্রিকা] আধিকারিক, সম্পাদক, ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক, সহকারী, প্রুফ-রীডার, প্রেস ও ষ্টুডিও কর্মচারী, করণিক, মুদ্রাক্ষরিক, দফতরী, পিয়ন।

পরিচালক
সংস্কৃতি ও গণ-সংযোগ বিভাগ

[অনুষ্ঠান প্রযোজনা, উপস্থাপনা পরিবেশন, সভা-সম্মেলন, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, গণ-সংযোগ, গ্রন্থাগার ও পাঠাগার] আধিকারিক, প্রযোজক, ব্যবস্থাপক, গ্রন্থাগারিক, সহকারী, করণিক, মুদ্রাক্ষরিক, পিয়ন।

মন্তব্য : উন্নয়নের প্রাথমিক স্তর থেকে পর্যায়ক্রমে ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগ ও শাখায় কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। অবশ্য প্রকল্পসমূহের কাজের জন্য বহু ধরনের বিশেষজ্ঞের কাজ পার্ট-টাইম ভিত্তিতে এবং সম্মানী ও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বাইরের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করাতে পারা যাবে।

সাধারণ ও নিয়মিত কর্মসূচী যথা সঙ্গীত বিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সভা-সেমিনার, নজরুল একাডেমী পত্রিকা এবং সীমিত স্তরে সংগ্রহ, গবেষণা, সংকলন, স্বরলিপি প্রণয়ন, পুস্তক প্রকাশনা, গ্রন্থাগার ইত্যাদি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী, অফিস, বাড়ী ভাড়া ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপারে পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রতি বছর গড়ে ১০,০০০,০০'০০ (দশ লক্ষ) টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।
স্বভাবতঃই একাডেমীর বিভিন্ন কর্মসূচীর পরিচালন-ব্যয় প্রারম্ভকালীন অবস্থা থেকে উন্নয়নের স্তরে স্তরে বাড়তে থাকবে। বার্ষিক গড় হিসাবে ধরা দশ লাখ টাকা ব্যয়ের উপরে বিভিন্ন খাতে প্রয়োজনীয় অধিক ব্যয়ের জন্য বাড়তি তহবিল উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রদর্শিত বরাদ্দ থেকে পাওয়া যাবে।

নজরুল একাডেমী

বর্তমান নির্বাহী পরিষদ

সভাপতি : কাজী আনোয়ারুল হক

সহ-সভাপতি : আবুল কালাম শামসুদ্দীন
আবদুল কাদির
মোহাম্মদ আজরফ

সাধারণ সম্পাদক : তালিম হোসেন

কোষাধ্যক্ষ : মুশতাকুর রহমান শিকদার

সদস্য : লুৎফর রহমান সরকার, মোস্তফা কামাল (বার-এট-ল), ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, ডক্টর রফিকুল ইসলাম, মুহম্মদ আসফউদ্দৌলা, লায়লা আরজুমান্দ বানু, জাহানারা আরজু, মাফরুহা চৌধুরী, খালেদা হাবীব, সিদ্দিকুর রহমান, খোন্দকার শাহাদৎ হোসেন, এরতাজ আলম, সৈয়দ জাফর আলী, মাইজউদ্দীন আহমদ।

<u>বিভিন্ন সময়ে যাঁরা নির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব পালন করেছেন</u> এ. কে. এম. নূরুল ইসলাম

আবদুল মওদুদ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, আকবর উদ্দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর, বেনজীর আহমদ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, মুজীবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ নাসির আলী, শামসুল হুদা চৌধুরী, এ. এস. নূর মোহাম্মদ, কাজী মজহুল হক, এ. আর. ভূঁইয়া, এম. এ. বারী, সাবির আহমদ চৌধুরী, বি. কে. পন্নী, আলী হোসেন, আসাদুজ্জামান, নূর মোহাম্মদ, মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ও অন্যান্য।

নজরুল একাডেমীর প্রকাশনা

আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রণীত

সদ্য প্রকাশিত

নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা

[মূল্য : ২৫'০০ টাকা]

শাহাবুদ্দীন আহমদ প্রণীত

শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম

[মূল্য : ১৫'০০ টাকা]

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ প্রণীত

নজরুল-কাব্যের শিল্পরূপ

[মূল্য : ১৫'০০ টাকা]

এই ৩টি গবেষণামূলক আলোচনা গ্রন্থ নজরুল-কাব্যের নব মূল্যায়নেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়, এদের ভূমিকা আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যের নব দিক-প্রদর্শকেরও।

নজরুল-গীতি

'নজরুল-গীতি'র প্রথম পাঁচটি খণ্ডের প্রত্যেকটিতে কবির বিভিন্ন ধরনের বহু অপ্রকাশিত গান ছাপা হয়েছে। প্রতি খণ্ডে একশ করে গান আছে।
প্রতি খণ্ডের দাম : ৫.০০ টাকা। একত্রে পাঁচ খণ্ড : ২০'০০ টাকা

নজরুল একাডেমী পত্রিকা

নজরুলের সাহিত্য, সঙ্গীত, জীবনী ও চিন্তাধারা বিষয়ক একমাত্র পত্রিকা। বছরে ছয় ঋতুতে ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মূল্য : প্রতি সংখ্যা ১০'০০ টাকা। দুই ভল্যুমে রেক্সিনে বাঁধাই ১ম ও ২য় বর্ষের ষড়-সংখ্যক পত্রিকা বিক্রির জন্য মওজুদ রয়েছে। প্রতি ভল্যুমের দাম : ৫০'০০ টাকা।

ফোন : ২৫ ৩৫ ৫৫ / ৪০ ১৬ ১৬

কর্মাধ্যক্ষ : নজরুল একাডেমী
বেগমাবাদ কলোনী, মগবাজার, ঢাকা।

জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি রোধ করতে
স্বেচ্ছা বন্ধ্যাকরণে এগিয়ে আসুন

আমিন হোসেন কর্তৃক নজরুল একাডেমী, বেলালাবাদ কলোনী, নয়াবাজার, ঢাকা–২ থেকে প্রকাশিত
এবং সেরাজুল হক কর্তৃক এ্যাবকো প্রেস, ৬/৭ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা–১ থেকে মুদ্রিত।